ইফ টুমরো কামস

সিডনি সেলডন

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

গল্প শুরুর আগে....2

জেলখানার সি ব্লকে 69

খবরের কাগজ 145

কোনরাড মরগান 239

পার্ক স্ট্রিট এলাকায় 298

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল....334

ব্রু মতিনের অফিস 362

গল্প শুরুর আগে

ট্রেসি এক সুন্দরী রমণী।

অনেক বছর কেটে গেছে তার রুদ্ধ কারার অন্তরালে। যৌন-বুভুক্ষু সমকামী মেয়ে কয়েদিদের অত্যাচার নষ্ট করেছে তার গর্ভের জ্বণ।

জননী হবার স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু কী তার অপরাধ? কুখ্যাত মাফিয়া চক্রের শিকার হতে হয়েছিল তাকে। ভালোবেসেছিল সে অভিজাত পরিবারের প্রেমিক চার্লসকে। বিপদের সময়ে চার্লস মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। অস্বীকার করেছে প্রেমের ফসল অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব। শেষ পর্যন্ত ট্রেসি একদিন শপথ নিল–একবার মুক্তি পেলে পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে শুরু করবে তার শেষ না হওয়া লড়াই। যাদের জন্য তার যৌবন প্রহর এভাবে কেটে গেল অন্ধকার বিবরে, তাদের কাউকে সে ছাড়বে না।

একে একে সকলকে পাঠাবে মৃত্যুর সেই নরকে যেখান থেকে কেউ আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারে না।

কিন্তু কী ভাবে?

সমকালের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের দুরন্ত লেখনীতে সমৃদ্ধ এক অসহায়া রমণীর প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার–হাড় হিম করা কাহিনী।

.

১.

নিউ অর্লিয়েন্স। বৃহস্পতিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি। রাত এগারোটা।

আমাদের গল্প এবার শুরু হবে, পটভূমি প্রস্তুত, আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীমতী ডরিস হুইটনিকে। এই একটু আগে উনি একে একে ওনার সব পোশাক খুলে ফেলেছেন। টকটকে লাল রঙের একটা রাত পোশাকে থরথর করে কাঁপছে ওনার স্পর্ধিত যৌবন।

চোখ বুলিয়ে দিলেন চারপাশে। সর্বত্র পরিশীলিত হাতের ছাপ। গত তিরিশটা বছর এই চার দেওয়ালের মধ্যেই কেটে গেছে শ্রীমতী ডরিস হুইটনির। তিরিশ বছর? তার মানে? তিরিশটি বসন্ত।

খাটের পাশে রাখা ছোট্ট টেবিলের ড্রয়ারটি খুললেন। সাবধানে বের করলেন একটি রিভলবার। সমস্ত অঙ্গে তার মৃত্যুর হিম-শীতলতা।

রিভলবারটা রাখলেন টেলিফোনের পাশে। ফিলাডেলফিয়ার টেলিফোন নম্বরটা দেখে নিলেন। ডায়াল করলেন। অনেক দূর থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কে কথা বলছে–হ্যালো।

–ট্রেসি, কিছুক্ষণের নীরবতা, তোর গলার স্বরটা শুনতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল।

–খুব চমকে উঠেছিলাম। জানো মা, এই মুহূর্তে তোমার কথাই ভাবছিলাম।

–আমি কি তোকে ঘুম থেকে জাগালাম?

–না, পড়ছিলাম। এবার শুতে যাব। চার্লস আর আমি ডিনার খেতে বাইরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বরফবৃষ্টি। ওখানকার আবহাওয়া কেমন?

ডরিস হুইটনি মনে মনে বললেন, হায় ভগবান, আমরা এখন এসব অপ্রাসঙ্গিক গল্প করছি? ওকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর বলতে হবে। কিন্তু বলতে পারছি কই?

–মা, ফোন ছাড়া নিতো?

জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চকিতে তাকালেন ডরিস। বৃষ্টি পড়ছে। তারপর ভাবলেন হিচককের লেখা কাহিনীর মতো অতি নাটকীয় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রহস্য রোমান্সের সব কটি উপাদান থরে থরে সাজানো আছে।

–কীসের শব্দ হল মা? টেলিফোনের ওপাশে কার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

–বাজ পড়ল।

ডরিস আর কোনো কথা বলতে পারছেন না। কেবলই মনে হচ্ছে তারও মনের আকাশেই এখন এমনই বিদ্যুৎ চমকের ঘনঘটা।

–বাজ পড়ল, ইচ্ছে করে কথাটাকে আবার বললেন উনি, জানতে চাইলেন, ফিলাডেলফিয়ার কথা বল।

–সত্যি করে বলব মা? নিজেকে মনে হচ্ছে রূপকথার এক রানি। কাল রাতে চার্লসের মা, বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠে মেয়ের কণ্ঠস্বর।

–বুঝতেই পারছো, কাল কী আলোচনা হবে আমাদের, তুমিতো জানো না মা, কী বিরাট প্রতিষ্ঠান ওদের। সেই তুলনায় আমি তো অতি নগণ্য।

মেয়ের কথা শেষ না হতে মা বললেন–ও নিয়ে চিন্তা করিস না, ওরা সকলে তোকে, ভালোবাসে।

–চার্লস তো বলেছে, এ নিয়ে বেশী ভাবনা চিন্তা না করতে। ও আমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে। আমার কী ইচ্ছে করছে জানো? ইচ্ছে করছে এখুনি তোমার সাথে চার্লসের আলাপ করিয়ে দিই। প্রথম আলাপেই তুমি বুঝতে পারবে, চার্লস অন্য পাঁচটা ছেলের থেকে একেবারে আলাদা।

–তোর কথা শুনে আমি তাই বিশ্বাস করছি।

ডরিস ভাবলেন, চার্লসের সঙ্গে এ জীবনে আর তার দেখা হবে না। নাতি-নাতনি নিয়ে ভর-ভরন্ত সংসারের কত্রী হওয়ার স্বপ্ন চিরদিনের মতো নিভে গেছে। কিন্তু নিজের কথা ভেবে লাভ কী?

–কেমন আছিস বল?

–কেমন আছি, সে কি আর বলতে হবে? তোমার খবর কী?

–আর থাকা, ডাক্তার রাসের শব্দগুলো মনে পড়ল–চমৎকার স্বাস্থ্য আপনার মিসেস হুইটনি। মনে হচ্ছে, হাসতে হাসতে একশো বছর পার করে দেবেন।

–ভালো আছি ট্রেসি। এই তো তোর সঙ্গে কথা বলছি।

–পুরুষ বন্ধু জুটল নাকি? নাকি সন্ধ্যেবেলা একা একাই টেলিভিশনে শোপ অপেরা দেখে কাটাচ্ছো?

ট্রেসির গলাতে এবার একটু ঠাট্টার সুর। মার সঙ্গে এ নিয়ে সে মাঝে মধ্যেই ইয়ারকি করে।

পাঁচ বছর আগে ট্রেসির বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছেন ডরিস হুইটনি।

–না, সে গুড়ে বালি। পুরুষ বন্ধু জোটেনি। এসব কথা বাদ দে। চাকরি করতে কেমন লাগছে?

–খুবই ভালো লাগছে মা, বিয়ের পরেও চাকরি করব, চার্লস মত দিয়েছে।

–বাঃ, খুব ভলো লাগল শুনে।

–দেখতেই তো পারছো চার্লস কত বোঝদার। বাইরে আবার বাজের শব্দ। গুডবাই মাই ডার্লিং, বলে ডরিস হুইটনি রিসিভারটা রাখার চেষ্টা করলেন।

ওপাশে তখনো ট্রেসির গলা–বিয়ের সময় দেখা হবে মা। আমি আর চার্লস বিয়ের তারিখ ঠিক করে তোমাকে জানাব।

–ঠিক আছে, এখন ছাড়ছি। ডরিস হুইটনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

তারপর? রিভলবারের নলটা রগে ঠেকালেন।

চোখ বন্ধ করলেন। কোনো কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন না। মুহূর্তের মধ্যে গরম সীসার বুলেট এসে আহত এবং রক্তাক্ত করল তাকে।

.

২.

ফিলাডেলফিয়া, শুক্রবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি, সকাল আটটা।

ট্রেসি হুইটনি তার ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। সে এখন অফিস যাচ্ছে। চেস্টনাট স্ট্রিট ধরে পূর্বদিকে। ওখানকার একটি ব্যাঙ্কে সে কাজ করে। গাঢ় হলুদ রঙের বর্ষাতি গায়ে লাগিয়েছে। বয়স কত হবে? চব্বিশ পার হয়ে সবেমাত্র পঁচিশে পড়েছে। অর্থাৎ তার যৌবন এখন উথলে উঠেছে।

মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। ঠোঁটে আছে বাসনার ইশারা। চোখের তারা অদ্ভুত শেওলা সবুজ, যখন-তখন চোখের রং পালটাতে পারে সে, অর্থাৎ সে এক জীবন্ত বহুরূপী।

মা বলতেন–শোন ট্রেসি, তোকে আমি ঠিক মতো চিনতে পারি না। তোর মধ্যে রামধনুর সাতটা রঙের ছটা আছে তুই তা জানিস কি?

আজ ট্রেসি দারুণ আনন্দে আছে। একটু জোরে গুনগুনিয়ে গান গাইছে। এতটা খুশী কেন? জীবনসাথী পেয়েছে, এটা কী কম আনন্দের কথা?

ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছলো। ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে কুড়ি মিনিট। আরো দশ মিনিট বাদে ফিলাডেলফিয়ার ট্রাস্ট অ্যান্ড ফাইডিলিটি ব্যাঙ্কের দরজা খুলবে।

ব্যাঙ্কের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্লারেন্স ডেসমন্ড বাইরের অ্যালার্মের সুইচটা অফ করছিলেন। এবার ভেতরে ঢুকলেন।

প্রত্যেকটা ঘর, বাথরুম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। এটা তার বরাবরের অভ্যেস। কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হবার পর ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ভেতরে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় ব্যাঙ্কের হলঘরে ট্রেসি ঢুকে পড়ল। সকাল থেকেই অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ বৃষ্টি যে কত আনন্দের একমাত্র ট্রেসি তার খবর জানে। ও কেবল ট্রান্সফার ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ছিল। এখন কমপিউটারের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো করতে পারছে। এই কাজটা ওর খুব মনের মতো।

ব্যাঙ্কের একটি আলোচনা চক্রে চার্লস স্ট্যানহোপের সঙ্গে ট্রেসির আলাপ হয়েছিল। ওই সেমিনারের বিষয় বস্তু ছিল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। চার্লস অতিথি বক্তা হিসাবে এসেছিল। চার্লসের ঠাকুরদা একটা অর্থ বিনিয়োগ করার ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। ওই কোম্পানীর সাথে ট্রেসির ব্যাঙ্কের লেনদেন হত। চার্লসের বক্তৃতার পর ট্রেসি সোজাসুজি কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিতর্ক করতে চাইল। চার্লস প্রথমে ব্যাপারটা হালকাভাবে নিয়েছিল। এমন সুন্দরী মেয়ের মুখ থেকে ভালো কিছু শোনার আশা করেনি সে। কিন্তু ট্রেসির ধারালো যুক্তিগুলো তার মনকে একেবারে পালটে দেয়। কম বয়সী সুন্দরী যুবতী হলে কী হবে, ট্রেসির মাথাটা যে খুব পরিষ্কার, চার্লস বুঝতে পেরেছিল। ডিনার খাওয়া পর্যন্ত আলোচনা গড়িয়ে গেল।

তৃতীয় চার্লস স্ট্যানহোপ পাত্র হিসাবে ফিলাডেলফিয়ার সেরা শিকার। ট্রেসি ওকে দেখে প্রথম দিকে মুগ্ধ হয়েছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। ইতিমধ্যে চুল একটু পাতলা হতে শুরু করেছে। কথাবার্তায় পন্ডিতি ভাব আছে। সবসময় নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা করে। ফিলাডেলফিয়ার প্রাচীনতম ধনী পরিবারের মধ্যে স্ট্যানহোপরা অন্যতম।

চার্লস বলল–আমার বাবার স্থির বিশ্বাস, হাসপাতাল থেকে ওকে অন্য কোনো ছেলে গছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

–সে কী? একদিন অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় দুজনের মধ্যে এই কথোপকথন হয়েছিল।

চার্লস বলেছিল–বংশের ধারার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। আমি টাকা পয়সা কামানোটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করি না। এই কথাটা আমার বাবাকে বলে দিও না কিন্তু!

চার্লসের এই সরলতা ট্রেসিকে মুগ্ধ করেছিল। এমন একটা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন হয়, প্রথম দর্শনেই হয়তো ট্রেসি মনে মনে ভেবেছিল তাকে?

ট্রেসির বাবা সারা জীবন ধরে পরিশ্রম করেছেন। তিনিও একটা ছোটো খাটো ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু স্ট্যানহোপদের প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনায় তারা কিছুই নয়। স্ট্যানহোপ আর হুইটনি পরিবার কোনো দিন মিশবে না। শেষ অব্দি ট্রেসি ভাবল, না, একদিনের আলাপে এতটা স্বপ্ন দেখা বোধহয় উচিত নয়। কোনো একজন পুরুষ তো আমাকে ডিনারে নেমতন্ন করতেই পারে, তাতে আমি অন্য কিছু খুঁজব কেন।

চার্লসের কথা কানে এল–আশা করি কাল আমার সঙ্গে ডিনার খাবার মত সময় থাকবে তোমার হাতে?

ফিলাডেলফিয়াতে যে দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, ট্রেসি এতদিন তার খবর রাখেনি। প্রতি শনিবার চার্লস আর ট্রেসিকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কখনন তারা অর্কেস্ট্রা শুনছে, কখনো বা ঘুরে ঘুরে বাজার করছে, কখনো ওয়েসাইড পাবে ঢুকে পড়ছে। কখনো যাচ্ছে কাফেওয়লে। মিউজিয়ামের নিপ্রাণ বস্তুগুলো যেন কিছু বলতে চাইছে–চার্লসের হাতে হাত রেখে ট্রেসির তাই মনে হয়েছিল।

তাদের মধ্যে তখনো ছেলেমানুষি ঠাট্টা ইয়ারকি বজায় ছিল। একজন অন্যজনের খুঁত ধরতে ছিল সচেষ্ট। একবার ডিনারে আসতে ট্রেসির পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল। চার্লস ভীষণ রেগে গেল। বকাবকির চোটে সন্ধ্যেটা হয়ে গেল মাটি।

দেহ সম্পর্কে ট্রেসির অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু কেবলই তার মনে হয়েছে। চার্লস বোধহয় এবার আরো নিবিড়ভাবে তাকে পেতে চাইছে। একবার ট্রেসি বেশী সাহস করে সামান্য অভিনবত্ব আনতে গিয়েছিল তার আচরণে, চার্লস খুব অবাক হয়ে যায় তার এই অভাবিত ব্যবহারে।

পেটে বাচ্চা এসে যাওয়াটা আকস্মিক ব্যাপার। ট্রেসির মনে সন্দেহ ছিল। চার্লস বিয়ের কথা তুলছে না, আবার বাচ্চা এসে যাওয়ার জন্য চার্লসকে বিয়ে করতে হচ্ছে–এটা ভাবতে গিয়ে ট্রেসির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একবার ভেবেছিল ওই ভ্রূণটাকে নষ্ট করে দেবে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ট্রেসি মনস্থির করল ডিনার খাওয়ার পর কথাটা চার্লসকে বলবে। উত্তেজনায় মাংসটা পুড়িয়ে ফেলল। আধপোড়া মাংস চার্লসের সামনে রেখে বলল–একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না চার্লস। আমি কিন্তু মা হতে চলেছি।

ট্রেসি ভেবেছিল, এই কথা শুনে চার্লস আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠবে। ট্রেসিকে শূন্যে তুলে দুপাক ঘোরাবে। কিন্তু চার্লসের মুখটা থমথমে গম্ভীর। অনেকক্ষণ চুপ করেছিল সে, কিছুক্ষণ বাদে কেটে কেটে উম্মরণ করল–ঠিক আছে, আমরা বিয়ে করব।

বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল ট্রেসির। চার্লসের নীরবতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সে ভেবেছিল, চার্লস বোধহয় ছেলেটির পিতৃত্ব অস্বীকার করবে। যেমন অন্য বখাটে ছেলেরা করে থাকে।

ট্রেসি বলল–আমি চাই না যে, তুমি এটা মনে করো বাধ্য হয়ে আমাকে বিয়ে করছে।

ট্রেসি তো নীচের তলাতে থাকে। চার্লসকে কীভাবে মনের ভাব বুঝিয়ে বলবে, সে বুঝতে পারে না।

চার্লস বলল, আমি তোমাকে এখনই বিয়ে করতে চাই ট্রেসি। তুমি আমার একটা ছোট্ট সুন্দর সোনা বউ হবে।

তারপর বলল–অবশ্য মা-বাবা একটু অবাক হবেন।

একথা বলে ট্রেসিকে গম্ভীর চুম্বন দিল চার্লস।

–কেন আশ্চর্য হবেন? ট্রেসি জানতে চাইল।

–আমার এই ব্যাপারটা তুমি ঠিক মতো বুঝতে পারছে না, ট্রেসি। স্ট্যানহোপরা সব সময়ে নীল রক্তের মেয়েকে পছন্দ করে। এটা কিন্তু আমার মুখের কথা নয়, আমার মা-বাবা এই কথা বিশ্বাস করেন।

–তাহলে কি ওঁরা তোমার জন্য পাত্রী বেছে রেখেছেন?

চার্স ট্রেসিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল–তাতে কিছুই যাবে-আসবে না সোনা। আমি যাকে নির্বাচন করব, সে-ই হবে আমার ছোট্ট বউ। আগামী শুক্রবার তুমি আমার মা বাবার সঙ্গে ডিনার খাবে, কেমন? রাজী তো?

নটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি এখন ট্রেসির মনের আকাশে শরতের মেঘ হয়ে উড়ে চলেছে। ঠোঁটের কোণে একটা ছোট্ট হাসি এল। একজন কাস্টমারকে আসতে দেখে হাসিটাকে পুরে ফেলল সে মুখের ভেতর। ভাবল আর পাঁচ মিনিট পর থেকে ভিড় শুরু হবে।

নিজের ঘর থেকে ট্রেসি বাইরের সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। কাস্টমারদের লাইন পড়ে গেছে। এ পাশে হল ঘরে ছটা টেবিলে স্লিপগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

ব্যাঙ্কের নিয়মিত কাস্টমারদের জমা দেওয়া স্লিপগুলোর তলায় এক-এক করে চুম্বক লাগান। সেখানে কোড নাম্বার দেওয়া কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়বারে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে নেয়। খুচরো খদ্দেরদের জন্যে আছে সাধারণ স্লিপ। এখানে সবকিছুই কঠিন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। ট্রেসিকে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না। তবুও সব দিকে সতর্ক নজর তার।

নটা থেকে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। তারপর কয়েকটি ঘন্টা কীভাবে কেটে গেল ট্রেসি জানে না।

লাঞ্চের সময় চুল বাঁধতে যাবে, শহরের সবথেকে বড়ো হেয়ার ড্রেসারকে আগে থেকেই বলে রেখেছে। খরচ হয়তো একটু বেশীই হবে, তা হোক না। আজই সে প্রথম হবু শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ডিনার খাবে, চেহারাতে একটা চেকনাই তো আনতেই হবে।

দুপুর একটা বাজল, বর্ষাতি নিয়ে বেরোতে যাবে। ট্রেসির ডাক পড়ল ক্লারেন্স ডেসমন্ডের খাস কামরাতে। আবহাওয়া নিয়ে দু-চারটে বাজে কথা বলার পর ডেসমন্ড বললেন–চার্লস স্ট্যানহোপের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে–আমি কি ঠিক শুনেছি?

ট্রেসি আশ্চর্য হয়ে বলল–এ খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন স্যার? আমরা তো কাউকে জানায়নি।

ডেসমন্ড হাসলেন-স্ট্যানহোপদের সবকিছুই একটা বিশেষ খবর। তবে তোমার জন্যে আমি খুশী হয়েছি। আশা করি হানিমুনের পর তুমি আবার ব্যাঙ্কের কাজে ফিরে আসবে।

–এ ব্যাপারে চার্লসের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

ডেসমন্ড খুব খুশী, স্ট্যানহোপ অ্যান্ড সনস্ বিশাল কোম্পানী। তাদের একটা বড়ো ধরনের অ্যাকাউন্ট যদি এই ব্যাঙ্কে আসে, তাহলে খুবই লাভ হবে এটা ডেসমন্ড জানেন।

–আর একটা কথা, তুমি যদি বিয়ের পর ফিরে আসো, তাহলে কথা দিচ্ছি তোমার পদোন্নতি হবে এবং তুমি আরো বেশী মাইনে পাবে।

ট্রেসি নিজের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে বলল–অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।

অহঙ্কারে সে বোধহয় মাটিতে পা দিতে পারছে না। সে ভাবল, স্বয়ং ঈশ্বর বোধহয়। তাকে স্বর্গের রানি করার ষড়যন্ত্র করেছে।

ইটন হার্ডস স্কোয়ারে বিরাট বাড়ি স্ট্যানহোপদের। এত বড়ো শহরে স্ট্যানহোপদের মতো এত বড়ো সুন্দর বাড়ি আর একটি নেই। কতদিন এই বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে ট্রেসি পথ হেঁটে গেছে। সে ভাবতেও পারেনি, কোনদিন ওই সিংহদরজা পার হয়ে ভেতরে প্রবেশের ছাড়পত্র সে পাবে।

একটু নার্ভাস লাগছে। আজ আসবার আগে চার-চারবার পোশাক পাল্টেছে। শেষে ||||||||| ধূসর রঙের স্কার্ট আর সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরেছে। গলায় সোনার একটা সরু চেন। গত

বছর বড়োদিনে মা পাঠিয়েছিলেন।

উর্দি পরা খানসামা দরজা খুলে দিয়ে বাও করে বলল–গুড ইভিনিং মিস হুইটনি।

খানসামা আমার নাম জানে দেখছি, একটু চঞ্চল হয়ে উঠল ট্রেসির মন।

বিরাট হল ঘর পার হয়ে সে লাইব্রেরি ঘরে এল। চার্লসের মা-বাবা বসে আছেন।

সিনিয়ার চার্লস স্ট্যানহোপ দারুণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক পুরুষ। ষাটের ঘর পার হয়েছেন কয়েক বছর আগে। সাফল্যের চিহ্ন আঁকা আছে শরীরের সর্বত্র। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চার্লস বুঝি বসে আছে। দুজনের চেহারায় অদ্ভুত মিল।

চার্লসের মায়ের চেহারা দেখার মতো। একটু বেঁটে আর মোটাসোটা। ট্রেসির সন্তানের ঠাকুরমা হিসাবে দারুণ মানাবে ওঁকে।

মিসেস স্ট্যানহোপ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন–খুব ভালো লাগছে তুমি এসেছ বলে। আমরা তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলব। তোমার আপত্তি নেই তো?

ভাবী শাশুড়িমায়ের মুখে এই কথা শুনে ট্রেসির বুকটা ধড়ফড় করছে। তবু সে আমতা আমতা করে বলল–আপত্তি কেন থাকবে? আমি তো কথা বলতেই এসেছি।

চার্লসের বাবা এই প্রথম কথা বললেন–বসো ট্রেসি।

–হ্যাঁ স্যার।

মুখোমুখি বসল ট্রেসি। ভাবল, এবার বোধহয় তার বিচার শুরু হবে। নিজের মায়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল–ভগবান এমন কিছু তোমাকে কখনোই দেবেন না, যার যোগ্য তুমি নও। তাই ধীর স্থির চিত্তে সবকিছুকে গ্রহণ করবে।

–তাহলে, মিস্টার স্ট্যানহোপের গলাতে কোনো খাদ ছিল না, তুমি আর চার্লস পরস্পরকে ভালোবাস। তাই তো? তোমরা একে অন্যকে বিয়ে করতে চাও। আমি ঠিক বলছি তো?

–হ্যাঁ।

–তোমাদের পরিচয় তো দীর্ঘদিনের নয়। মিসেস স্ট্যানহোপ বললেন।

–তা ঠিক, তবে ভালোবাসার মতো দীর্ঘ সময় আমরা পেয়েছি।

–ভালোবাসা? মিস্টার স্ট্যানহোপ বিড়বিড় করতে থাকলেন।

–তোমাকে সোজাসুজি বলছি, এই বিয়ের খবরটা আমাদের কাছে একটা আঘাতের মতো এসেছে। আশা করি, চার্লস তোমাকে নিশ্চয়ই শার্লটের কথা বলেছে?

একটু থেমে ট্রেসির মুখের ভাবান্তরটা দেখলেন মিসেস স্ট্যানহোপ। আবার গড়গড়িয়ে বলতে শুধু করলেন, চার্লস আর শার্ট, দুজন দুজনকে ছোটোবেলা থেকে চেনে। সকলেই জানে, ওরা একদিন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

শার্লটের কথা আর নতুন করে শুনতে চাইছে না ট্রেসি। শার্লট সম্পর্কে সব খবর সে জানে। কাছেই থাকে শার্লটরা। সে ধনী পরিবারে মেয়ে, সামাজিক মর্যাদা চার্লসদের মতোই।

–তোমার বাড়ির কথা বলো, মিস্টার স্ট্যানহোপ বললেন। এবার ট্রেসির মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। মনে হল, এক গ্লাস জল খেলে বোধহয় ভালো হত।

–কোথায় জন্মেছো তুমি?

–লুইসিয়ানাতে। বাবা একজন মেকানিক ছিলেন। শেষেরটা হয়তো না বললেও চলত। বাবাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে ট্রেসি।

–মেকানিক?

–হ্যাঁ, নিজের কারখানা খুলেছিলেন নিউ অর্লিয়েন্সে। পরে ব্যবসাটা খুবই বড়ো হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে বাবা মারা যান। মা ওই ব্যবসাটা দেখাশোনা করছেন।

–কী তৈরী হয় ওই কারখানাতে?

–এগজস্ট পাইপ আর গাড়ির অন্যান্য পার্টস। ট্রেসি বেশ বুঝতে পারল, তার মুখ থেকে ছুটে আসা এই শব্দগুলো স্ট্যানহোপ দম্পতিকে মোটেই খুশী করতে পারেনি। তারা চোখাচোখি করলেন।

ট্রেসির উত্তেজনা তখন বাড়ছে। আর কতক্ষণ ধরে এই জেরা চলবে কে জানে? চার্লস কোথায়?

এবার সেই আসল প্রশ্ন–মিস্টার স্ট্যানহোপ নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইলেন–চার্লস বলছিল, তুমি নাকি মা হতে চলেছো? সত্যি?

ট্রেসির তখন মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে বোধহয় ভালো হত।

–বুঝি না আজকের দিনেও কেন যে...

কথা শেষ করলেন না মিসেস স্ট্যানহোপ।

চার্লস এসে গেল–এই যে কেমন কাটছে তোমাদের?

চার্লসকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ট্রেসি। তাড়াতাড়ি চার্লসের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। আঃ, চার্লস কত ভালো, ভাগ্যিস মা-বাবার মতো হয়নি।

ডিনারটি ছিল খুবই ভালো কিন্তু ট্রেসির মুখে কোনো কিছুই ভালো লাগছিল না। নানা বিষয় নিয়ে খুচরো আলোচনা হচ্ছিল। পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদি।

টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে দিল চার্লস। ট্রেসির হাত ধরল। ওই হাতের স্পর্শে মনের সব দুর্বলতা কেটে গেল বেচারী ট্রেসির।

–আমি আর ট্রেসি ভাবছি, বিয়ের আয়োজনটা সংক্ষেপে সেরে নেব। পরে না হয় বড়ো করে–

চার্লসের কথা থামিয়ে দিয়ে মিসেস স্ট্যানহোপ বললেন–বাজে বকো না, আমাদের পরিবারে এসব কাজ কি লুকিয়ে চুরিয়ে সারা যায়? এক গাদা আত্মীয় বন্ধু আসবে, পাড়া প্রতিবেশীদের বলতে হবে। আমার মতে এখন থেকে নেমতন্নের চিঠি বিলি করা উচিত।

–হনিমুন করতে যাবে কোথায় ঠিক করেছো? সিনিয়ার স্ট্যানহোপ জানতে চাইলেন।

–ওটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত খবর, বাবা, তোমায় বলব কেন? মুচকি হেসে চার্লস বলল। ডিনার শেষ হতে হতে মাঝরাত গড়িয়ে গিয়েছিল। চার্লস গাড়িতে ট্রেসিকে

ফেয়ারমন্ড পার্কে পৌঁছে দিল। বলল, সন্ধ্যেটা আশা করি তোমার খারাপ কাটেনি ট্রেসি। মা-বাবা মাঝে মধ্যে একটু মেজাজী হয়ে থাকেন। কিছু মনে করো না, কেমন! তুমি এসে সব কিছু মানিয়ে নিতে পারবে তো?

–না-না, দারুণ ভালো লোক ওঁরা। মনের দুঃখ মনে চেপে ট্রেসি কোনোরকমে বলল। ট্রেসি মনে মনে চাইছিল, চার্লস একবার তার ঘরে আসুক। সন্ধ্যাটা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেছে। তার তৃষিত মন যেন চার্লসের আদর চাইছে। কিন্তু আলতোভাবে আদর করে চার্লস চলে গেল। কাল সকাল হতে না হতেই তাকে ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হতে হবে।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল ট্রেসি। ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন সে। ভাবল সে, এখনই ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে কিনা? হঠাৎ ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ির ঘন্টার তীব্র শব্দে তার সমস্ত আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। শব্দটা হয়েই চলেছে। শেষপর্যন্ত ট্রেসি বুঝতে পারল, এটা টেলিফোনের আওয়াজ। বিছানার পাশেই ঘড়ি, রাত কত? দুটো বেজে গেছে কি? ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। চার্লসের কিছু হয়নি তো? রিসিভারটা তুলে নিল, কঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে জানতে চাইল–হ্যালো?

দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে–আপনি কি ট্রেসি হুইটনি?

উত্তর দেবে কি দেবে না ভাবছিল ট্রেসি, শেস পর্যন্ত বলল–আপনি কে বলছেন?

অনেক সময় মাঝরাতে চ্যাংরা ছেলেরা ইয়ারকি করে। ট্রেসি ভাবল হয়তো তেমন কোন ইভ-টিজার।

ওপাশ থেকে কে যেন ভারী গলায় বলে উঠলেন–নিউ অর্লিয়েন্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লেফটেনান্ট মিলার বলছি, আপনি কি ট্রেসি হুইটনি কথা বলছেন?

–হ্যাঁ, বুকের মধ্যে ঘন ঘন হাতুড়ি পেটার শব্দ।

–আমাকে মাপ করবেন, আপনার জন্য একটা দুঃখের খবর আছে।

–দুঃখের খবর? ট্রেসি টেলিফোনটাকে শক্ত করে ধরল। হারানো সাহস ফিরে পাবার চেষ্টা করল।

–খবরটা আপনার মায়ের সম্বন্ধে।

–মার কি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

–মিস হুইটনি, তিনি মারা গেছেন।

–না, ট্রেসির আর্তনাদ রাতের বাতাসকে ভারী করল। ট্রেসি ভাবল, নানা, বদমাইসি করে কেউ বোধহয় তাকে ভয় দেখাতে চাইছে। মা তো ঠিকই আছে, এই তো সেদিন বলল, আমি তোকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি ট্রেসি।

–খবরটা এভাবে দিতে হচ্ছে বলে আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

তার মানে এটা সত্যি খবর? কোনো দুঃস্বপ্ন নয়। ট্রেসির মাথা ঘুছে। লেফটেনান্ট মিলারের গলা তখনো শোনা যাচ্ছে টেলিফোনের মধ্যে–হ্যালো? মিস হুইটনি? হ্যালো? হ্যালো–হ্যালো!

ট্রেসি রিসিভারটা রেখে দিয়েছে। ভাবছিল, কী করবে এখন? মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। মা নেই, এটাকে ভাবতেই পারছে না। ছোটোবেলা থেকে যখন যা হয়েছে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সব কথা বলেছে ট্রেসি। ট্রেসির বাবা মারা যাবার পর অনেকে চেয়েছিল, ব্যবসাটাকে কিনে নিতে। কিন্তু পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি বলে মা সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। এমন কী ডরিস হুইটনিকে যে টাকা অফার দেওয়া হয়েছিল, সেটা নিলে উনি সারা জীবন পায়ের ওপর পা রেখে বসে থাকতে পারতেন।

–মাগো, তুমি আর কোনোদিন চার্লসকে দেখতে পাবে না। নাতি দেখাও তোমার হয়ে উঠল না।

ট্রেসি তখন অঝোরে কাঁদছে।

রাত সাড়ে তিনটে, ট্রেসি একবার ভাবল, চার্লসকে ফোন করবে! অসময়ে তার ঘুম ভাঙানো উচিত হবে কি? শেষ পর্যন্ত মনটাকে শান্ত করতে বাধ্য হল সে। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে না হয় ফোন করবে। লেফটেনান্ট মিলার বলেছেন–এখানে পৌঁছে ট্যাক্সি ধরে পুলিশ। হেড কোয়ার্টারে চলে আসবেন। কিন্তু? পুলিশ হেড কোয়ার্টার কেন? তবে? তবে কি?

নাঃ, বাকিটুকু আর ভাবতে পারল না বেচারী ট্রেসি!

.

নিউ অর্লিয়েন্স এয়ারপোর্ট। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে লাউঞ্জের বাইরে বেরিয়ে এল ট্রেসি। এখনই তাকে একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। ঠিকানাটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, ৭১৫, সাউথ ব্রড স্ট্রিট।

ড্রাইভার দ্রুত ট্যাক্সি চালাচ্ছে শহরে এখন মেলার পরিবেশ। দূর থেকে অনেক মানুষের চিৎকার হৈ-চৈ হট্টগোেল শোনা যাচ্ছে। উৎসবের বাজনা বাজছে।

কিছুটা যাবার পর ড্রাইভার গাড়ি থামাতে বাধ্য হল।

ট্রেসি সামনে তাকাল। মুখোশ পরা হাজার হাজার মানুষ। কেউ সেজেছে ড্রাগনের বেশে, কেউবা হয়েছে কুমির, কেউবা দেবতা। উন্মত্তের মতো তারা সবাই নাচছে।

–ওরা এসে আমার গাড়ি উল্টে দেবে ম্যাডাম। আপনি এখানেই নামুন। শুরু হয়ে গেছে মারদিগ্রাস।

ট্রেসির হঠাৎ মনে পড়ল, হ্যাঁ, তাই তো, ফেব্রুয়ারি মাসেই তো মারদিগ্রাস উৎসব হয়। ট্যাক্সি থেকে সে নেমে দাঁড়াল। উন্মত্ত জনস্রোত যেন ওকে লুফে নিল। একজন ওর স্যুটকেসটাকে কেড়ে নিল। একজন ওকে জাপটে ধরল। অন্য একজন ওকে কোলে করে বয়ে নিয়ে চলল উল্টো দিকে। অসহায় ট্রেসি তখন অঝোর ঝরে কাঁদছে। কিন্তু

সেদিকে কারো ভূক্ষেপ নেই। বহুক্ষণ বাদে ওই উন্মুক্ত জনতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল ট্রেসি। কোনো রকমে পৌঁছলো পুলিশের কোয়ার্টারে।

লেফটেনান্ট মিলারের বয়স হয়েছে। জীবনের অনেক চড়াই উতরাই অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। নিজের ভূমিকাতে অভিনয় করতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবু বললেন–দুঃখিত, এয়ারপোর্ট যেতে পারিনি। সমস্ত শহরটা আজ যেন ক্ষেপে গেছে। আপনার মার জিনিসপত্র খুঁজতে গিয়ে শুধু আপনার ঠিকানাটাই পেয়েছিলাম।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা ট্রেসি নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কেটে কেটে কয়েকটি শব্দ সে ভাসিয়ে দিল বাতাসে। বলললেফটেনান্ট, দয়া করে বলবেন কি আমার মার কী হয়েছিল?

–উনি আত্মহত্যা করেছেন। ট্রেসির সমস্ত শরীর দিয়ে একটা বরফ-শীতল স্রোত বয়ে গেল।

–না, হতে পারে না। মা কেন আত্মহত্যা করবেন? তার তো সবই ছিল?

–আপনাকে লেখা ওঁর একটা চিঠি আছে।

চিঠি সম্পর্কে আপাতত ট্রেসির কোনো কৌতূহল নেই। সে অন্তত একবার মায়ের মৃতদেহটা দেখবে। তার জন্য ওই মর্গে ঢুকতে হবে। পৃথিবীর সর্বত্র মর্গের মধ্যে একটা হিমশীতল বিষণ্নতার ছোঁয়া থাকে। সেখানে ঢুকলে মৃত্যুর স্পর্শ পাওয়া যায়।

নাঃ, এখান থেকে ট্রেসি পালিয়ে যাবে। সে তো মায়ের মৃত্যু দেখবে বলে আসেনি। টেলিফোনের ব্যাপারটা বোধহয় একটা দুঃস্বপ্ন কোনো বাজে বখাটে ছেলের খুনসুটি মাত্র।

তা হলে ট্রেসি কেন এখানে এসেছে?

মাথার ভেতর অনেক প্রশ্নের মিছিল। ট্রেসির মাথা ঘুরছে, সে বুঝতে পারছে না, এখন কী করা দরকার।

শেষ পর্যন্ত সম্মোহিতের মতো সে মর্গে গিয়েছিল। মায়ের ঘুমন্ত মুখে চুমু এঁকে দিয়েছিল। অঝোর কান্নার আবেগ চাপতে না পেরে শুধু বলেছিল, মা-মা, তুমি কেন একাজ করতে গেলে?

এই সেই চিঠি-আমার আদরের ট্রেসি।

আমাকে ক্ষমা করো তুমি, জীবনের চলার পথে আমি হেরে গেছি। তোমার বোঝা হয়ে আমি থাকতে পারব না। তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি বলেই বোধহয় এই

পথটা আমি বেছে নিলাম। ইতি তোমার মা।

আঃ, ঠান্ডা মৃতদেহটার মতো চিঠির প্রতিটি শব্দ একই রকম নিপ্রাণ এবং উত্তাপবিহীন।

মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। এবার যেতে হবে নিজেদের বাড়িতে। দূর থেকে মারদিগ্রাস উৎসবের হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। এই সবই ট্রেসির কাছে এখন অর্থহীন।

হুইটনিদের বাড়িটা ভিক্টোরিয়া প্যাটার্নের। নিউ অর্লিয়েন্সের বেশীর ভাগ বাড়ির মতো এটাও কাঠের তৈরী। তবে চারপাশে অনেকটা জায়গা আছে।

এই বাড়িতেই ট্রেসির সোনালী শৈশবের দিনগুলি কেটে গেছে। কেটে গেছে তার দুরন্ত দুর্বার কৈশোরের রোমাঞ্চিত প্রহর।

অবশ্য শেষ কবছর ও বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে। বাড়ির সামনে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একী? নিউ অর্লিয়েন্স রিয়ালিটি কোম্পানী বিক্রির জন্য নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে কেন? জীবন চলে গেলেও ট্রেসি কখনো এই বাড়ি বিক্রি করবে না।

গেট খুলে বাড়ির সদরে দাঁড়াল। চাবি তার কাছে আছে। যখন ও ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখন ওকে একটা চাবি উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে মাদুলির মতো সর্বক্ষণ চাবিটা ওর গলার হারের সঙ্গে বুকের মধ্যে ঝোলে।

ঘরের ভেতর ঢুকে চমকে উঠল ট্রেসি। কোথাও কোনো ফার্নিচার নেই কেন? বিরাট শূন্যতা তাকে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। দোতলার যে শোবার ঘরটাতে তার শৈশব এবং যৌবনের অনেকটা প্রহর কেটে গেছে–সেটার অবস্থাও একই রকম? তা কী করে সম্ভব?

বাইরে কে যেন ঘন্টা বাজাল। সম্মোহিতের মতো ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল ট্রেসি।

দরজা খুলে দিল। দেখল অটো স্মিট দাঁড়িয়ে আছেন। হুইটনি কোম্পানীর ফোরম্যান। রোগা লম্বা, বিয়ার খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বাগিয়েছেন। চুলে পাক ধরে গেছে।

–ট্রেসি, গলাতে স্পষ্ট জার্মান টান, খবরটা এইমাত্র পেলাম, আমার যে কী দুঃখ হচ্ছে ট্রেসি, আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না।

তাকে দেখে ট্রেসি হারানো সাহস কিছুটা ফিরে পেল। অটোর হাত দুটো চেপে ধরে বলল–আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে। আপনি কি ভেতরে আসবেন?

ফাঁকা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিতভাবে ট্রেসি বলল–বসার একটা চেয়ারও নেই।

–তাতে কী হয়েছে। এসো, নীচেই বসি।

কার্পেটের ওপর দুজনে বসে পড়ল। গভীর ব্যথায় দুজনেই কোনো কথা বলতে পারছে না। অটো স্মিট হল ট্রেসির বাবার কোম্পানীর এক বহু পুরোনো কর্মচারী।

–কী যে হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ বলছে, মা নাকি আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু আপনি তো জানেন এর কোনো কারণ থাকতে পারে না। আচ্ছা, আমার মায়ের কি কোনো গোপন অসুখ ছিল?

–না-না, তা নয়। ঠিক তা নয়। অটো অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। হয়তো কোনো কিছু জানেন তিনি। এখন বলতে পারছেন না।

–সত্যি বলুন তো, কারণটা কি আপনার জানা আছে? এই প্রথম ট্রেসি জিজ্ঞাসু দুটি দৃষ্টি মেলে ধরল অটোর চোখের ওপর।

একদৃষ্টিতে ট্রেসির মুখের দিকে তাকিয়ে অটো বললেন–ইদানিং যা ঘটেছিল, মা সেটা তোমাকে জানাতে চাননি। তুমি শুনলে অযথা দুঃখ পেতে।

ট্রেসির ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছে–আমার দুশ্চিন্তা? ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

অটো একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন–জো রোমানো নামে কাউকে তুমি চেনো কি?

–জো রোমানো? স্মৃতির সমুদ্রে তোলপাড়, না, চিনতে পারছি না তো।

–ছমাস আগে রোমানো তোমার মায়ের সাথে যোগাযোগ করেছিল। সে ওই কোম্পানীটা কিনতে চায়। প্রথমে মা রাজী হননি। সে দশ গুণ দাম দেয়। শেষ পর্যন্ত মা জোর প্রস্তাব মেনে নেন। হঠাৎ তোমাকে এই সুখবরটা দেবেন বলে তোমার মা ঠিক করেছিলেন। আমিও খুব খুশী হয়েছিলাম তোমার মায়ের এই খুশীতে। গত তিন বছর ধরে আমি চাকরি থেকে রিটায়ার করার কথা চিন্তা করেছিলাম। তোমার মায়ের কাছে বারবার প্রস্তাব করেছিলাম। প্রথমে ওই রোমানো সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিল। বাকি টাকা গত মাসে পাবার কথা ছিল।

এত শত ব্যাপার ট্রেসি কিছুই জানে না। হঠাৎ মৃতা মায়ের ওপর অভিমান হল তার। ট্রেসি বলল–তারপর? তারপর কী হল?

–কোম্পানী দখল নেবার পর পুরোনো সব কর্মচারীদের ছাঁটাই করে দেওয়া হল। নিজেদের লোক নিয়ে এল রোমানো। কোম্পানীর জিনিসপত্র বেচে দেবার হিড়িক পড়ে গেল। যন্ত্রপাতি ধারে কিনে এনে সেগুলোও বেচে দেওয়া হল। লোক তখনো জানে এই কোম্পানী তোমার মায়ের। তাই ধারে জিনিসপত্র দিতে আপত্তি করেনি। কিছুদিন বাদে পাওনাদাররা টাকার জন্য তাগাদা শুরু করে। তোমার মা রোমানোর কাছে ছুটে গেলেন। সে তখন পরিষ্কার জানিয়ে দিল কোম্পানী কেনার কোনো ইচ্ছে তার নেই। ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে। কোম্পানী দেনার দায়ে দেউলিয়া। তোমার মায়ের ওপর পাঁচ লাখ ডলারের ধারের বোঝ। তোমার মা কোম্পানীকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকেও দেউলিয়া ঘোষণা করা হল। পাওনাদাররা সব কিছু নিয়ে গেছে। এমন কী তোমার মায়ের গাড়িটাও ওরা নিয়ে গেছে।

আর শুনতে পারছে না ট্রেসি। আমার মাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে? ওঃ ভগবান, অস্ফুটভাবে কোনোরকমে সে আর্তনাদ করে উঠল।

–আরো শোনো ট্রেসি, সরকারী উকিল তোমার মাকে নোটিশ দিয়েছেন। জালিয়াতি করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এই মামলায় উনি নিশ্চিত পরাস্ত হতেন। অর্থাৎ ওনার জেল হত। মনে হয়, এইজন্যই বোধহয় তোমার মা...

ট্রেসির সমস্ত সত্তা তখন রাগে ফুলে উঠেছে–মা সত্যি কথাটা লেখেনি কেন কে জানে? যে লোকটা মায়ের এই বিপদের জন্য দায়ী তার নামটা তো অন্তত একবার পুলিশের কাছে জানানো উচিত ছিল।

বৃদ্ধ ফোরম্যান হতাশায় মাথা নেড়ে বললেন–জো রোমানো অ্যান্টনি ওয়সেক্তির ডান হাত। এই ওয়সেত্তি লোকটা গোটা নিউ অর্লিয়েন্স চালায়। কদিন আগে আমি জানতে পেরেছি। আরো কয়েকটা কোম্পানীর সঙ্গে রোমানো একই ধরনের শয়তানি করেছে। ওর বিরুদ্ধে তোমার মা হয়তো মামলা করতে পারতেন, কিন্তু তাতে অনেক টাকা-পয়সা লাগত। বছরের পর বছর কেস চলত। এসব তোমার মা সহ্য করতে পারতেন না।

মা, আমাকে একবারের জন্যও বলেনি কেন? ট্রেসির গলায় গভীর আক্ষেপের সুর।

–তোমার মা ছিলেন খুবই অহঙ্কারী মহিলা। তাছাড়া এসব খবর শুনে তুমি কী বা করতে পারতে?

–এই জো রোমানোর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই এখনই, কোথায় তাকে পাব, আপনি বলতে পারেন?

–ওর কথা ভুলে যাও ট্রেসি। লোকটা দারুণ প্রতিপত্তিশালী। অন্ধকার জগতের বাদশা।

–ও কোথায় থাকে? ট্রেসির গলায় তখন বুঝি আগুন ঝরছে।

–জ্যাকসন স্কোয়ারের কাছে ওর একটা বিরাট প্রাসাদ আছে। ট্রেসি, আমি তোমাকে ছোটোবেলা থেকে দেখছি। বিশ্বাস করো ওর সঙ্গে দেখা করে কোনো লাভ হবে না।

ট্রেসির কানে তখন কোনো কথা ঢুকছে না। বিজাতীয় ঘৃণা তাকে পাগল করে তুলেছে। মনে মনে ও প্রতিজ্ঞা করল, আমার মাকে এইভাবে হত্যা করার জন্য জো রোমানোকে। শাস্তি পেতেই হবে।

.

৩.

কিছুটা সময় দরকার। চিন্তা করতে হবে পরিষ্কার ভাবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। ট্রেসি ম্যাগাজিন স্ট্রীটের একটা হোটেলে উঠল। ফোন করল ফিলাডেলফিয়ার ব্যাঙ্কে। ক্লারেন্স ডেসমন্ডকে জানাল অফিসে যেতে কয়েকদিন দেরী হবে। তাই ছুটি চাই। বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললেন না ডেসমন্ড। তারপর ট্রেসি ফোন করল চালর্সকে।

–আরে তুমি কোথায় ট্রেসি? মা সকাল থেকে তোমায় টেলিফোন করছে, দুপুরে তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। বিয়ের ব্যাপারে অনেক কাজ আছে।

–চার্লস, আমি দুঃখিত তোমাকে না বলে চলে আসত বাধ্য হয়েছি। আমি এখন নিউ অর্লিয়েন্স থেকে কথা বলছি।

–কোথা থেকে? চার্লস যেন আকাশ থেকে পড়ল, নিউ অর্লিয়েন্স? সেখানে কী। করছো?

–আমার মা…মারা গেছেন, অতি কষ্টে এই কটি শব্দ বের হল ট্রেসির গলা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে চার্লসের কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল। চার্লস বলল–আমি ভীষণ দুঃখিত ট্রেসি, নিশ্চয়ই হঠাৎ মারা গেছেন। খুব একটা বয়স হয়নি তো। তুমি ঠিক আছে তো?

মা যে আত্মহত্যা করেছে, এই দুঃসংবাদটা ট্রেসি বলতে পারল না। তাছাড়া এটা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা। চার্লসকে এর মধ্যে জড়িয়ে কী লাভ?

–আমি ঠিক আছি, আমার জন্য বেশী চিন্তা করো না কেমন?

–আমার যাওয়ার দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবে। কোনোরম সঙ্কোচ করো না কিন্তু।

–দরকার নেই, আমি একাই পারব। কাল মাকে কবর দেওয়া হবে। সোমবার ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে যাচ্ছি।

ফোনটা নামিয়ে রাখল ট্রেসি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার মধ্যে তার শুধু একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। জো রোমানোকে চরম শাস্তি দিতে হবে।

বিকেল হবার পর হোটেল থেকে বেরোল ট্রেসি, ক্যানান রোড ধরে সামান্য হাঁটল। একটা বন্দুকের দোকানে ঢুকল।

সেলসম্যান হাত কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল–বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ম্যাডাম?

তোতলাতে থাকে ট্রেসি–আ-আমি একটা বন্দুক চাই। ।

দু-একটা কথা বলার পর দোকানদার বুঝে গেল, ট্রেসি একেবারে আনাড়ি। দেড়শো ডলার নিয়ে একটা পয়েন্ট বত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার ট্রেসির হাতে তুলে দিল। সঙ্গে একবাক্স গুলি ফ্রি দিল। প্রশ্ন করল–আপনি চালাতে জানেন তো?

ট্রেসি বন্দুক চালাতে জানে না। অবশ্য সে সুনিশ্চিত যে, চলাবার কোনো দরকার পড়বে না। ও ভয় দেখাবার জন্য এটা কিনছে। তবু ওপরে এমন একটা ভাব দেখাল যেন, এইসব ব্যাপার তার হাতের পুতুল। লোকটা বেশ ধূর্ত, তাহলে কীভাবে গুলি ভরতে হয় দেখে নিন।

লোকটা কয়েকটা গুলি ভরল।

এরপর রেজিস্টারে নাম ঠিকানা দিয়ে সই করতে হল। পুলিশের জন্য এইসব করতে হয়। তখনই ট্রেসির মনে হল জো রোমানোকে ভয় দেখানো বেআইনি কাজ।

-নাম?

–স্মিট জোয়ান।

–ঠিকানা?

–ডাউম্যান রোড, ৩০/২০ ডাউম্যান রোড।

মাথা নেড়ে লোকটা বলল, ৩০/২০ বলে কোনো নম্বর হতে পারে না ম্যাডাম। ওটা নদীর মাঝখানে পড়বে। আচ্ছা, আমি ৫০/২০ লিখে নিচ্ছি।

সেলসম্যান ভীষণ চালাক। তার দোকানে এমন অনেক উটকো খদ্দেরের ভিড় হয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, ট্রেসি বানিয়ে বানিয়ে নাম ঠিকানা বলছে।

ট্রেসি দোকান থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। জ্যাকসন স্কোয়ার জায়গাটা অভিজাতদের পাড়া। সেন্ট লুই ক্যাথিড্রাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর গাছের সারি। এখানে এলে মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কোনো দুঃখের ঘটনা ঘটেনি!

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেসি অপেক্ষা করতে থাকে। জো রোমানোর বাড়িটা ভালোভাবে লক্ষ্য করে। এবার কী কী করতে হবে ভেবে নিল। জো রোমানোর সঙ্গে দেখা হলে সব আলোচনা করে ওর কাছ থেকে লিখে নিতে হবে, মা নির্দোষ। যদি সহজে লিখে না দেয়, তাহলে রিভলবার দেখিয়ে ভয় দেখাবে। রোমানোর লেখা চিঠিখানা লেফটেনান্ট মিলারের কাছে পেশ করতে হবে। মায়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। পরবর্তী কাজ হল জো রোমাননকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা। চার্লস সঙ্গে থাকলে বেশ ভালো হত। কিন্তু ওই রিভলবারটা ট্রেসির মনকে এখন সাহসী করে তুলেছে।

এবার কাজ শুরু করতে হবে। দৃঢ় পায়ে হাঁটতে লাগল সে। দরজার পাশে লাগানো কলিং বেলের বোতামটা টিপল। শব্দ হচ্ছে, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না কেন?

দরজাটা একটু বাদে খুলে গেল, ট্রেসি ভেবেছিল শয়তানের মতো কেউ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সুন্দর শান্ত সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক। এক নজরে দেখলে মনে হয় উনি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক।

–বলুন, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

কথার স্বরে নম্রতা ঝরে পড়ছে।

–আপনার নাম কি জোসেফ রোমানো?

–হ্যাঁ, কী করতে পারি বলুন?

–আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে মিস্টার রোমানো।

রোমানো ট্রেসির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। তারপর বলল, ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।

ট্রেসি ভেতরে ঢুকল। দামী আসবাবপত্রে সাজানো ড্রয়িংরুম। ট্রেসি ভাবল, এসব কেনা হয়েছে আমার মায়ের রক্তমাখা টাকায়।

আধখাওয়া মদের গ্লাসটা হাতে তুলে রোমানো জিজ্ঞাসা করল–তুমি কী খাবে বলো।

–কিছু না।

চোখে কৌতূহল।–তাহলে বলে,ফেলো তোমার কী দরকার মিস....

–মিস ট্রেসি হুইটনি। আমি ডরিস হুইটনির মেয়ে।

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল রোমানোকে। তারপর ঠিক হয়ে গেল সে।

–ও হ্যাঁ, তোমার মার কথা শুনেছি, খুবই খারাপ লাগছে তার মৃত্যুর খবরটা শুনে। উনি যে খামোখা কেন আত্মহত্যা করতে গেলেন!

রোমানোর কণ্ঠস্বরে বিনয় এবং শোক একসঙ্গে ঝরে পড়ছে।

ট্রেসি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। তুমি তুমি আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী, আর এখন এমন অমায়িকভাব করছো, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না।

মিস্টার রোমানো, সরকারী উকিলের ধারণা, আমার মা জোচ্চুরি করেছেন। কিন্তু একমাত্র আপনি জানেন যে, এই অভিযোগটা ঠিক নয়। আমার মাকে আপনি এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করুন। মেয়ে হিসাবে এটাই আমার একমাত্র আবেদন।

ট্রেসির কথা শুনে রোমানোর মুখের কোনো পরিবর্তন হল না। সে বলল–মারদিগ্রাস উৎসবের সময়ে আমি ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো আলাপ আলোচনা করতে চাই না। আমাদের ধর্মে এব্যাপারে নিষেধ আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তা হলে একটু ড্রিঙ্ক করতে পারো। দেখবে মনের ভাবটা তরতাজা হয়ে উঠছে।

পেছন ফিরে অন্য গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল রোমানো।

রোমানো যে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইছে, বুদ্ধিমতী ট্রেসি তা বুঝতে পেরেছে। এবার তা হলে তাকে চরম পথটাই গ্রহণ করতে হবে। সে হ্যান্ডব্যাগ থেকে রিভলবারটা বের

করল। রোমানোর দিকে তুলে ধরে বলল–কীসে আমার ভালো লাগবে, তা এখুনি আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছি। রোমানো, আমার মার সঙ্গে আপনি যে শয়তানি করেছেন, সেই সম্পর্কে একটা লিখিত স্বীকারোক্তি আমার দরকার।

রোমানো ঘুরে দাঁড়াল। রিভলবারটা দেখে শান্তভাবে বলল–এটা খেলা করার জিনিস নয়। এটা সরিয়ে রাখো মিস হুইটনি। : যা বলছি, তা না করলে আমি কিন্তু গুলি চালাব। একটা কাগজে আপনাকে লিখে দিতে হবে, কীভাবে আপনি ষড়যন্ত্র করে মার কোম্পানীকে দেউলিয়া পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আর আমার মাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন।

রোমানো এবার ট্রেসির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, বুঝেছি, কিন্তু যদি আমি লিখে না দিই, তাহলে কী হবে?

–তাহলে আপনাকে মরতে হবে। ট্রেসি বুঝতে পারছে, তার হাতের মধ্যে ধরা। রিভলবারটা তখন থরথর করে কাঁপছে।

–তোমাকে দেখে খুনী বলে মনে হচ্ছে না মিস হুইটনি কথা বলতে বলতে এক পা এক-পা করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে রোমানো। খুবই আন্তরিকভাবে বলছে–তোমার মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো...হঠাৎ হাতের মদের গ্লাসটা ছুঁড়ে দিল ট্রেসির মুখে, চোখ জ্বালা করে উঠল ট্রেসির। কোনো কিছু বোঝার আগেই এক ধাক্কায় ওর হাত থেকে রিভলবারটা কে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে।

–তোমার গুণী মা আমার কাছে এমন একটা কথা লুকিয়ে গিয়েছিল...দুহাতে ট্রেসিকে চেপে ধরে দেওয়ালের সাথে পিষে দিয়ে রোমানো বলল, এমন একটা রসালো যুবতী মেয়ে আছে তার?

ট্রেসি আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারছে না, চোখ জ্বালা করছে, সামনে কোনো কিছু দেখতে পারছে না সে। বুকের ভেতর একটা চাপা কান্না তখন পাক খেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছে।

–তোমার বেশ তেজ আছে দেখছি, তোমার মতো সাহসী মেয়েদেরই আমি বেশী পছন্দ করি, তুমি জানো কি? সত্যিকারের উত্তেজনা খুঁজতে এসেছিলে খুকুমণি? এবার এসো, কাকে উত্তেজনা বলে তা তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

বলতে বলতে একটানে ট্রেসির ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল রোমানো।

ট্রেসি তখন সম্পূর্ণ অসহায়–ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।

হা-হা করে হেসে উঠেছে রোমানো–একটু আনন্দ দিয়ে তারপর ছেড়ে দেব।

চোখ টিপে সে বলল–তবে ওই আনন্দ পাবার পর তুমি আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রোমানো ট্রেসিকে ততক্ষণে মেঝের ওপর হয়ে দিয়েছে। তার ভারী শক্ত শরীরটা ক্রমশ ট্রেসির শরীরের ওপর চেপে বসছে। ট্রসি ছটফট করছে, হঠাৎ তার হাতে ঠেকল রিভলবারটা।

তারপর কী হল ট্রেসি জানে না। গুলির শব্দে রোমানোর শরীরটা শিথিল হয়ে এল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অশ্রাব্য খিস্তি কুত্তি কোথাকার, নরকের কুত্তি, তুই শেষ পর্যন্ত আমাকে গুলি করলি...

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ট্রেসি। আবছা দৃষ্টি নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। চোখ ভালো করে ধুয়ে ফেলল। আয়নায় দৃষ্টি পড়তে সে চমকে উঠল-হায়, এইমাত্র ও একটা লোক খুন করেছে।

জো রোমানো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সাদা কার্পেটের ওপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে।

ট্রেসি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল–দুঃখিত, আমি সত্যি সত্যি এই কাজটা করতে চাইনি। হাসপাতাল...সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে–৪২১, জ্যাকসন স্কোয়ারে একজন গুরুতরভাবে আহত, শীগগির অ্যাম্বুলেন্স পাঠান। পালাবার আগে ট্রেসি স্বগতোক্তির : মতো বলে গেল-অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছি, এর মধ্যে লোকটা যেন মরে না যায়।

দৌড়লে লোকে সন্দেহ করবে, তাই কোটটা দিয়ে শরীরটা ভালোভাবে ঢেকে। ধীর পায়ে হেঁটে গেল।

–ট্যাক্সি, এয়ারপোর্ট যাবট্যাক্সিতে উঠে বসেছে ট্রেসি। দূর থেকে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন কানে এল।

ট্যাক্সি ছুটছে, ট্রেসি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, অ্যাম্বুলেন্স যেন ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়। যদি রোমানো মরে যায়? তাহলে তো ট্রেসি একজন খুনী হয়ে যাবে। রিভলবারটা পড়ে আছে, হাতের ছাপ লেগে আছে। ও হাজার বার বললেও পুলিশ বিশ্বাস করবে না যে, ধর্ষণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ট্রেসিকে গুলি করতে হয়েছে।

তা হলে? নিউ অর্লিয়েন্স থেকে এখনই পালাতে হবে।

ড্রাইভারটা অনেক কথা বলছে। কিন্তু একটা বর্ণও ট্রেসির কানে ঢুকছে না। কী বোকার মতো কাজ করেছে সে। জোর করে রোমানোর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা কি এতই সহজ? কেন যে ফোরম্যানের কথা আমি শুনলাম না! চার্লসকেইবা কী বলব?

ট্রেসি এয়ারপোর্টে পৌঁছলো। আজ সকালেই সে এখানে নেমেছিল। সকাল থেকে রাতের মধ্যে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল তার জীবন নাটকে?

কাউন্টারে গিয়ে ফিলাডেলফিয়ার একটা টিকিট কিনল। একটি মাত্র সিট ছিল। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। মিনিট কুড়ি বাদে প্লেন ছাড়বে। টারমিনাসের দিকে এগিয়ে গেল ট্রেসি। হঠাৎ দুজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। তারা ট্রেসির দুপাশে দাঁড়াল, বলল, আপনি ট্রেসি হুইটনি?

বোকার মতো ঘাড় নাড়ল ট্রেসি–হ্যাঁ।

–আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল...

সিনেমার পর্দায় যেমন একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যায়, ঠিক সেইভাবেই ট্রেসির জীবনে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকল। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ট্রেসিকে তোলা হল পুলিশ ভ্যানে।

থানাতে তখন প্রচণ্ড ভিড়, বেশ্যা, দেহ ব্যবসায়িনী, তাদের দালাল, ওদের পাশ কাটিয়ে ট্রেসিকে দাঁড় করানো হল একটি টেবিলের সামনে। একজন সার্জেন্ট মাথা নীচু করে কী যেন লিখছিল।

–হুইটনি মেয়েটাকে ধরে এনেছি স্যার, পালাচ্ছিল, এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে আমাদের।

–আমি কিন্তু...ট্রেসির কথা বলা শেষ হল না, সার্জেন্ট বলল, হাতকড়া খুলে দাও। ট্রেসি ইতিমধ্যেই ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বলছে সে, ব্যাপারটা.একটা অ্যাকসিডেন্ট। আমি খুন করতে চাইনি। লোকটা আমাকে উন্মত্তের মতো ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। বাকি কথাটুকু সে আর শেষ করতে পারে না।

–তোমার নাম ট্রেসি হুইটনি?

–হ্যাঁ, আমি...

ট্রেসি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করল।

–ওকে গারদে পুরে দাও।

–দাঁড়ান এক মিনিট, একজনকে ডাকতে চাই আমি। একটা ফোন করার অধিকার তো আমার আছে।

–ওঃ সবই জানো দেখছি, সার্জেন্ট চিৎকার করে বলল, এর আগে কবার জেল খেটেছ?

–একবারও না।

–একটা ফোন করতে পারবে, সময় তিন মিনিট। নম্বর বলল। ট্রেসির মাথা তখন ঘুরছে। চার্লসের নম্বরটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। অনেক কষ্টে • মনে পড়ল। ফোন বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরল না। ট্রেসির মনে পড়ল, এই সময় চার্লস ফোনটা কেটে রাখে। পাছে কেউ বিরক্ত করে।

ফোন করা হল না, অথচ ভীষণ দরকার ছিল।

–শেষ হয়েছে ফোন করা?

–হ্যাঁ, ফোনটা নামিয়ে রাখল ট্রেসি। ওকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। বলা হল, কালকে তাকে কোর্টে পেশ করা হবে।

গরাদ দেওয়া একটা সেলের মধ্যে ট্রেসিকে পুরে দেওয়া হল।

রাত যেন আর কাটতে চাইছে না। চোখে ঘুম নেই। চার্লসের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভীষণ দরকার। চার্লসকে সবকথা না জানানো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে।

সকাল ছটা বাজল। সামান্য কফি আর খাবার দিয়ে গেল একজন। কোনো কিছু খাবার মতো মানসিকতা নেই ট্রেসির।

নটার সময় মেট্রন এসে তালা খুলল। বলল, যাবার সময় হয়েছে।

–আমি একটা ফোন করতে চাই। ট্রেসি মরিয়া হয়ে বলল।

–ওসব পরে হবে। জজ তোমার জন্য বসে থাকবেন না। তাছাড়া এই জজটা ভীষণ বদমাইস স্বভাবের।

এ বারান্দা ও বারান্দা করে মেট্রন তাকে আদালতে পৌঁছে দিল। জজটা বেশ বয়স্ক। মুখ আর হাত বেশী মাত্রায় নাচছে। সামনে দাঁড়িয়ে সরকারী উকিল এড টপার। চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখের কালো তারায় সবসময় ধূর্ততা খেলা করছে।

বেলিফ ঘোষণা করল–সরকার বনাম ট্রেসি হুইটনি, জজ সামনে রাখা কাগজপত্রে মুখ ডোবালেন।

এই সময় ট্রেসি চিৎকার করে বলল–ইয়োর অনার, খুন করার ব্যাপার এটা নয়, লোকটা আমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেছে।

সরকারী উকিল মাঝপথে বাধা দিলেন ইয়োর অনার, আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করে কী লাভ? এই মেয়েটি মিস্টার রোমানোর বাড়িতে অবৈধভাবে ঢুকে ছিল। সঙ্গে ছিল রিভলবার। তারপর প্রায় পাঁচ লাখ ডলার দামের বিখ্যাত শিল্পী রেনোয়ার একটা ছবি চুরি করে পালাবার চেষ্টা করে। মিস্টার রোমানো ওকে বাধা দিতে এসেছিলেন। মেয়েটি তাকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়।

–এসব কী যা-তা বলছেন? ট্রেসি হতভম্ব হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ ট্রেসির কথা শুনল না। সরকারী উকিল বলে চললেন–যে রিভলবার দিয়ে মিস্টার রোমানোকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটা আমরা হাতে পেয়েছি। তার গায়ের আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই মেয়েটির আঙুলের ছাপ মিলে গেছে।

খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল...তার মানে মিস্টার রোমানো মরে যায়নি...তার মানে আমি খুনী নই?

–মূল্যবান ছবিটি ও অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের আশঙ্কা সেটা বোধহয় বিদেশে চলে গেছে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে আমরা প্রার্থনা করছি, ট্রেসিকে পাঁচ লক্ষ ডলারের জামিন মঞ্জুর করা হোক। জজ ট্রেসির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন-তোমার কেননা উকিল আছে কি?

কথাগুলো ট্রেসির কানে ঢুকছে না।

জজ আরো চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–তোমার কোনো অ্যাটর্নি আছে কি?

ট্রেসি মাথা নেড়ে বলল–না, আমি...উনি যা বললেন তার একটি কথাও ঠিক নয়..আমি ডাকাতি...

–অ্যাটর্নি লাগাবার মতো টাকা পয়সা আছে তোমার? ব্যাঙ্কে টাকা আছে, চার্লসকে বললেও টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল–আমার, না ইয়োর অনার, না, নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন

ট্রেসি তোতলাতে শুরু করেছে। জজ বললেন–আদালত তোমার জন্য একজন অ্যাটর্নি দেবে। ইতিমধ্যে যদি পাঁচ লাখ ডলারের জামিন না দিতে পারো, তবে জেল হাজতে থাকবে। পরের মামলা...

–একমিনিট, কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে, আমি চোর-ডাকাত নই...

কেউ ট্রেসির কথা শুনল না। টেনে হিঁচড়ে তাকে আদালত থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল।

ট্রেসির জন্য আদালতের পক্ষ থেকে একজন অ্যাটর্নিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার নাম পেরী পোপ। তিরিশের কোটার শেষের দিকে বয়স। চালাক-চতুর চেহারা, চোখে মুখে সহানুভূতির স্পর্শ। পেরী পোপকে খুবই পছন্দ হল ট্রেসির। ট্রেসির মনে হল, পেরী পোপের কাছে সে জীবনের সব সত্যি কথা উজাড় করে বলবে।

সেলের মধ্যে ঢুকে, লোহার খাটের ওপর বসল পেরী। বলল, শহরে আসার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এত হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন দেখছি। তবে ভাগ্য ভালোই বলতে হবে

আপনার, আনাড়ির মতো গুলি চালিয়েছেন বলে রোমানো প্রাণে মরেনি। কথা বলতে বলতে পকেট থেকে পাইপ বের করে পেরী বলল, আপত্তি নেই তো?

না। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে পেরী বলতে শুরু করে–আপনাকে দেখে কিন্তু দাগী অপরাধী বলে মনে হচ্ছে না।

–বিশ্বাস করুন আমি খুনী নই।

–আগে আমাকে বোঝান, তবে বিশ্বাস করব। প্রথম থেকে সব কথা বলুন।

ট্রেসি ধীরে ধীরে সব কথা বলল। পেরী পোপ একমনে শেষ কথাটা পর্যন্ত মন দিয়ে শুনল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল–ব্যাটা বেজম্মা কোথাকার।

–ওরা কী বলছিল, আমি একবর্ণও বুঝতে পারিনি। ছবির কথা কেন উঠছে জানি ।

–খুব সোজা ব্যাপার। জো রোমানো যেভাবে আপনার মাকে জালে ফাঁসিয়েছিল, সেভাবে আপনাকেও ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

–ব্যাপারটা কিন্তু এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

–বুঝিয়ে বলছি, পেরী পোপ শুরু করল, রেনোয়ার ওই বিখ্যাত ছবিটা রোমানো নিজেই কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে পাঁচ লাখ ডলার ও ঠিক আদায় করবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানী আপনার পেছনে লাগবে ছবিটা উদ্ধার করার জন্য। গোলমাল কমলে রোমানো ছবিটা বিক্রি করে আরো পাঁচ লাখ ডলার পেয়ে যাবে।

সবটাই হল আপনার বোকামির ফলে। আচ্ছা, আপনি কীভাবে ভাবলেন যে, রিভলবার দেখিয়ে রোমানোর মতো একটা লোকের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবেন?

–মার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার মাথাটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন তো তদন্ত হবে।

পাইপটা নিভে গিয়েছিল। অবার ধরিয়ে নিয়ে পেরী পোপ প্রশ্ন করল–কীভাবে ওর বাড়িতে ঢুকেছিলেন?

–সদরে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপেছিলাম। মিস্টার রোমানো নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

–রোমানো কিন্তু অন্য গল্প বলেছে। বাড়ির পেছন দিকের জানলা ভেঙে আপনি ঢুকেছেন। ও পুলিশকে বলেছে, ছবিটা নিয়ে আপনি যখন পালাচ্ছিলেন, তখন ধরতে গিয়ে গুলি খেয়েছে আর আপনি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান।

–এটা তো মিথ্যে কথা।

–কথাটা মিথ্যে, কিন্তু বাড়িটা তার এবং রিভলবারটা আপনার। আপনি কি জানেন, আপনি কার সঙ্গে লাগতে গেছেন?

ট্রেসি মাথা নাড়ল।

–তাহলে আসল কথাটা শুনে রাখুন মিস হুইটনি, এই শহরটা পুরোপুরি ওয়সেত্তির মুঠোর মধ্যে আছে। অ্যান্টনি ওয়সেত্তি যদি অনুমতি না দেন তা হলে এই শহরে কিছু হতে পারে না। এখানে বাড়ি করতে চাইলেও ওনার অনুমতি নিতে হবে। মেয়েমানুষের ব্যবসা করতে চাইলে প্রতি শনিবার ওনার হাতে টাকা পৌঁছে দিতে হবে। গাঁজা-চরসের গোপন চালান দিতে হলে ওয়সেত্তির সঙ্গে দেখা করুন। প্রথমে জো রোমানো ছিল ওর এক নম্বর শত্রু। এখন হয়েছে ডান হাত।

ট্রেসি অবাক হয়ে শুনছিল, আর ভাবছিল, সত্যি কেমন একটা বোকার মতো কাজ হয়ে গেল।

উকিলটা বলতে থাকে আর আপনি বোকার মতো ওর সঙ্গে লাগতে গেলেন? ট্রেসি ক্লান্তভাবে প্রশ্ন করল–আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?

–হ্যাঁ, করছি।

–তাহলে আপনি কি আমায় কোনো সাহায্য করতে পারবেন?

কারোর ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না ট্রেসি। ব্যাকুল হয়ে সে এই কথা জানতে চাইল।

ধীরে ধীরে পেরী পোপ বলতে শুরু করে আমি চেষ্টা করে দেখব। ওই লোকগুলোকে জেলে ভরা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বিচার যদি আপনার হয়, তা হলে ওরা

আপনাকে চারপাশ থেকে এমনভাবে আক্রমণ করবে যে, আপনি কোনোদিন আলোর মুখ দেখতে পাবেন না।

যদি আমার বিচার হয় মানে? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ট্রেসি। পেরী পোপ পায়চারি করতে করতে বলতে শুরু করল–আমি চাই না, জুরী দিয়ে আপনার বিচার হোক। জুরীর সদস্যদের ওরা কিনে নেবে। একজন মাত্র জজ আছেন, যাঁকে ওয়সেত্তি এখনো কিনতে পারেনি। তার নাম হেনরি লরেন্স। যদি আপনার মামলাটা হেনরি লরেন্স-এর আদালতে ফেলতে পারি, তাহলে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব। আমার মতো উনিও মনে-প্রাণে ওয়সেত্তি এবং জো রোমানোকে ঘেন্না করেন। এখন আমার প্রথম কাজ হল ওই জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করা।

পেরী পোপের সাহায্যে ট্রেসি চালর্সকে ফোন করল। ধরল চার্লসের সেক্রেটারি হ্যারিয়েট।

–কে মিস হুইটনি? আঃ, বাঁচালেন, মিস্টার স্ট্যানহোপ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বিয়ের ব্যাপারে দিন এখনই ঠিক করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

–হ্যারিয়েট, আমি একটু চার্লসের সঙ্গে কথা বলব।

–দুঃখিত, মিস্টার স্ট্যানহোপ একটু আগে হার্ডসরোল চলে গেছেন। আপনার নম্বরটা দিন, উনি কাল ফিরবেন, আমি বলব আপনাকে যোগাযোগ করতে।

জেলখানার ফোন নম্বর দেওয়া যায় না। ধীরে ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখার আগে ক্লান্ত ট্রেসি বলল, ঠিক আছে, আমিই ফোন করব।

আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেদিন বিকেলের দিকে একটা ভালো ঘরে ট্রেসিকে পাঠানো হল। কে যেন ফুল পাঠিয়েছে, সঙ্গে কার্ড, লেখা আছে–মাথা উঁচু করে থাকুন। শয়তানদের উচিত শিক্ষা দিতেই হবে–পেরী পোপ।

পরদিন সকালে পেরী পোপের মুখে স্মিত হাসির চিহ্ন দেখে ট্রেসি বুঝতে পারল, ভালো খবর এসেছে।

পোপ বলল–আমাদের ভাগ্য ভালো। এইমাত্র জজ লরেন্স আর সরকারী উকিলের কাছ থেকে আসছি। জজ রাজী হয়েছেন। সরকারী উকিলটা প্রথমে খুব চিৎকার করছিল। পরে ওকেও রাজী করিয়েছি। তবে একটা শর্ত আছে। জজ সাহেবকে আপনার সব কথা বলেছি। উনি বলেছেন, আপনি অপরাধ স্বীকার করবেন।

ট্রেসি চমকে উঠে বলল–সে কী, আমাকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে?

–আগে সবটা শুনুন, অপরাধ স্বীকার করলে মামলা চালানোর খরচ সরকারকে করতে হবে না। জজ সাহেব রোমানোকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। আপনি যে ছবিটা চুরি করেননি, সেটা তিনি বিশ্বাস করেছেন।

–কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে আমার কী হবে?

–জজ সাহেব আপনাকে তিন মাসের জেল দেবেন।

–জেল...

–উত্তেজিত হবেন না। কারাদণ্ড দেবেন ঠিকই, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুকুব করে দিয়ে তিন মাসের জন্য রাজ্যের বাইরে থাকতে বলবেন।

–তাহলে আমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ থেকে যাবে?

–যদি বিচার চলে তাহলে চুরি আর খুন করার অপরাধে আপনাকে দশ বছরের জেল খাটতে হবে।

–দশ বছর? ট্রেসি আর ভাবতে পারছিল না।

–সিদ্ধান্তটা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। আমি শুধু উপদেশ দিতে পারি। দৈব সাহায্য করেছে বলেই এই মামলা আমার হাতে এসেছে। ওঁরা আমার কাছ থেকে হা অথবা না শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। যদি আপনি এই শর্তে রাজী না হন, তবে অন্য অ্যাটর্নি পাবেন।

–না, ট্রেসি বুঝতে পারছে, পোপের থেকে ভালো উকিল সে আর পাবে না কিন্তু এই ব্যাপারে একবার চার্লসের সঙ্গে কথা বললে ভালো হত। উত্তরটা এখন দিতে হবে। ভাগ্য ভালো থাকলে তিন মাসের মধ্যে সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।

–এই শর্তে আমি রাজী আছি। ট্রেসি কোনোরকমে বলল।

পেরী পোপ ঘাড় নেড়ে বলল–বুদ্ধিমতী মহিলা।

পরদিন কোর্টে যাবার আগে ট্রেসিকে কোনোরকম ফোন করতে দেওয়া হল না। সরকারী। উকিল এড টপার একদিকে, অন্য দিকে পেরী। বিচারকের আসনে জজ হেনরি বসে আছেন। দূর থেকে দেখে ট্রেসি বুঝতে পারল, তার চেহারাটি ভারী সুন্দর এবং সুভদ্র।

–আদালতকে জানানো হয়েছে যে আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করেছেন, কথাটা কি ঠিক?

–হ্যাঁ, ইয়োর অনার।

–এতে সব পক্ষের সম্মতি আছে তো?

পেরী পোপ বলল–হ্যাঁ, হুজুর।

–সরকারী পক্ষ রাজী, সরকারী উকিল বললেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন জজ। তারপর তিনি রায় দেওয়া শুরু করলেন– আমাদের মহান দেশের বর্তমান অবনতির অন্যতম কারণ হল এই যে, সর্বত্র নরকের কীটরা ছড়িয়ে পড়েছে। আইনকে তার ব্যঙ্গ করে। দেশের কোথাও কোথাও তারা অন্যায়ভাবে অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়। আমাদের লুইসিনিয়াতে আমরা এসব করতে দেব

না। চুরি করতে গিয়ে কেউ যদি খুনের চেষ্টা করে, তবে তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।

জজের বক্তব্যের সুর ট্রেসির বুকের ভেতর কাপন ধরিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক মতো হবে তো? পেরী পোপ জজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

–আসামী স্বীকার করেছে সে এই শহরের এক গণ্যমান্য এবং জনসেবক ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকেছিল মূল্যবান ছবি চুরি করতে। ধরা পড়ার ভয়ে ওই ভদ্রলোককে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করে।

জজ সাহেবের কণ্ঠস্বর ক্রমশ কঠোর হতে শুরু করেছে।

–এই আদালত দেখতে চায়, আসামী ওই ছবি বিক্রির টাকা যেন ভোগ করতে না। পারে। অন্তত পনেরো বছর তাকে কারাগারে থাকতেই হবে। পনেরো বছর সে দক্ষিণ লুইসেনিয়ার নারী চরিত্র সংশোধনি কারাগারে থাকবে।

বিচারকের রায় দান শেষ হয়েছে। এবার কোর্টের কাজ বন্ধ হবে। ট্রেসির মনে হল, সমস্ত কোর্ট ঘরের মধ্যে বুঝি একটির পর একটি বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। জজ ভুল করে অন্য কিছু করে ফেলেছেন। সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে পেরী পোপের দিকে তাকাল। পেরী পোপ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত। জজ সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর্দালি চিৎকার করছে। বেলিফ এসে ট্রেসির হাতটা চেপে ধরল। কর্কশ কণ্ঠস্বরে বলল–চলো।

–না, ট্রেসি আহত আর্তনাদে তার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে চায়, শুনুন, কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি এই কাজটা করিনি।

ট্রেসি কান্নার মধ্যে ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বেলিফের হাতটা সাঁড়াশির মতো তার হাত চেপে ধরেছে। ট্রেসিকে আরো একবার বোকা বানানো হয়েছে। উদগত কান্নাটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করল সে। সে বেশ বুঝতে পারল, মায়ের পরে এবার মেয়ের বোকা সাজার পালা।

.

৪.

সমস্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছবিসহ ট্রেসি হুইটনির ওই মুখরোচক গল্প ছাপা হয়েছে। টেলিভিশনের রিপোর্টাররা ট্রেসিকে ঘেঁকে ধরার চেষ্টা করছে। জো রোমানো শহরের একজন নামকরা লোক। এক সুন্দরী তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। অতএব সংবাদ শিকারীদের কাছে এখন ট্রেসিই তো হয়ে উঠবে প্রধান আকর্ষণ, এতে আর অবাক হবার কী আছে?

ট্রেসি ভাবল চর্লসই একমাত্র আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে। পরদিন বিকেল বেলা চালর্সকে ফোন করার অনুমতি দেওয়া হল। ফোন ধরল সেক্রেটারী হ্যারিয়েট। শেষ পর্যন্ত চালর্সকে ডেকে দিল সে।

–চালর্স...উত্তেজনায় ট্রেসির গলা তখন বুজে এসেছে।

–কে ট্রেসি? ট্রেসি কথা বলছ?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা হিম শীতল নীরবতা।

–হ্যাঁ চার্লস, ভীষণভাবে তোমার সঙ্গে যোগাযযাগ করতে চাইছি।

–আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। চার্লস কোনোরকমে বলে। এখানকার খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতায় তোমার ছবি বেরিয়েছে। তোমার সম্পর্কে মিথ্যে খবর লিখেছে, আমি একটাও বিশ্বাস করতে পারছি না।

–একটা কথাও সত্যি নয় চার্লস।

–তুমি আমাকে ফোন করছে না কেন?

–চেষ্টা করেছিলাম, পাইনি।

–এখন তুমি কোথায় আছো?

–আমি নিউ অর্লিয়েন্স জেলে আছি। বিনা দোষে ওরা আমাকে জেলে পুরেছে। চার্লস... ট্রেসি আর কথা বলতে পারছে না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল সে।

–শান্ত হও। শোনো, কাগজ বলছে, তুমি নাকি একটা লোককে গুলি করেছিলে। কথাটা কি সত্যি?

–গুলি আমি করেছি ঠিকই। কিন্তু—

–তাহলে কথাটা সত্যি। চার্লসের একটা দীর্ঘশ্বাস বোধ হয় ট্রেসি শুনতে পেল।

–যেভাবে পড়েছে, সেটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

–ট্রেসি, ছবি চুরি করা আর খুন করা–তোমার বিরুদ্ধে এই দুটো মারাত্মক অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং দুভার্গ্যক্রমে তুমি দুটো অভিযোগ স্বীকার করেছে।

–হ্যাঁ চার্লস, কিন্তু এই জন্য...

–হ্যায়, তোমার এত টাকার দরকার ছিল, আমাকে একবার বলতে পারলে না। তার বদলে একজনকে খুন করতে গেলে ...না, আমি এটা বিশ্বাস করছি না। কিন্তু সত্যটাকে তো মানতেই হবে। আমার মা-বাবাও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এখন হয়তো সব কিছু তাদের বিশ্বাস করতে হবে। এখানকার খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হেড লাইনে তোমার সব খবর ছাপা হয়েছে। এই প্রথম স্ট্যানহোপ পরিবারের গায়ে কলঙ্কের ছাপ পড়ল। আর এর জন্য ট্রেসি তোমাকেই দায়ী করব।

চার্লসের গলা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ট্রেসি দুঃখিত আর লজ্জিত। চার্লসকে এভাবে বিপদে ফেলা তার মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু মুহূর্তের অসাবধানতার পরিণতি যে এত মারাত্মক হতে পারে ট্রেসি তা কী করে বুঝবে? তবুও সে বলল চার্লস, লক্ষ্মীটি, তুমি কি আমার কাছে একবারের জন্যও আসবে না?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর চার্লস বলল–না, তুমি সব দোষ স্বীকার করে ফেলেছে। তোমার সঙ্গে এখন আমরা আর নিজেদের জড়াতে চাইছি না। এখন মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হত।

প্রতিটি শব্দ বিষ–তীরের মতো ট্রেসিকে আক্রমণ করছে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সে বোধহয় একটা গভীর বিবরের বাসিন্দা হয়ে যাবে। তবুও মরিয়া প্রয়াসে সে জানতে চায়–তাহলে এই বাচ্চাটার কী হবে?

ওপাশের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এখন কৌতুকের আভাস–সে তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। ওই বাচ্চা তোমার, আমি দুঃখিত ট্রেসি, তোমাকে এভাবে আঘাত করার জন্য।

ফোনটা কেটে গেল। পেছন থেকে একটা কয়েদী ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বলে উঠল–তোমার হয়ে গেলে ফোনটা ছেড়ে দাও। আমি আমার উকিলকে একবার ফোন করব।

মেট্রন সেলে ঢোকবার সময় জানিয়ে দিয়ে গেলেন। আগামীকাল সকাল পাঁচটার সময় যেতে হবে।

কে যেন একজন ট্রেসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে হতে পারে? অটো স্মিথ? এই ক ঘণ্টায় সে বুঝি আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে।

ট্রেসির দিকে তাকিয়ে সজল চোখে সে বলল–আমি তোমার কাছে শুধু এইটুকু বলতে এসেছি যে, আমি এবং আমার স্ত্রী–দুজনেই এই ঘটনায় খুব দুঃখ পেয়েছি। আমরা দুজনে বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি এই কাজ করতে পারো।

ট্রেসি মনে মনে বলল–আঃ, চার্লস কেন এই কথাগুলো উচ্চারণ করল না?

–আগামীকাল তোমার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে আমি উপস্থিত থাকব। আমার স্ত্রীও থাকবে।

–আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, ট্রেসি মনে মনে বলল, কাল আমাদের দুজনকেই কবর দেওয়া হবে–একজন মৃত এবং অন্যজন জীবিত।

সমস্ত রাত কেটে গেল ট্রেসির। বারবার চার্লসের কথাগুলো মনে পড়ছিল তার। জীবনে এভাবে সে বোধহয় কখনো অপমানিত হয়নি। হায় ঈশ্বর, চার্লসের কাছে সব কথা গুছিয়ে বলার সামান্যতম সুযোগটুকুও পেল না সে!

ওই পেটের বাচ্চাটার কী হবে? বাচ্চা জন্মাবার পর সরকার পক্ষ মা আর ছেলেকে আলাদা করে দেয়। অবশ্য এমন মাকে না চেনাই ভালো। ট্রেসি কাঁদতে লাগলো।

সকাল পাঁচটার সময় মেট্রন এলেন। সঙ্গে একজন পুরুষ কনস্টেবল। হুকুমটা চিৎকার করে পড়ে শোনানো হল–ট্রেসিকে দক্ষিণ লুইসিনিয়ার মেয়েদের জেলখানায় যেতে হবে।

লম্বা বারান্দা দিয়ে ট্রেসি হাঁটতে থাকল। দুপাশে কয়েদীরা নানাভাবে তাকে সম্ভাষণ করছে।

একজন বলল–আহা, এমন সুন্দর চেহারা, কী লাভ হল ছবি চুরি করতে গিয়ে...

–ছবিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো, একবার বলবে নাকি সোনামনি। আধাআধি বখরা হবে।

–যদি তোমাকে বড়ো বাড়িতে নিয়ে যায় তবে আর্নেস্টাইন লিটল চ্যাপের খোঁজ করো। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

টেলিফোনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্রেসি মনের অজান্তে বলে ফেলল–বিদায় চার্লস, সত্যিই তো, আর কখনো বোধহয় চার্লসের সঙ্গে তার দেখা হবে না। একটা সুন্দর স্বপ্নের পরিসমাপ্তি কীভাবে ঘটে গেল।

উঠোনে একটা হলদে রঙের কয়েদী গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তার ভেতর পাঁচ-ছজন আগে থেকেই বসে আছে। যেখানে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে ছোটো ছোটো খাঁচার ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ওখানকার জীবনযাত্রা নাকি দুঃসহ। ওরা কি তারই মতো দুর্ভাগ্যের শিকার। নাকি সত্যিকারের অপরাধী?

দুপাশে খোলা প্রান্তর, সবুজের সীমাহীন সমারোহ, আকাশে নীলের খেলা, কিন্তু সেদিকে তাকাবার মতো মন নেই ট্রেসির। নিজেকে ভীষণভাবে একা এবং নিঃসঙ্গ বলে মনে হল তার।

ছোট্টবেলার কথা মনে পড়ে গেল, ট্রেসি তখন খুবই ছোটো। মা-বাবার সঙ্গে সমুদ্রে। স্নান করতে গিয়েছে। বাবার কাঁধ থেকে নামতেই চাইছে না। বাবা বলেছিল–ছেলেমানুষি করো না ট্রেসি, ঝপাং করে ট্রেসিকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখনো চোখ বন্ধ

করলে সেই হাবুডুবু খাওয়া মুহূর্ত ভেসে ওঠে। তখন থেকে ট্রেসিকে একা একা লড়াই করতে হয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ার ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল বান্ধবী অ্যানি মাহোলেরের তদবিরে। সেখানে চার্লসের সঙ্গে দেখা হল। তারপরের ঘটনাগুলো, না, ঠিকমতো সাজাতে পারছে না।

কনস্টেবলের কর্কশ কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে এল ট্রেসির কী হয়েছে মেমসাহেব, কথাটা কি আমার কানে যাচ্ছে না? রুলের এক গুঁতো দিতে হবে নাকি?

ভ্যান দাঁড়িয়ে। সবাই নেমে গেছে। কী আশ্চর্য, ট্রেসি এতক্ষণ এখানে একা বসে আছে? গার্ড চেঁচাল, পৌঁছে গেছি।

নরকে, আপন মনে বলে ফিক করে হেসে ফেলল ট্রেসি। কী আশ্চর্য, দুঃখের এই। সজল মুহূর্তেও মানুষ তাহলে হাসতে পারে?

.

৫.

নতুন আসা কয়েদীদের মেট্রন উপদেশ দিচ্ছেন, মহিলার চেহারা গাঁট্টাগোট্টা। মুখের ভাব পাথরের মতো। দেখলেই মনে হয়, উনি কখনো হাসেননি, চুল ধূসর সাদা রং করানো। উনি বললেন–তোমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হবে। বাইরের জগতের কথা

একেবারে ভুলে যাবে। এখানে সব কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতিতে বাঁধা। নিয়ম ভাঙলে মুশকিল। কাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে সব আমার জানা আছে।

কথা বলতে বলতে একবার ট্রেসির দিকে তাকালেন মেট্রন। আগে তোমার ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। তারপর চান করানো হবে। এসব চুকে গেলে তুমি কোন্ সেলে থাকবে, তা ঠিক করা হবে। কাল সকাল থেকে কাজ পাবে। ঠিক আছে?

ফ্যাকাশে মুখের একটি মেয়ে বোধহয় কিছু বলতে চাইছে। সে বলল–মাফ করবেন, দয়া করে...

মেট্রন ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখে কর্কশ চাউনি ফুটে উঠল। মুখের কথায় খিস্তির তুবড়ি দিয়ে বললেন,–চুপ কর হারামজাদি ছুঁড়ি, নিজের থেকে একটা কথাও বলবি না। সব কটা মাগীর সম্পর্কে একই কথা। কেউ যদি কিছু বলার চেষ্টা করে তাহলে পেছনে এই রুলের গুঁতো ঢুকিয়ে দেব।

ভাষা এবং কথার সুর ট্রেসি ভাবতেই পারছে না, এই কুত্তিগুলিকে নিয়ে যা, দুজন মহিলা পাহাড়াদারকে নির্দেশ দিয়ে মেট্রন চলে গেলেন।

কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হল সাদা টালি বসানো একটা লম্বা ঘরে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাঝবয়েসী মোটা-সোটা একজন ভদ্রলোক। তিনি বোধহয় সকলের ডাক্তারি পরীক্ষা করবেন।

কয়েদীদের লাইনে দাঁড় করানো হল। ভদ্রলোক বললেন আমি ডাঃ গ্লাসকো। তোমরা সবাই কাপড়-জামা খুলে ল্যাংটো হয়ে দাঁড়াও।

কী করতে হবে বুঝতে না পেরে মেয়ে কয়েদীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

একজন বলল–কতটা খুলতে হবে?

এবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন ডাঃ গ্লাসকো। তিনি বললেন–ল্যাংটো বলতে কী বোঝায়, তা কি আবার শেখাতে হবে?

কেউবা উদাসীনের মতো পোশাক খুলতে লাগল। কেউ রাগে গড়গড় করতে করতে সায়ার গিঁটে হাত দিল। কেউ তখন খুব বেশী সাহসী হয়ে উঠেছে।

লাইনের প্রথম মহিলাকে ডাক্তার টেবিলের ওপর শুয়ে পড়তে বললেন। তারপর একটা যন্ত্র তার দুপায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন নির্মমভাবে। প্রশ্ন করলেন–খারাপ লোগ আছে নাকি? বলো তো খুকুমনি? না হলে যন্ত্রটা আরো ভেতরে ঢুকিয়ে দেব। তখন হ্যাঁ কেঁ করতে পারবে না।

মহিলা বলল–না।

–আছে কিনা তা শীগগিরই ধরা পড়বে। দ্বিতীয় মহিলাটিকেও ওই এক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। কী অদ্ভুত এখানকার নিয়মনীতি। স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো বিধি মানা হয় না।

ট্রেসি চিৎকার করে বলল–যন্ত্রটা একবার ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিন স্যার।

ডাক্তার গ্লাসকো নিষ্ঠুর ভাবে হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে ফুটে উঠল নির্মমতার চিহ্ন। তিনি বললেন, তোমার এসব স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি জ্ঞান ভালোভাবে জানা আছে দেখছি। মানুষ খুন করতে পারো আর ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়? যাও, তুমি লাইনের একেবারে শেষে গিয়ে দাঁড়াও।

উলঙ্গ ট্রেসি হেঁটে চলেছে। চারপাশে আরো ল্যাংটো মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা দৃশ্য যে কোনোদিন তাকে দেখতে হবে, সে সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে একেবারে লাইনের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে সব অপমান এখন সহ্য করতে হবে। মলদ্বারে আঙুল পুরে ডাক্তার দেখতে চাইলেন, সেখানে জোর করে কেউ কোকেন কিংবা গাঁজার পুরিয়া ভরে রেখেছে কিনা। তখন প্রায় বমি পেয়ে গিয়েছিল ট্রেসির। সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেল অদ্ভুত মন্তব্য। মেট্রন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, বমি করলে তোকে দিয়েই সেই বমি সাফ করাব। চেটে চেটে তোর বমিটা খেতে হবে নিজেকে।

ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে সকলে বাথরুমে গেল। অনেকগুলো শাওয়ার আছে। প্রত্যেককে শ্যাম্পু করে চান করতে হল। এবার ওদের পাঠানো হল পোশাকের ঘরে। প্রত্যেককে দেওয়া হল ধূসর রঙের কয়েদীর পোশাক। দুটো জুতো, দুটো নাইট গাউন আর দুটো ব্রেসিয়ার। চুল আঁচড়াবার জন্যে একটা করে ব্রাশ দেওয়া হল। এবার কয়েদীদের পোশাক পরে তারা গেল পাশের ঘরে। সেখানে সকলের আলাদা ফটো তোলা হল। আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। ট্রেসির মনে হল, এখন থেকে সে আর কোনো নামে পরিচিত হবে না, তার নামের পাশে একটা নম্বর পড়ে গেছে। তখনই হঠাৎ মৃত

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মর্গে শোয়ানো মায়ের পায়ের তলায় লোহার চাকতিতে একটা নম্বর ঝুলছিল। তার মানে সে আর মা দুজনেই এখন মানবীসত্তা থেকে নম্বরে পৌঁছে গেছে!

একজন গার্ড এসে ট্রেসির নাম ধরে ডাকল। তাকে বলল–ওয়ার্ডেন তোমাকে ডাকছেন।

কথাটা কানে যেতেই ট্রেসির মন আনন্দে নেচে উঠেছে। নিশ্চয়ই চার্লস এর মধ্যে এখানে এসেছে। প্রায় হাওয়ায় উড়তে উড়তে সে এল ওয়ার্ডেনের কাছে। আঃ, চার্লসের রাগ পড়ে গেছে। আমি যে অপরাধী নই, এই খবরটা সবাই জানতে পেরেছে, তা হলে আমি কি মুক্তি পাব?

লম্বা বারান্দা দিয়ে সে তখন উড়তে উড়তে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ ছ ফুট লম্বা একটা নারীদৈত্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার। ট্রেসিকে বুকের মাঝে জাপটে ধরে সেই বিশাল আকারের মহিলা ট্রেসির গার্ডকে বলল–এই চিড়িয়াটাকে কোথায় পেলে? একে আমার সঙ্গে রাখছো না কেন?

মহিলাটির কথায় সুইডিশ টান সুস্পষ্ট। তার বিকট চেহারা দেখে ট্রেসি আহত আর্তনাদ করার চেষ্টা করে।

–না বার্থা, ওকে অন্য সেলে দেওয়া হবে।

বার্থা নামের মহিলাটি ইতিমধ্যেই ট্রেসির শরীরের এখানে সেখানে চোরাগোপ্তা হাতের আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। ট্রেসি ছিটকে সরে দাঁড়াল। ঘেন্নায় তার বমি পাচ্ছে।

মহিলা বলল ঠিক আছে, ঠিক আছে ছুকড়ি। বার্থা তোর সঙ্গে পরে দেখা করবে। অনেক সময় আছে। তুই তো আজ বাদে কাল ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারবি না।

ওয়ার্ডেন জজ ব্র্যানিগান তার অফিসে বসে এক গাদা কাগজপত্র দেখছিলেন। বয়স চুয়াল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। বেশ সৌম্য শান্ত চেহারা।

পাঁচ বছর আগে নানা আদর্শকে সম্বল করে এখানে এসেছিলেন ব্রানিগান। কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন, নামে সংশোধনাগার হলে কী হবে, কারা চরিত্র সংশোধনের বিন্দু মাত্র সুযোগ সুবিধা এখানে নেই। বরং যেটুকু চারিত্রিক সততা অবশিষ্ট থাকে, চার দেওয়ালের মধ্যে এলে তাও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। যখন এখান থেকে কেউ ছাড়া পেয়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরোয়, তখন সে সত্যি সত্যি নির্মম এক হত্যাকারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সমস্ত সেল তার মান্ধাতা আমলের নিয়মনীতিতেই চলবে। আগে একটা সেলে দুজন করে রাখা হত। এখন চার থেকে ছজন পর্যন্ত কয়েদীকে ছাগল ঠাসার মতো ঠেসে দেওয়া হয়।

ওয়ার্ডেন কয়েদীর পোশাক পরা ট্রেসিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন–আহা, কী নিষ্পাপ মুখখানা। কাগজে ট্রেসির সব কথাই শুনেছেন ব্র্যানিগান। এই ধরনের প্রথম অপরাধেও পনেরো বছরের শাস্তি! না, ব্যাপারটার মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য যেখানে জোসেফ রোমানো যুক্ত, সেখানে হয়তো এমনটি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। ওয়ার্ডেন রোমানোকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। ট্রেসির সাজার মেয়াদ দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে আপত্তি জানাবেন কী করে?

–বসো, তোমার কাগজ পত্র দেখছিলাম।

ট্রেসির মনে হল, চার্লস নিশ্চয়ই সব কথা বলেছে।

ভদ্রলোক বলে চললেন–দেখতে পাচ্ছি, তুমি বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে। তোমাকে তো পনেরো বছরের জেল দেওয়া হয়েছে।

ট্রেসি এসব কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবটা মিলছে না কেন? বোকার মতো সে প্রশ্ন করল–স্যার, একটা কথা জানতে চাইব, যদি আপনি কিছু মনে না করেন। আপনার সঙ্গে চার্লসের কথা হয়নি?

–চার্লস? সে আবার কে? ওয়ার্ডেন বোকার মতো তাকালেন।

ট্রেসি দুঃখের সাগরে ডুবে বলল দেখুন স্যার, আমি নির্দোষ। এর আগে সব কয়েদীদের মুখ থেকে একই কথা ওয়ার্ডেনকে শুনতে হয়েছে।

–আদালত তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আমি তোমাকে একটাই উপদেশ দিতে পারি, জীবনের এই দুঃখজনক অধ্যায়টাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নাও। পনেরো বছর কম নয়, জেলে কিন্তু কোনো ঘড়ি থাকে না। এখানে শুধু ক্যালেন্ডার থাকে।

পনেরো বছর আমি নিশ্চয়ই এখানে থাকব না। তার আগে মরে যাব, কিন্তু পেটের ছেলে? তার কী হবে? সেই মুহূর্তে চার্লসকে ভীষণ ভীষণ ঘেন্না করতে ইচ্ছে হল ট্রেসির।

–তোমার যদি তেমন কোনো অসুবিধা হয়, ওয়ান ব্র্যানিগান বলতে থাকলেন, তাহলে আমাকে জানাবে।

মুখে আশ্বাস দিলেও ব্র্যানিগান জানেন, তার হাত পা বাঁধা, তিনি তো আর সেলের মধ্যে ঢুকে ব্যবস্থা করতে পারবেন না। মেয়েটি সুন্দরী এবং যুবতী। প্রত্যেকটা সেলে একটা করে যৌন বুভুক্ষু নারী কয়েদী আছে। এমন সুন্দরী মেয়ে দেখলে সমকামিতার চূড়ান্ত করবে। এমন একটাও সেল নেই, যেখানে মেয়েটা নিরাপদে থাকতে পারে। ওয়ার্ডেন এইসব ধর্ষণের নানা ঘটনা নিজের কানে শুনেছেন। চান করার ঘরে, বাথরুমে বারান্দায়, সর্বত্র ঘটে চলেছে সমকামিতার ঘটনা। হাতে-নাতে কাউকে ধরা যায় না। ধর্ষিতারা কেউ অভিযোগ করতে সাহস পায় না। তাদের চুপ করে থাকতে হয়, না হলে প্রচণ্ড মারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

–ভালোভাবে থাকলে বারো বছরে ছাড়া পেয়ে যাবে। ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগানের এই কথা শুনে ট্রেসি চিৎকার করে বলতে থাকে, না-না, বারোবছর...অতদিন আমি বাঁচব না।

গার্ড ছুটে এসে ট্রেসিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। তার দিকে অসহায়ের চোখে তাকিয়ে থাকলেন ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান। কতবার তিনি ভাবেন, এই চাকরি আর করবেন না। কিন্তু বাড়িতে গিয়েই তার মন পাল্টে যায়। পেটের টান বড়ো টান, তার জন্য মানুষ কত কী করে, আর এ তো বসে বসে মিথ্যে আশ্বাস বাক্য বলা।

এ বারান্দা সে বারান্দা করে নানা কয়েদীদের সেলের পাশ দিয়ে ট্রেসিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাদা চামড়ার মানুষ ছাড়াও নিগ্রো, চীনা বন্দিনী ছিল অনেক। সেখান থেকে নানা ধরনের মন্তব্য ভেসে আসছিল। কিন্তু কিছু কথার অর্থ সে একেবারে বুঝতে পারছে না।

কে যেন তাকে দেখে হো হো করে হেসে উঠল। কে বলল, আহা, প্রথম রাত।

পাশের ঘর থেকে কেউ বাকিটা বলে দিল–ফরাসী সঙ্গী।

তৃতীয় জনের কণ্ঠে তখন বেসুরো গান সুর হয়ে বেজেছে–তাজা প্রাণ।

...অঙ্গে অঙ্গ...

শেষ পর্যন্ত ট্রেসি বুঝতে পারল, ওরা সকলে একটি কথাকে বারবার বলতে চাইছে। তা হল টাটকা তাজা মাংস...

জেলখানার সি ব্লকে

৬.

জেলখানার সি ব্লকে সাতজন মহিলা কয়েদী ছিল। ট্রেসিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি ঘটে গেল।

সেলটার মধ্যে চারটে বাঙ্ক। ভাঙা আয়না বসানো ছোট্ট টেবিল। চারটে ছোটো ছোটো লকার। কোণের দিকে মুখ খোলা একটি কমোড।

ট্রেসির সেলের সঙ্গীরা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পুয়োর্তোরিকোর মেয়েটি প্রথমে বলল–একটা নতুন মিষ্টি জিনিস পেলাম বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েটাকে দেখতে খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু কপাল থেকে গলা অব্দি একটা দগদগে কালো দাগ। দেখতে বাচ্চা-বাচ্চা।

মাঝবয়েসী মোটাসোটা মেক্সিকান মহিলাটি গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইছে। সে বলল, তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। আহা, কী জন্য তুমি এখানে এসেছ বাছা? ধর্ষণ নাকি খুন? কী অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে?

ট্রেসি উত্তর দিতে পারছে না। তৃতীয় কয়েদীটি একজন নিগ্রো, ছ ফুট লম্বা, চোখ কুতকুতে মুখে সবসময় শয়তানীর মুখোশ আঁটা। মাথাটা কামানো। সে বলল, ওই কোণের বাঙ্কটা তোমার।

ট্রেসি এগিয়ে গেল। গদিটা নোংরা, কোনোদিন কাঁচা হয় না। ধুলো আর নানা ধরনের দাগে ভর্তি।

ট্রেসি চিৎকার করে বলল–এখানে আমি শুতে পারব না।

এই প্রথম মেক্সিকান কয়েদিটির চোখে একটা অদ্ভুত হাসির চাউনি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে সে বলল–-কে তোমাকে ওখানে শুতে বলেছে সোনা মেয়ে, তুমি তো আমার সঙ্গে শোবে।

ওদের চোখের দিকে তাকাতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ট্রেসির সমস্ত শরীরে। কয়েদি তিন জন যেন ট্রেসিকে নগ্ন করে দেখছে। তখন সে বুঝতে পারল, টাটকা মাংস এই শব্দদুটোর অন্তরালে কোন্ অর্থ লুকিয়ে আছে। একটা অজানা ভয় তখন ক্রমশ ট্রেসিকে গ্রাস করছে। তার মেরুদণ্ড দিয়ে হঠাৎ প্রবাহিত হল শীতল শিহরণ।

কোনোরকমে সাহস এনে সে বলল–পরিষ্কার তোষক পেতে হলে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে?

নিগ্রো মহিলাটি ঠোঁট উল্টে বলল–ঈশ্বর, তবে কিছুদিন হল ঈশ্বরকে আমরা ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

–ট্রেসি বুঝতে পারল, এখন তাকে এই অবস্থার সঙ্গে আপোস করতেই হবে। বৃথা চোখের জল ফেলে কী লাভ? সে ভাবল, এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। এখানে এই নরকের পরিবেশে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

তার মনের কথা হয়তো বুঝতে পেরেছিল ওই কালো নিগ্রো মহিলাটি। সে বলল স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও খুকুমণি। তাহলে দেখবে আর জলের ঝাঁপটা তোমাকে আঘাত করতে পারছে না।

ওয়ার্ডেনও এই ধরনের কথা বলেছিলেন। কৃষ্ণকায় মেয়েটি আবার বলল–আমি আর্নেস্টাইন লিটল চ্যাপ। মুখে কাটা দাগওয়ালাকে দেখিয়ে আবার সে বলল–ও হল লোলা, পুয়ের্তোরিকো থেকে এসেছে। আর ওই মুটকি মাগীটার নাম কী জানো তো? সে হল পাউলিটা। তুমি কে? তোমার নাম কী? দেখেতো মনে হচ্ছে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারো না। অথচ তোমাকে কিনা পনেরো বছর এখানে থাকতে হবে। আহা, মুখ দিয়ে চুকচুক করে একটা শব্দ করল নিগ্রো মেয়েটি।

–আমি ট্রেসি হুইটনি, আমার অপরাধ? জানি না? ট্রেসি অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তার কেবলই মনে হল, সে তার সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। সে যেন দুঃস্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে।

মোটা মেয়েটি জানতে চাইল, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এখন কোনো কথা বলতে ভালো লাগছে না ট্রেসির। নোংরা তোষকের একপাশে বসে পড়ল সে। স্কার্ট দিয়ে কোনোরকমে কপালের ঘাম মুছল। ওয়ার্ডেনকে বলা উচিত ছিল, ওর পেটে বাচ্চা আছে। তা হলে হয়তো ও একটা ভালো সেলে জায়গা পেতে পারত।

বাইরের বারান্দাতে কার পায়ের শব্দ? উৎসুক চিত্তে ট্রেসি ছুটে গেল গরাদের কাছে। মেট্রন আসছেন, শুনছেন, ট্রেসি চিৎকার করে বলতে চাইছে, ওয়ার্ডেন ব্রানিগানের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

–এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঘাড় না ঘুরিয়ে মেট্রন উত্তর দিলেন।

চাপা কান্নাকে কোনো রকমে আটকে রেখে বাঙ্কে ফিরে এল ট্রেসি। তারপর তার ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিল নোংরা তোষকের ওপর।

দশ বছরের জন্মদিনের কথাটা বারবার মনে পড়ে যায় ট্রেসির। বাবা বলেছিলেন, আজ আমরা আঁতোয়ানেতে ডিনার খাব।

আঁতোয়ানেত খুব নাম করা রেস্টুরেন্ট। বড়োলোকদের ব্যাপার। ওখানে যেতে গেলে অনেক পয়সা খরচ হবে। ট্রেসি জানত, অত টাকা বাবার নেই। খরচের কথা উঠলে, বলা হত, আসছে বছর হবে। আর তারা কিনা যাচ্ছে আঁতোয়ানেতে খেতে? ট্রেসির মা সুন্দর সবুজ একটি ফ্রক তাকে পরিয়েছিল।

বাবা ঠোঁট ফুটিয়ে বলেছিলেন, কী সুন্দর দেখতে দুজনে, তাকিয়ে দেখার মতো।

নিউ অর্লিয়েন্সের দুজন সুন্দরী আমার সঙ্গে চলেছে। পথ চলতি সবাই তো আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে।

আঁতোয়ানেত সম্পর্কে ট্রেসি মনে মনে যা কল্পনা করেছিল, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। সেখানে গিয়ে ট্রেসির মনে হয়েছিল, সে বুঝি সত্যি সত্যি রূপকথার জগতে ঢুকে পড়েছে। প্লেটগুলোতে সোনার অক্ষরে রেস্টুরেন্টের নাম লেখা। এক সময় নাকি রাজারানিরা এখানে ডিনার খেতে আসতেন। ট্রেসি তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড়ো হলে সে রোজরাতে এখানে এসে রাতের খাবার খাবে। মা বাবাকে তার সঙ্গে আনবে।

বার্থডে কেক কাটার সময় ওয়েটাররাও হ্যাপি বার্থডে বলে গান গেয়েছিল। যারা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলেন, তারাও সকলে আনন্দে হাততালি দিয়েছিলেন। সবুজ ফ্রক পরা ট্রেসিকে মনে হচ্ছিল, সবুজ এক উড়ন্ত জলপরী। রাস্তা দিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছিল একটা গাড়ি। ট্রেসি সেই শব্দটাও শুনতে পেয়েছিল।

সেই ঘণ্টাধ্বনি কি এখনো বেজে চলেছে?

লিটলচ্যাপ বলল খাবার ঘণ্টা পড়ল। ট্রেসির স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। শব্দ করে সেলের দরজা খুলে গেছে। সবাই বেরোচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রেসিকে এখন বাইরে বেরোতে হবে। কিন্তু, সে চোখ বন্ধ করল। এতটুকু খিদে নেই তার। নাঃ, এখানে বসে সে খেতে পারবে না।

পুয়ের্তোরিকোর সেই কমবয়সী মেয়েটা ট্রেসিকে টানতে টানতে বলল–এই খাবার সময় হয়েছে চল।

–খিদে নেই, খাওয়ার কথা চিন্তা করতেই বমিটা চাপ দিয়ে উঠল।

–খিদে পাক বা না পাক, তোমাকে খেতে যেতেই হবে। মেক্সিকান মহিলা পাউলিটা বলল।

ঘরের বাইরে তখন সকলে লাইন দিতে শুরু করেছে।

লিটলচ্যাপ ট্রেসিকে সাবধান করে দিয়ে বলে–ওঠো, চলো, না হলে চাবকে পাছার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।

যাব না, এখানেই থাকব। ট্রেসি মনে মনে বলল।

হঠাৎ মেট্রনকে চোখের সামনে দেখতে পেল সে। মেট্রন চিৎকার করে বললেন–এই ঘণ্টা শুনতে পাওনি। যাও, লাইনে দাঁড়াও।

–না, আমার খিদে নেই মেট্রন।

মেট্রনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সেলের মধ্যে ঢুকে ট্রেসির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, নিজেকে কি মনে করেছিস ঘুড়ি। ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেবে? যা, লাইনে দাঁড়া। একবার রিপোর্ট করলে মজা বুঝবি, তখন দেখবি, কত ধানে কত চাল।

ট্রেসি কোনোরকমে লাইনে এসে দাঁড়াল। বলল, কেন আমি যদি—

লিটলচ্যাপ বলল–চুপ, লাইনে কথা বলবে না কেউ।

খাবার ঘরটা বিরাট। লম্বা টেবিল পাতা, দুদিকে কাঠের চেয়ার। কাউন্টার থেকে খাবার এনে টেবিলে বসে খেতে হয়। খাবার মুখে ভোলা যায় না। ফ্যাকাশে কাস্টার্ড আর জলের মতো কফি।

ট্রেসি নিজের প্লেটে খাবার নিল। এবার কী করতে হবে সে জানে না। আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপ গেল কোথায়? তাকে তো ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা লোলা আর পাউলিটার পাশে বসে পড়ল। ওখানে প্রায় কুড়ি জন বসে থালা খালি করছে। নিজের থালার দিকে তাকিয়ে বমি এসে গেল ট্রেসির। সঙ্গে সঙ্গে থালাটা সে পাশে সরিয়ে দিল।

পাউলিটা ওর থালার খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে।–তুমি যদি একান্ত না খাও, তাহলে এগুলোর সদগতি আমিই করি, কী বলে?

লোলা ট্রেসিকে বলল–এরকম করো না ট্রেসি, কদিন তুমি না খেয়ে থাকবে বলো?

ট্রেসি ভাবল, না খেয়ে খেয়ে মরে গেলে কেমন হয়? এই মেয়ে মানুষগুলো কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে তা সে ভাবতেই পারছে না। বুক থেকে চাপা কান্না বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোনোরকমে দাঁতে দাঁত চেপে সে কান্নাটাকে চাপল।

পাউলিটা বলল ওরা যদি দেখে ফেলে তুমি খাচ্ছো না তাহলে তোমাকে বিং-এ পাঠিয়ে দেবে।

–বিং কী? বোকার মতো ট্রেসি জানতে চাইল।

–বিং মানে কী জানো না? সেটা একটা গর্ত, সেখানে তোমাকে একেবারে একা থাকতে হবে।

কথাটা বলতে বলতে পাউলিটা ট্রেসির মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল খোয়াড়ে তুমি নতুন এসেছ, তাই একটা উপদেশ দিয়ে রাখি। আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপের সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করবে। আমরা সকলে তার খুব অনুগতা। এখানে তার মুখের কথাই কিন্তু আসল আইন।

তিরিশ মিনিট বাদে আবার ঘণ্টা পড়ল। সবাই একলাফে লাইনে এসে দাঁড়াল। খাওয়া হয়ে গেছে। এখন বিকেল চারটে বাজে। আলো নিভবে রাত নটায়। এই পাঁচ ঘণ্টা নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সকলকে।

সেলে ফিরে এসে দেখল লিটলচাপ বসে আছে। খাবার সময় তাহলে সে ছিল কোথায়? ট্রেসির পেটটা এবার গুলিয়ে উঠেছে। কোণের দিকে যে খোলা কমোডটা আছে, ওটা এখন ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এদের সামনে সে এটা ব্যবহার করবে কেমন করে? আলো নিভুক, তারপর না হয় দেখা যাবে।

লিটলচ্যাপ জানতে চাইল, তুমি নাকি আজ খাওনি। এরকম বোকামি ভবিষ্যতে আর কখনো করো না। কেউ তোমাকে দেখতে আসবে না।

ও কী করে খবরটা এর মধ্যে পেয়ে গেল? ওর মাথাব্যথা কেন? মনে মনে ভাবল ট্রেসি। তারপর জানতে চাইল, আচ্ছা ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে হলে কী করতে হবে?

–দরখাস্ত দিতে হয়। গার্ডরা ওটা নিয়ে পায়খানায় যায়। আর যারা ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওরা তাদের একেবারেই সুনজরে দেখে না।

লিটলচ্যাপ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলল–এখানে নানা ধরনের ঝঞ্ঝাট হয়। তোমার দরকার সত্যিকারের একজন ভালো বন্ধু, যে তোমার সব অভাব অভিযোগগুলো বুঝতে পারবে।

লিটলচ্যাপ ট্রেসির কাঁধে হাত রেখে একটুখানি হাসল। তার সোনা বাঁধানো দাঁত ঝকঝক করে উঠল। ট্রেসির মনে হল লিটলচ্যাপের মাথাটা বুঝি একলাফে ছাদ ছুঁয়েছে। এত লম্বা মেয়ে মানুষ সে জীবনে কখনো দেখেনি।

–ঐ লম্বা জানোয়ারটা কী বাবা?

–ওটা জিরাফ। অদ্রুবন পার্কে বাবার সাথে ছোটোবেলায় বেড়াতে যেত ট্রেসি। লিটলচ্যাপকে দেখে তার সেই ছোটোবেলার গল্পটাই মনে পড়ে গেল।

প্রত্যেক ছুটির দিন ট্রেসি মা আর বাবার সঙ্গে কোথাও না কোথাও যেত। চিড়িয়াখানাতে গিয়ে তার মনটা খারাপ হয়ে যেত। খাঁচার মধ্যে পশুপাখিদের দেখে ভীষণ-ভীষণ কষ্ট হত তার। একবার বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল, আচ্ছা বাবা, খাঁচায় থাকতে ওদের কষ্ট হয় না?

বাবা হেসে বলেছিল–নারে, ওরা বেশ আরামে থাকে। সব সময় ভালো মন্দ খাবার পায়। প্রাণের ভয় থাকে না।

বাবার এই কথাটা ট্রেসির একদম ভালো লাগেনি। সে জীবনে কোনোদিন খাঁচায় থাকবে না, এমন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল।

আর আজ? জীবনের পনেরোটা বছর তাকে এই বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে কাটাতে হবে। এটা ভাবতে গিয়ে তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।

রাত পৌনে নটার সময় ঘণ্টা পড়ল। ট্রেসির সেলের সঙ্গিনীরা দিনের পোশাক ছেড়ে রাতের পোশাক পরতে শুরু করেছে। ট্রেসি চুপচাপ বসে আছে দেখে লোলা বলল, সময় । কিন্তু মাত্র পনেরো মিনিট। তার মধ্যে পোশাক পরে নিতে হবে। এবার শুতে যেতে হবে।

মেট্রন বাইরে থেকে দেখতে পেলেন ট্রেসি বসে আছে। লিটলচ্যাপকে বললেন–ও বসে কেন? ওকে বলোনি, কী করতে হবে?

–হ্যাঁ বলেছি।

মেট্রন ট্রেসিকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা ঝঞ্ঝাট পাকাতে চায় তাদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।

পাউলিটা বলল–ও যা বলে, তা করা খুকুমণি। ওর নাম আমরা দিয়েছি পুরোনো লোহার প্যান্ট। এক নম্বর কুত্তির বাচ্চা।

ট্রেসি ধীরে ধীরে উঠে গেল। এক কোণে গিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে জামাকাপড় খুলে ফেলল। জাঙ্গিয়াটা খুলতে পারল না। মোটা খসখসে কাপড়ের নাইট গাউনটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিল। বুঝতে পারল, বাকি তিনজন ওর নগ্ন শরীরটা যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

পাউলিটা মন্তব্য করল, তোমার শরীরটা খাসা।

লোলা বলল–সত্যি, দারুণ সুন্দরী তুমি।

ট্রেসির সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। লিটলচাপ এখন ট্রেসির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। লিটলচ্যাপ কোনোরকমে বলছে, আমরা তোমার বন্ধু। তোমার দেখাশোনা আমরা তিনজন ভালো ভাবেই করব।

এক ধাক্কায় নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল ট্রেসি। আমাকে একলা থাকতে দাও। আমি তোমাদের মতো নই।

লিটলচ্যাপ হাসতে হাসতে বলল–আমরা যেমনটি বলব, তেমনটি হতে হবে তোমাকে। চিৎকার করলেও কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

পাউলিটা বলল–আরে ছেড়ে দাও, প্রথম রাত ওকে একটু ধাতস্থ হবার সময় দাও। রাত তো অনেক বাকি।

আলো নিভে গেল।

আশঙ্কায় আর ভয়ে ট্রেসির সমস্ত শরীরটা তখন কাঠ হয়ে গেছে। খাটের ধারে কোনোরকমে বসেছিল সে। ভাবছিল, এই বোধহয় তিনজন শয়তান কুত্তি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ট্রেসি আবছা আবছা শুনেছে যে, এদের মধ্যে ঢালাও ভাবে সমকামিতা চলে। ওদের কথাবার্তাগুলোর মধ্যে তার আভাস ইঙ্গিত পেয়েছে সে। কিন্তু, ওরা যদি কিছু করার চেষ্টা করে, তাহলে ট্রেসি কী করবে। ট্রেসি চিৎকার করবে? গার্ড ছুটে আসবে। জেলে এসব হতে দেওয়া ঠিক নয়।

রাত বাড়তে থাকল। অথচ, ওরা তেমন কিছু করছে না কেন? অন্ধকারের মধ্যে ট্রেসি বুঝতে পারল, ওরা তিনজন পরপর বাথরুম সেরে নিয়েছে। একটু বাদে নিজের সেই অবস্থা হয়েছে। সে কমোডটার কাছে গিয়ে চেন টানল। চেন কাজ করছে না। কোনোরকমে নাক, টিপে বাথরুম সারল।

কাল সকালে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ওয়ার্ডেনকে বলতে হবে, তার পেটে বাচ্চা আছে। ওয়ার্ডেন নিশ্চয়ই তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবেন। আজ রাতটা সে ঘুমোত পারবে না। জেগে জেগেই সমস্ত রাত কাটিয়ে দেবে।

বসে থাকতে থাকতে কোমরের ব্যথায় খাটে শুয়ে পড়েছে টেসি। রাত তিনটের পর ও আর জেগে থাকতে পারল না। ঘুমে চোখের দুটি পাতা তখন এক হয়ে এসেছে।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল ট্রেসির। বেশ বুঝতে পারল, কে যেন ওর মুখ চেপে ধরেছে। অন্য কেউ একজন ওর বুকে হাত দিয়েছে।

ট্রেসি উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না, ওরা ওর নাইট গাউন আর প্যান্টিটা টেনে টেনে খুলে ফেলেছে। ট্রেসি তখন মরীয়া হয়ে লড়াই করতে শুরু করেছে। ফিসফিস করে কে যেন বলছে–ট্রেসি, ছিঃ এরকম করে না। সহজভাবে সব ব্যাপারটা নাও। নাহলে এখানে থাকবে কেমন করে?

শব্দটা লক্ষ্য করে ট্রেসি পা চালিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরটা একেবারে পাল্টে গেছে। সেখানে এখন একটা কর্কশ আওয়াজ ফুটে বেরোচ্ছে।

কুত্তিটা বড় বাড়াবাড়ি করছে। এবার, একে মেঝেতে ফেল।

মুখে আর পেটে দমাদম দুটি ঘুসি পড়ল। কে যেন পেটের ওপর চেপে বসেছে। প্রচণ্ড ভাবে চড়চাপড় লাগাচ্ছে। একটা অস্থির হাত ট্রেসির দেহের সমস্ত গোপন অঙ্গে খেলা করছে।

মুহূর্তের মধ্যে ট্রেসির সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। সেই সুযোগে কে যেন ওর মাথাটা লোহার গরাদে দুম করে ঠুকে দিল। ওকে ইতিমধ্যেই মেঝেতে চিৎ করে ফেলা হয়েছে।

কেউ ওর হাত পা দুটোকে চেপে ধরে রেখেছে। তিন জনের সঙ্গে একা ও পারবে কেন? হিমশীতল হাত দিয়ে কে যেন ওর সারা শরীরকে পিষছে। গরম জিভ দিয়ে ওকে পালাক্রমে চাটা হচ্ছে। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা। কে একজন একহাত দিয়ে ওর গলা চেপে ধরল। ট্রেসি চিৎকার করে দাঁত বসিয়ে দিল।

একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে এল।–কুত্তি মাগি।

মুখে ঘুষির পর ঘুষি পড়ছে। ট্রেসি ব্যথা অনুভব করছে। শেষ অব্দি সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ঘণ্টার কর্কশ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল বেচারী ট্রেসির। দেখতে পেল সম্পূর্ণ নগ্নিকা হয়ে সিমেন্ট বাঁধানো ঠাণ্ডা মেঝের ওপর নিজেকে শুয়ে থাকতে। সেলের সঙ্গিনী তিনজন নিজেদের বাঙ্কে শুয়ে আছে।

বাইরের বারান্দাতে লোহার প্যান্ট চিৎকার করতে করতে আসছিলেন উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। সকাল হয়েছে। এবার সবাইকার ঘুম ভাঙাতে হবে।

ট্রেসিদের সেলের সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রক্তের মধ্যে ট্রেসি পড়ে আছে। মুখে চোখে মারের চিহ্ন, একটা চোখ ফুলে গিয়ে বন্ধ হবার জোগাড়।

দরজা খুলে মেট্রন ভেতরে ঢুকলেন–এখানে আবার কী হাঙ্গামা হল?

পা দিয়ে ট্রেসির পাঁজরে খোঁচা মেরে বললেন–এই হতভাগী মাগি, এবার তোর ঘুম ভাঙবে কিনা দেখছি।

ট্রেসির মনে হল, অনেক বছরের ওপার থেকে কে যেন কথা বলছে। না, আমাকে উঠতেই হবে। এখানে আমি থাকতে পারব না। মনে মনে কঠিন শপথ উচ্চারণ করল সে। কিন্তু উঠতে পারল না। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা।

কাঁধ চেপে ধরে মেট্রন সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন ট্রেসিকে। মনে হচ্ছিল, ট্রেসি এবার মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

মেট্রন জানতে চাইলেন, কী হয়েছিল?

একটা চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য চোখটা আধখোলা। ট্রেসি দেখতে পেল, মেট্রন তার জবাবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

–আমি-আমি, ট্রেসি তোতলাতে থাকে। সত্যি কথাটা কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কা করছে সে। সে বলল, আমি বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

মেট্রন ধমক দিয়ে বললেন, বেশী চালাকি আমি মোটেই পছন্দ করি না। গর্তে কিছুদিন থাকলে তুমি ভদ্র হতে শিখবে।

এ যেন এক বিস্মৃতির জগত। মনে হচ্ছে সে বুঝি মাতৃগর্ভে ফিরে গেছে। চারপাশে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথায় কোনো আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে একটা হো েষক, কোণের দিকে একটা গর্ত, বেসমেন্টের একটা ছোট্ট সেল, তাই বোধ হয় ওটাকে গর্ত বলা হয়।

শরীরের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেছে, এখনো তার ধকল চলছে। ট্রেসি ভাবল, আমি তো বাঙ্ক থেকে পড়ে গেছি, মা নিশ্চয়ই আমাকে দেখবে। ওর গলা দিয়ে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা শব্দ বেরিয়ে এল, মা, মাগো, কোনো উত্তর পেল না সে। আবার ঘুমের অতল তলে তলিয়ে গেল।

প্রায় দুদিন একটানা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ট্রেসি। মানসিক যন্ত্রণা অনেকখানি কমে এসেছে। নিজের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করল সে। হাজার রকমের চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর বেশ মনে হল, ডাক্তারের কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন- একটা পাঁজর ভেঙেছে, কবজির হাড় ভেঙেছে। কাটা জায়গার জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। পেটের বাচ্চাটি মারা গেছে।

ট্রেসি ডুকরে কেঁদে উঠল, আমার বাচ্চাকে ওরা মেরে ফেলেছে। ওর কান্না আর থামতে চাইছে না।

ঠান্ডা তোষকের নীচে শুয়ে আকাশ পাতাল নানারকম চিন্তা করছিল ট্রেসি। তখন তার মনে শরীরে কোথাও দুঃখের চিহ্ন মাত্র নেই। তার কেবলই মনে হচ্ছে, ঈশ্বরের কোনো এক অদৃশ্য আশীর্বাদে তার সব কষ্ট দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। তার সমস্ত শরীরে তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। সে আগুন প্রচণ্ড ঘৃণার। মনে হচ্ছে, এখনই তাকে

প্রতিশোধ নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই চিন্তাটাই তাকে আচ্ছন্ন করল। সেলের ওই তিনজন মেয়ে কয়েদির বিরুদ্ধে তার অনেক রাগ আছে, একথাটা সত্যি, কিন্তু ওরাও তো তারই মতো ভাগ্যবিড়ম্বিতা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এই জেলে এসেছে। না, এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু ওই পুরুষগুলো? সভ্যতার মুখোশ আঁটা ওই পুরুষগুলোর জন্যই তো আজ আমাদের এই অবস্থা?

জো রোমানো, তোমার বুড়ি মাটা আমার সাথে টক্কর দিতে চেয়েছিল কিন্তু একথা বলেনি, তোমার মতো একটা শাঁসালো রসালো সোথ মেয়ে আছে তার। জো রোমানো, অ্যান্টনি ওরসেত্তি নামে একজনের হয়ে কাজ করে। ওরসেত্তি যে গোটা অর্লিয়েন্স শহরটাকে চালায়। পেরী পোপ–দোষ স্বীকার করে নিয়ে বিচার চালানোর খরচ থেকে আপনি সরকারকে বাঁচাবেন।

জজ হেনরি লরেন্স–আগামী পনেরো বছর তোমাকে জেলখানায় থাকতে হবে।

ট্রেসি অন্ধকারের দিকে তাকাল, অনেকগুলি নাম তখন ভেসে চলেছে। এই চারটে লোক ট্রেসির আসল শত্রু? এছাড়া আছে চার্লস, ট্রেসির কথা সে শুনতেই চায়নি। উল্টে বলেছে, টাকার এত দরকার তুমি আমাকে খুলে বলোনি কেন? তোমার পেটের বাচ্চা? তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই করবে

হ্যাঁ, শাস্তি ওদের পাঁচজনকে পেতেই হবে। প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ভাবে শাস্তি দেবে ট্রেসি। কিন্তু এভাবে? না, এখন আকাশ পাতাল ভেবে কোনো লাভ নেই। আজ : অথবা

আগামীকাল একদিন প্রতিশোধের স্পৃহা পূর্ণ করবে ট্রেসি। অবশ্য যদি সত্যি সত্যি তার হাতে সময় ও সুযোগ আসে।

.

৭.

এই অন্ধকূপে সময় এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। মাঝে মাঝে ট্রেসির মনে হয়, এখানে। সময়ের কোনো মূল্য নেই। দিন না রাত, কিছু বুঝতে পারে না সে। এই মাটির তলার সেলে জীবনের কতগুলো দিন কেটে গেছে, ট্রেসি তার খবর রাখে না। রোজ দরজার তলা দিয়ে ঠান্ডা খাবার ঠেলে দেওয়া হয়। জোর করে সেগুলো গিলে ফেলে ট্রেসি। পাউলিটার কথাটা সে মনে মনে আবৃত্তি করে এখানে বাঁচতে হলে খেতেই হবে। একটা কথা ট্রেসি বুঝতে পেরেছে। ও যা চায়, তাই করতে হলে শরীরটাকে নীরোগ রাখতে হবে। ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো এতদিনে হতাশায় ভেঙে পড়ত। দীর্ঘ পনেরো বছর তাকে জেলখানায় থাকতে হবে। টাকা পয়সা নেই, আত্মীয় বন্ধু বলতে কেউ নেই। একমাত্র প্রেমিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার চারপাশে শুধুই শূন্যতা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে একটা সাহসের উৎসার অনুভব করল। একটা অজানা শক্তি প্রতি মুহূর্তে তাকে আরো বেশী শক্তি দিচ্ছে। বলছে, শত্রুদের মোকাবিলা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আত্মার সাহস ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই। তার দেহে ইংরেজ এবং আইরিশের রক্ত প্রবাহিত। এই দুই জাতের সব কটি গুণকে সে অধিকার করেছে। তার আছে ইচ্ছা শক্তি এবং আকাশ ছোঁয়া সাহস। সে জানে, তার পূর্বপুরুষরা দুর্ভিক্ষ, প্লেগ

এবং বন্যার সঙ্গে অসম লড়াই। করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল। তাকে বিপদ সঙ্কুল এমন একটা পথের পথিক হয়ে বাঁচতে হবে।

কিন্তু এই জেলখানা থেকে সে কেমনভাবে পালাবে? জেল থেকে পালাবার ফন্দিফিকির নিয়ে ভাবতে শুরু করল ট্রেসি।

শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। দুর্বল হলে কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। সেলটি এত ছোটো যে, এখানে কেউ কোনো ব্যায়াম করতে পারবে না। তবে চীনা সন্ন্যাসীদের মতো চিচুয়ান অভ্যাস করা চলে। এই ব্যায়ামের জন্য সামান্য জায়গা লাগে। এতে শরীরের প্রতিটি পেশীর ব্যায়াম হয়ে যায়। ট্রেসি খাড়া হয়ে দাঁড়াল। প্রথম ধাপ থেকে শুরু করতে হবে। প্রত্যেকটা আসনের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে।

প্রত্যেকটিকে আলাদা নামে ডাকা হয়ে থাকে। প্রথমটি হল দৈত্যকে ঘুষি মারা। তারপর আলো সংগ্রহ করা। হাত-পা, শরীরের গতি খুব স্বাভাবিক হবে। রাজকীয় ভঙ্গিতে সে একবার সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং পরক্ষণেই পেছনের দিকে আসবে। প্রত্যেকটি ভঙ্গি এবং অঙ্গ সঞ্চালনের উৎস হচ্ছে তানকিন অর্থাৎ মনকেন্দ্র। ট্রেসির মনে হল, সে বোধহয় তার গুরুর জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে–তোমরা বি-কে প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করো। শুরু হবে পর্বত পরিমাণ ভার নিয়ে, শেষ হবে পালকের মতো হাল্কা ভাবে।

ট্রেসি বুঝতে পারল, তার সমস্ত শরীর ঘিরে একটা আশ্চর্য শক্তি প্রবহন শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে এই শক্তিটাকে হৃদয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করল ট্রেসি।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

পাখির লেজ চেপে ধরো, সাদা সারস পাখি হয়ে যাও। বাঁদরকে প্রতিহত করো। বাঘের মুখোমুখি হও। তোমার হাত দুটো হবে মেঘ, জীবনের জলপ্রবাহকে তুমি দুহাত দিয়ে মথিত করবে। গুরুর গলা তখন গমগম করছে চারপাশে।

গুরু আরো বলেছিলেন সাদা সাপকে বশীভূত করো। বাঘের পিঠে চড়ে বসো। আঘাত হানো বাঘের ওপর। তোমার চি-কে আবার গুটিয়ে নাও। নিজের তানকিন অর্থাৎ মনঃকেন্দ্রে চলে যাও।

এক ঘণ্টা ধরে ট্রেসি পুরো ব্যায়ামটা করল। ক্লান্তি নেমেছে তার সমস্ত শরীরে। এই ভাবে প্রত্যেক দিন ধরে তার সাধনা এগিয়ে চলেছে। ক্রমশ তার শরীর এবং মন সাড়া দিতে শুরু করল। সে যে একটা দারুণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে সেটা বুঝতে পারল। শরীরের ব্যায়াম করার সময়টুকু বাদে অন্য সময় কী করে? সে একমনে মনের ব্যায়াম করে। অন্ধকারের মধ্যে বসে সে মনে মনে জটিল অঙ্কের সমাধান করতে পারে। ব্যাঙ্কের কমপিউটারে প্রতিটি ফ্লপিতে কী আছে, তা মনে করার চেষ্টা করে। অন্ধকারের মধ্যেই সে বিখ্যাত কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে। কবে কী নাটক করেছে তার কথা স্মরণ করে। ভিন্নভিন্ন সুরে কথা বলার অভ্যাস করে। চালর্সের কথা মনে এলেই সে জোর করে চার্লসের ছবি মনের অ্যালবাম থেকে ছিঁড়ে ফেলত। তার জীবনের ওই দিকের দরজাগুলিকে সে চিরকালের মতো বন্ধ করে দিয়েছে। তবুও আমরা দরজা বন্ধ করলে কি বসন্ত বাতাসের আগমনকে প্রতিহত করতে পারি? মাঝে মাঝে চার্লসের মুখচ্ছবি মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে। উদভ্রান্তের মতো সে অজানা অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকত, আর ভাবত, চালর্সকে আমি কি ক্ষমা করতে পারব?

শত্রুদের কীভাবে খতম করবে? প্রত্যেককে শাস্তি দিতে হবে। ওরা আমার জীবনের আলো কেড়ে নিয়েছে। আমি ওদের চোখের সামনে অন্ধকার পৃথিবী রচনা করব।

এই অন্ধকূপে থাকলে সমস্ত কয়েদির মনোভাব একেবারে গুঁড়িয়ে যায়। সপ্তম দিনে ট্রেসির সেলের দরজা খুলে গেল। এক ঝলক আলোতে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গার্ড বলল, ওঠো, তোমাকে ওপরে যেতে হবে।

ট্রেসিকে উঠে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করার কাজে এগিয়ে এল পাহারাদার। আগে যাদের রাখা হত, তারা দুমড়ে মুচড়ে যেত। নিজে থেকে দাঁড়াতে পারত না। অথবা উন্মাদ হয়ে চিৎকার করত। ট্রেসি কিন্তু এ দুটোর একটাও করল না। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। গটগট করে বাইরে চলে এল। জেলের আবহাওয়ার মধ্যে এমন গর্বিত এবং অহঙ্কারী ভাব মানায় কি?

ট্রেসির এমন ব্যবহার দেখে পাহারাদার অবাক হল। এমন মেয়েমানুষ সে জীবনে দেখেনি। একটু সাফসুতরো করে নিলে ভালোভাবে ভোগ করা যাবে। সে ট্রেসিকে বলল, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এমন শাস্তি পাওয়া কি উচিত? তুমি আর আমি যদি বন্ধু হয়ে যাই, তাহলে তোমাকে আর কখনো সেলে পচে মরতে হবে না।

ট্রেসি গার্ডের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ট্রেসির চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। পাহারাদার ওকে দেখে ভয়ে সিটকে গেল।

ওপরে মেট্রনের ঘরে যেতে তিনি চিৎকার করে বললেন–তোমার গা দিয়ে বিশ্রী ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছে। আগে চান করে এসো।

খুব ভালো করে চান করল ট্রেসি। প্রাণ ফিরে পেল সে। ওকে বলা হল ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। প্রথমবার এরকম ডাক পেয়ে সে ভেবেছিল, সে বুঝি ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারল, এটা নেহাতই একটা নিয়ম।

ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান পিছন ফিরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেসি ঢুকতেই ইনি বললেন–বসো।

ট্রেসি একটা চেয়ারে বসল। উনি বললেন, একটা কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য আমি ওয়াশিংটন চলে গিয়েছিলাম। আজ সকলে সেখান থেকে ফিরে তোমার রিপোর্টটা পড়লাম। তোমাকে এভাবে সেলে রাখাটা মোটেই উচিত হয়নি।

ট্রেসি ভাবলেশহীন মুখে বসে রইল। ওয়ার্ডেন টেবিলের ওপর রাখা রিপোর্টটা আবার দেখলেন। রিপোর্টে লেখা আছে, ট্রেসির সেলের সঙ্গীরা তার ওপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে।

সহানুভূতির সঙ্গে তিনি সব কিছু জানতে চাইলেন। ট্রেসি প্রত্যেকবার কিছু অস্বীকার করল।

ওয়ার্ডেন জানতেন এমন একটা সাজানো উত্তর ভেসে আসবে ট্রেসির কণ্ঠস্বর থেকে। তিনি ঘাড় নাড়লেন–তোমার ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা আমি বুঝি। কয়েদিরা জেলের মধ্যে

যা খুশী তাই করবে এটা আমি হতে দেব না। যারা তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের শাস্তি আমি দেবই তবে তার জন্য তোমার স্বীকারোক্তি চাই। তোমাকে বাঁচানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। বলো, কারা কারা এ কাজ করেছে?

ট্রেসি ওয়ার্ডেনের চোখের দিকে চোখ রেখে বলল, বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ওয়ার্ডেনের চোখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন–ভেবে চিন্তে কথা বলছো তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

–মত পাল্টাবে না তো আর?

–না, স্যার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্র্যানিগান বললেন–ঠিক আছে, এটাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তোমাকে অন্য সেলে বদলি করে দেব।

–বদলি হতে চাই না। ওয়ার্ডেন চমকে উঠলেন তার মানে? তুমি আবার ওই সেলেই থাকবে?

–হ্যাঁ, স্যার।

ট্রেসির এই কথা শুনে ওয়ার্ডেন অবাক হয়ে গেলেন। অনেক দিন ধরে তিনি জেলখানার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে এর আগে তাঁর চোখে পড়েনি। মেয়েটাকে

তিনি কি চিনতে ভুল করেছেন? নাঃ বুঝতে পারছি না। মেয়ে কয়েদিগুলোকে ঠিক মতো চেনা যায় না। স্ত্রী আর বাচ্চা মেয়ে অ্যানির জন্য এখানে পড়ে আছেন ব্রানিগান। ওয়ার্ডেনের বাড়িটা চমৎকার। চারপাশে অনেকখানি জমি আছে। নিজের হাতে ফুলের বাগান তৈরী করেছেন তিনি। জেলখানার ক্ষেত আছে পেছন দিকে। পুকুর আছে। শহরে থাকলেও গ্রামাঞ্চলের ষোলো আনা সুখ পাওয়া যায়। সব ভালো কিন্তু এই ক্ষ্যাপা মেয়ে কয়েদিগুলির সঙ্গে সব সময় কাটাতে হয়–এটা মোটেই ভালো লাগে না তার। অনেকবার তিনি ভেবেছেন, অন্য কোনো জেলে বদলি হয়ে যাবেন। কিন্তু তা আর হল কই?

ট্রেসির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি বললেন–ঠিক আছে, তবে দেখো ভবিষ্যতে যেন। কোনো ঝাটে জড়িয়ে পড়ো না।

–আচ্ছা স্যার।

এবার সব থেকে কঠিন কাজটা ট্রেসিকে করতে হবে। সাতদিন বাদে আবার তাকে পুরোনো সেলে ফিরে আসতে হবে। ভেতরে পা দিয়ে তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সঙ্গীরা কেউ নেই কেন? কিছুক্ষণ নিজের বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে সে কী যেন চিন্তা করল। তারপর বাঙ্কটাকে আগা পাছতলা খুঁজল। কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার পাত জোগাড় করল। তোষকের তলায় সেটিকে লুকিয়ে রাখল। সকাল এগারোটাতে খাবার ঘণ্টা পড়েছে, ট্রেসি সবার আগে গিয়ে লাইনে দাঁড়াল।

দরজার কাছাকাছি একটি টেবিলে লোলা আর পাউলিটাকে দেখা গেল। আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপকে ধারে কাছে দেখা গেল না।

অন্য একটা টেবিলে বসে ট্রেসি কোনোরকমে অখাদ্যগুলোকে গিলে ফেলল। পৌনে তিনটে নাগাদ ফিরল লোলা। পাউলিটা তার সঙ্গে। সেখানে আর্নেস্টাইনকে দেখা গেল।

পাউলিটা ট্রেসিকে দেখে চমকে উঠল। সেঁতো হাসি হেসে বলল–তাহলে আবার তুমি আমাদের কাছেই ফিরে এলে খুকুমনি, সেদিন তাহলে ভালোই লেগেছিল কী বলে?

লোলা বলল–ভালো, এখানে থাক। আরো অনেক আরাম পাবে।

ট্রেসি যেন ওদের ঠাট্টা ইয়ার্কি শুনতেই পায়নি। ওর মাথায় খালি লিটলচ্যাপের চিন্তা। ওর জন্যই সে এই সেলে ফিরেছে। ট্রেসি লিটলচ্যাপকে একদম বিশ্বাস করে না। কিন্তু ওকে এখন ভীষণ দরকার।

নিউ অর্লিয়েন্স থেকে চলে আসার সময় একটা মেয়ে কয়েদি বলেছিল–একটা খবর দিচ্ছি। আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপই ওখানকার সর্বেসর্বা।

সেই রাতে পনেরো মিনিটের ঘণ্টা পড়ল। ট্রেসি রাতের পোশাক পরে নিল। এখন আর তার মনের মধ্যে লজ্জা সঙ্কোচের বালাই নেই। ওর নগ্ন শরীরটা দেখে পাউলিটা মুখের ভেতর দু আঙুল পুরে ছেলেদের মতো শিস দিল।

আধঘণ্টা বাদে পাউলিটা আর লোলা বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। অশ্লীল ভাষায় ট্রেসিকে ডাকল।

সাড়া পেল না। দুজনে কাছে এগিয়ে এল। ট্রেসি এবার ওই লোহার ফলাটা বের করল। একজনের মুখ লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল। দ্বিতীয়জনকে লক্ষ্য করে একখানা লাথি বাড়াল। দুজনেই চাপা আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিতে পড়ল।

হিসহিসিয়ে ট্রেসি বলল, কাছে এলেই খুন করে ফেলব।

–কুত্তি কোথাকার?

অন্ধকারের মধ্যে ট্রেসি বুঝতে পারল, ওরা দুজন আবার তার দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ লিটলচ্যাপের কথা শোনা গেল। ওকে ছেড়ে দে, যথেষ্ট হয়েছে।

–আর্নি, আমার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, ওটাকে আমি খতম করব।

–যা বলি তাই কর। লিটলচ্যাপ ধমকে উঠল। কিছুক্ষণ পরে পরিবেশ শান্ত রইল। ট্রেসি উত্তেজনায় টানটান হয়ে বসে আছে।

–তোর সাহস আছে দেখছি খুকুমনি, লিটলচ্যাপ বলল।

ট্রেসি নিরুত্তর?

–ওয়ার্ডেনকে সত্যি কথাটা বলিস নি শুনলাম।

লিটলচ্যাপ যে হাসছে, এটা ট্রেসি বুঝতে পারল। যদি বলতিস, তাহলে এতক্ষণে তুই একতাল মাংস হয়ে যেতিস।

ট্রেসি তার কথাটা অবিশ্বাস করতে পারল না।

–অন্য সেলে গেলি না কেন?

তাহলে একথাটাও লিটলচ্যাপের কানে এসেছে।

ট্রেসি বলল–আমি নিজেই এখানে ফিরে আসতে চেয়েছি।

–তাই তো দেখছি, কিন্তু কেন? লিটলচ্যাপ বুঝতে পারছে না ওর কথা।

এই মুহূর্তটির জন্যই যেন ট্রেসি অপেক্ষা করছিল। সে বলল–আমি এখান থেকে পালাতে চাইছি। আমি জানি, তুমি ছাড়া কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

.

৮.

মেট্রন এসে ট্রেসিকে খবর দিলেন–তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

ট্রেসির মাথায় নানা প্রশ্নের ভিড়। কে দেখা করতে আসবে? হঠাৎ চার্লসের কথা মনে হল তার, কিন্তু চার্লস আসবে কি? তাহলে কি আমাদের সেই বুড়ো ফোরম্যান? না, উনি আসবেন কেন?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ভিজিটার রুমে গিয়ে ট্রেসি দেখল, এক অজানা মানুষ বসে আছে। এমন বিশ্রী চেহারার মানুষকে ট্রেসি কোনোদিন আগে দেখেনি। অসম্ভব বেঁটে, শরীরটা পাকানো সরু খাড়া নাকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। নাকের ডগাটা ভীষণ ছুঁচালো। ঠোঁটের ভঙ্গিমাটা দেখে মনে হল, সে বুঝি পৃথিবীর সকলকে ঘেন্না করে। কপালটা সামনের দিকে ঠেলে এসেছে। উঁচু কপাল, চোখের তারা বাদামী। সাপের মতো তীক্ষ্ণ। চোখে মোটা কাঁচের চশমা থাকাতে তাকে আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

লোকটা বসে বসেই বলল–আমার সাথে আপনার পরিচয় হয়নি, আমার নাম ড্যানিয়েল কপার। ওয়ার্ডেনের অনুমতি নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

ট্রেসি জানতে চাইল কী ব্যাপার?

–আমি ইপার গোয়েন্দা, মানে বীমা কোম্পানীর তরফ থেকে আসছি। আমাদের এক মক্কেলের বীমা করা একটা ছবি চুরি হয়েছে। রেনোয়ার আঁকা সেই ছবিটি। জোসেফ রোমানোর বাড়ি থেকে চুরি গেছে।

–সেই ছবি? ট্রেসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্যই করতে পারব না। আসলে ছবিটা আমি চুরি করিনি।

কথাটা শেষ করে ট্রেসি ফিরে যার জন্য পা বাড়াল।

–তা আমি জানি, কুপারের এই কথাটা শুনে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হল সে।

–ওটা কেউই চুরি করেনি। আপনাকে মিথ্যে অভিযোগে ফঁসানো হয়েছে, মিস হুইটনি। ট্রেসি চেয়ারে বসে পড়ল।

এবার ওই লোকটা বলতে শুরু করেছে।

.

ওই সপ্তাহের গোড়ার দিকে ড্যানিয়েল কুপারের হাতে কেসটা এসেছিল। ম্যানহাটানে ইপার সদর দপ্তর। বীমা কোম্পানীর বড় কর্তা জে. জে. রেনল্ডস কুপারকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন।

রেনল্ডস বলেছিলেন–তোমার জন্য একটা কাজ আছে ড্যানিয়েল। আমি জানি, তুমি ছাড়া কেউ এ কাজটা ঠিক মতো করতে পারবে না।

রেনল্ডস আরো বলেছিলেন–সংক্ষেপেই বলছি, বীমা কোম্পানীর বাকি সকলের সঙ্গে ভাব থাকলেও রেনল্ডস কুপারের সামনাসামনি হলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন। কুপার একটা অদ্ভুত ধরনের মানুষ। কোথায় থাকেন, কেউ জানে না। বিয়ে করেছেন কিনা, সে খবরও কারো জানা নেই। জীবনে চলার পথে একলা চলতে ভালোবাসেন। কারোর সঙ্গে মেলামেশা করেন না। কুপারকে দেখলে অশরীরী মানুষ বলে মনে হয়। তবে একটি মাত্র কারণে রেনল্ডস কুপারকে সহ্য করেন, তা হল নিজের কাজে অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। দিয়েছেন কুপার। ভদ্রলোক একেবারে কাজ পাগল। ওর হাতে যে কোনো জটিল সমস্যা তুলে দিলেই হল, সমাধান উনি বের করবেনই। লোকটাকে দেখলে একটা বুলডগ বলে মনে হয়। মাথাটা যেন কমপিউটার। চুরি হয়ে যাওয়া বীমা করা জিনিস

উদ্ধার করতে অথবা বীমা করে জোচ্চুরির চেষ্টা করা, এসব ব্যাপারে কোম্পানির যতগুলি গোয়েন্দা আছে, তার মধ্যে কুপার এক নম্বর, একথা বলাই বাহুল্য। রেনল্ডস ওনার ফেলে আসা দিনযাপনের কথা জানতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেন নি।

রেনল্ডস বললেন, আমাদের এক মক্কেল পাঁচ লাখ ডলারের একটা ছবি বীমা করিয়েছিলেন।

–রেনোয়ার, নিউ অর্লিয়েন্স, জো রোমানো। ট্রেসি হুইটনি নামের একটা মেয়ের পনেরো বছরের জন্য জেল হয়েছে। ছবিটা উদ্ধার করা যায়নি–গড়গড় করে বলে গেল কুপার।

–কুত্তার বাচ্চা, মনে মনে বললেন রেনল্ডস। অন্য কেউ হলে ভাবতাম, দাঁও মারার চেষ্টা করছে। মুখে বললেন, হ্যাঁ তাই, ওই হুইটনি মেয়েটি ছবিটি কোথা থেকে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। তা আমরা ফেরত চাই। যাও, কাজে লেগে পড়ো।

কুপার বেরিয়ে গেল একটাও কথা না বলে। তার কুঁজো পিঠের দিকে তাকিয়ে রেনল্ডস মনে মনে বলেছিলেন–একদিন আমি বের করবই। এই লোকটা কী করে কাজ করে।

বড়ো হলঘরে পঞ্চাশজন কর্মচারী যে যার কাজে ব্যস্ত। কুপার তাদের পাশ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছে।

একজন মন্তব্য করল–শুনলাম, রোমানোর কাজটা তোমার হাতে গেছে।

কোনো উত্তর না দিয়ে কুপার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এই লোকগুলো কেন। অকারণে ওকে বিরক্ত করে? ওতো কারোর সঙ্গে যেচে কথা বলে না। আসলে অহেতুক এই বকবকানিতে মোটেই মন নেই তার।

অফিসের লোকগুলো অবশ্য ওর সঙ্গে লাগবে, কুপারের এই আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে কী রহস্য আছে, ওরা তো ভেদ করবেই।

–শুক্রবার কোথায় ডিনার সারবে ড্যান?

–তোমার বিয়ে যদি না হয়ে থাকে, আর আমার জানা দারুণ একটা মেয়ে আছে। লোকগুলো কি জানে না। এসব কথা বলার কোনো অর্থ নেই।

–চলো না, একটু মদ খাওয়ালেই চলবে।

এই ফাঁদেও কুপার-ধরা দেবে না। সে জানে, প্রথমে মদ দিয়ে শুরু হবে। তারপর ডিনারের আসরে নেমন্তন্ন, তারপর বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব হওয়া মানে তোমার গোপন ঘর তুমি আমাকে উজাড় করে বলে দেবে। আর আমি আমার গোপন খবর তোমাকে জানাব। সে ভারী বিপদজনক ব্যাপার, ড্যানিয়েল কুপার একজন গোয়েন্দা। গোয়েন্দার জীবন কথা কারো জানতে নেই।

একটা ভয় সব সময় কুপারকে তাড়া করে। সেটা হল তার অন্ধ অতীত। সে জানে, আজ অথবা আগামীকাল তার অন্ধ অতীতের কথা সকলে জানতে পারবে। তখন কী হবে?

ড্যানিয়েল কুপার যদি তার মনের কপাট মনোবিজ্ঞানীর কাছে খুলে দেয়, তাহলেও হয়তো সুরাহা হবে না। সে কারোর কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারবে কি? বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ভয়াবহ ঘটনার নথি তার কাছে আছে। কী নথি? পুরোনো হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটি খবর। তবে এমন জায়গাতে সেটা লুকোনো আছে যে, কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাবে না। প্রত্যেকটি অক্ষর সে মুখস্থ করেছে, নিজেকে শান্তি দেবার জন্য মাঝে মধ্যে সে হলুদ কাগজের টুকরোটা বের করে এবং একা একা পড়তে থাকে।

দিনে দু-তিনবার চান করাটা তার অনেক দিনের অভ্যেস। এতখানি শুচিবাইগ্রস্ত হওয়াতেও মাঝে মধ্যে নিজেকে অশুচি বলে মনে হয় তার। নরকের আগুনে পুড়ে মরার কথা সে বিশ্বাস করে। সে জানে, মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্ত করা। প্রথমে সে নিউইয়র্ক পুলিশে চাকরি নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, কিন্তু উচ্চতা মাত্র চার ইঞ্চি কম হওয়াতে ওই চাকরি সে পায়নি। তাই বেসরকারী অফিসে তদন্তকারী গোয়েন্দার চাকরি বেছে নিয়েছে। ওর ধারণা পাপী বা অন্যায়কারীকে শাস্তি দিলেই তার মুক্তি তাড়াতাড়ি হবে। প্লেন ধরার আগে একবার চান ওকে সারতেই হবে।

এবার সে গেল নিউ অর্লিয়েন্সে। সমস্ত দিন শহরটার এখানে ওখানে ঘুরল। যা কিছু জানার দরকার সব জেনে নিল। আর্থার জো রোমানো, অ্যান্টনি ওরসেত্তি, পেরী পোপ, জজ হেনরি লরেন্স–সকলের অনেক খবর জোগাড় করল। ট্রেসি হুইটনির বিচারের কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নিল। পুলিশের কাছ থেকে খবর নিল, ট্রেসির মা কেন আত্মহত্যা করল। অটো স্মিটের সঙ্গে দেখা করল। সে জানতে চাইল, কীভাবে ট্রেসি

হুইটনির মায়ের কোম্পানীটিকে ডোবানো হয়েছিল। এত তথ্য জোগাড় করার পরে সে ভাবল এবার লিখতে বসবে কিনা। সবকিছু লেখা হয়ে তার মাথার ভেতর ভর্তি আছে। ট্রেসি কোনো অপরাধ করেনি, এই সরল সত্যটা সে বুঝতে পারল। কিন্তু সে কি গোয়েন্দা নাকি পুলিশ? সে এখন কী করবে? এখান থেকে সে যাবে ফিলাডেলফিয়াতে। ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্লারেন্স ডেসমণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে। চার্লস স্ট্যানহোপ তৃতীয় তার সঙ্গে দেখাই করলেন না।

এই মুহূর্তে ট্রেসির সামনে বসে কুপারের ধারণাটাই শতকরা একশো ভাগ সত্যি বলে মনে হল। এই মেয়েটা ছবি চুরি করেনি। এবার রিপোর্ট লিখে ফেলতে হবে। মিস হুইটনি, রোমানো আপনাকে ফাঁসিয়েছে। আজ না হয় কাল ছবিটা চুরি যাবার অভিযোগ ও তুলতোই। আপনি খুব তাড়াতাড়ি ওর পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন।

ট্রেসির হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। তার মানে, এই লোকটা জানে সে অপরাধী নয়। হয়তো জো রোমানোর বিরুদ্ধে ওর কাছে ভালো প্রমাণ আছে। ট্রেসি ছাড়া পাবে। ওয়ার্ডেনকে বলবে, গভর্নরকে দরখাস্ত করতে। তাহলে আপনি আমায় সাহায্য করুন।

ড্যানিয়েল কুপার হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল–আপনাকে সাহায্য?

–হ্যাঁ, যাতে আমি ছাড়া পেতে পারি।

–না, না, ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কুপারের কথাটা বুঝি তার দুগালে চড় মেরেছে। সে বলল–সাহায্য করবেন না কেন? আপনি তো জানেন, আমি কতখানি নিরপরাধী?

মনে মনে ভাবল কুপার, মানুষ এত বোকা কি কোনোদিন হয়? সে বলল, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

হোটেলে ফিরে প্রথমেই চান সারল কুপার। তারপর রিপোর্ট লিখতে বসল–

জে. জে. রেনল্ডস সমীপে,

প্রেরক–ড্যানিয়েল কুপার

বিষয়–রেনোয়ার ক্যানভাসের তৈলচিত্র।

আমার অভিমত এই যে, ট্রেসি হুইটনি ছবিটি চুরি করেনি। জো রোমানো ছবিটাকে বীমা করিয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ছবিটা চুরি যাবার একটা মিথ্যে গল্প রটনা করবে সে। বীমার টাকা আদায় করবে এবং গোপনে ছবিটা বিক্রি করে দেবে। আমার ধারণা, ছবিটা সুইজারল্যাণ্ডে পাচার হয়ে গেছে। সেখানে সরল বিশ্বাসে না জেনে চোরাই মাল কিনলে শাস্তি হয় না।

সুপারিশ রোমানোর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বীমার টাকাটা আমাদের দিতে হবে। ট্রেসি হুইটনির কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যাবে না–ছবি বা ক্ষতি পূরণ, তাছাড়া তাকে পনেরো বছর জেলে থাকতে হচ্ছে।

লেখা শেষ হয়ে গেছে। ড্যানিয়েল কুপার ট্রেসির কথা চিন্তা করল। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু পনেরো বছর ধরে জেল খেটে পচে মরলে তার চেহারার কী দশা হবে? যাক এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই তার।

রিপোর্টের তলায় কুপার সই করল। এবার ভাবল, আর একবার স্নান করবে কিনা।

.

৯.

পুরোনো লোহার প্যান্ট ট্রেসিকে দিয়েছিল ধোবীখানার কাজ। জেলখানার কয়েদীদের পঁয়ত্রিশ রকমের কাজ করতে হয়। তার মধ্যে সব থেকে খতরনাক হল ওই ধোবীখানার ডিউটি।

সকাল থেকে বিকেল অবধি অনবরত ঘড়ঘড় শব্দ করে মেসিন চলে। মেঝে তেতে আগুনের মতো হয়ে যায়। কাজের কোনো শুরু এবং শেষ নেই।

সকাল ছটা থেকে কাজ শুরু হয়। দুঘণ্টা অন্তর দশ মিনিটের বিশ্রাম। রোজ নঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। কাজ করার পর বেশির ভাগ কয়েদীর শরীরের সমস্ত ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে যায়। হাঁটতে চলতে পারে না সে। ট্রেসি কিন্তু তখনও ফুরফুরে থাকে। তার এই অনন্ত শক্তির উৎস কোথায়? তার পাশাপাশি যারা কাজ করে তারা ওকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

কাজ করতে করতে মাথার ভেতর নানা ধরনের বুদ্ধির খেলা খেলতে থাকে সে। কি করে, এই অন্ধকূপ থেকে পালানো যেতে পারে, এই মুহূর্তে সেটাই তার একমাত্র চিন্তা।

আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপ ট্রেসির এই কাজের খবরটা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে। তবে খুশির ভাব মুখে প্রকাশ করছে না। বরং বলেছে–পুরনো লোহার প্যান্ট তোমার পেছনে লাগলো কেন?

ট্রেসি বলল–ও কিন্তু আমাকে মোটেই বিরক্ত করে না। আমি এক মনে আমার কাজ করি, এতে ও কিছুই বলে না।

লিটলচ্যাপ খুব অবাক হল, তিন সপ্তাহ আগে জেলখানার ভেতর যে বাচ্চা ভীতু মেয়েটা ঢুকেছে, এত সহজে সে নিজেকে পাল্টে ফেলল কেমন করে? এর অন্তরালে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটা জানতে ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে হল তার।

ধোবীখানায় আটদিন কাজ করতে হল ট্রেসিকে। একদিন সকালে পাহারাদার এসে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। সে খবর পেল তার কাজে খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে রান্নাঘরে বদলী করেছে। জেলখানায় যত রকমের কাজ আছে তার মধ্যে এটাই হল সব থেকে লোভনীয়।

জেলখানায় দুধরনের রান্না হয়, কয়েদীদের জন্য এক ধরনের খাবার–সেগুলো সঙ্গত কারণেই মুখে দেওয়া যায় না। পুলিশ আর কর্মচারীদের জন্য ভালো খাবার রান্না হয়। তাদের জন্য মাছ, মুরগী, ফল, পুডিং এসব তৈরি করে পেশাদার বাবুর্চিরা। সেখানে। কয়েদীদের প্রবেশ নিষেধ। তবে যেসব কয়েদী রান্নাঘরে কাজ পায় তাদের দিকে মাঝে

মধ্যে ওইসব খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া হয়, খুশি হয়ে গৃহবধূ যেমন মোটা বেড়ালটার দিকে মাছের কানকো ছুঁড়ে দেয় তেমনটি আর কি!

রান্নাঘরে গিয়ে ট্রেসি লিটলচ্যাপকে দেখতে পেল। তাকে দেখে এতটুকু অবাক হল

সে। জেলখানার নিয়মনীতিগুলো ইতিমধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে। ট্রেসি হাসতে হাসতে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল–ধন্যবাদ, তুমি আমাকে কি করে নিয়ে এলে এখানে?

লিটলচাপ তাকে দেখে মুখে কোনো শব্দ করেনি। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ও আর এখানে নেই।

–কোথায় গেল, কী হয়েছে ওর?

–আমাদের এই জেলখানায় একটা ছোটো কায়দা আছে। যদি কোনো পাহারাদার আমাদের পেছনে লাগে তাহলে তাকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা করা হয়।

–কীভাবে?

–সোজা ব্যাপার, যে পাহারাদারকে ভাগাতে চাই তার কাজের সময় কয়েদীদের মধ্যে গাঁজা আর চরস আসতে থাকে। অভিযোগ বাড়তে থাকে। আরেকজন কয়েদী পুরনো লোহার প্যান্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। সে বলল ওই মেট্রন নাকি তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করেছে। অন্য একজন অত্যাচারের কথা বলল। একজন রেডিও চুরির গল্প

ফাঁদলো। সেটা পাওয়া গেল পুরনো প্যান্টের ঘরে। তাই ওকে চলে যেতে বলা হয়েছে। জেলখানাটা ওরা চালায় না, এই আমরা চালাই বুঝলে!

–তুমি এখানে এলে কেন? ট্রেসি প্রশ্ন করল লিটলচ্যাপকে।

–বিশ্বাস করো আমার কোনো দোষ ছিল না। মেয়েদের একটা গোটা দল নিয়ে আমি ব্যবসা করতাম।

ট্রেসি একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, তার মানে?–বেশ্যা!

লিটলচ্যাপ হাসলোনা, বেশ্যা ছিল না ওরা, বড়োলোকের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতো। কাগজে ভালো ভালো বিজ্ঞাপন দিতাম। ঝি-চাকরানীর দরকার হলে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কথাবার্তার পর মেয়েগুলো যেত কাজ করতে। সময় বুঝে মালিকেরা কেউ বাড়িতে যখন থাকতো না তখন রূপোর বাসন পত্র, গয়নাগাটি চুরি করে আমার কাছে নিয়ে আসতো। এতে আমার দারুণ লাভ হতো। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা, মূলধন বলতে কিছুই লাগতো না, ঝক্কি অনেক কম, অথচ মাসের শেষে কাড়ি কাড়ি টাকা আসতো, আমার হাতে।

লিটলচ্যাপের এই কথা শুনে ট্রেসি একেবারে অবাক হয়ে গেল। মানুষকে ঠকাবার কত কিছুই না চালু আছে এই পৃথিবীতে, বেচারী ট্রেসি তার খবর রাখে না। রাখবে কেমন করে? নেহাত ভাগ্য বিপর্যয় না হলে সে কি এই অন্ধকারায় আসতে পারতো কোনো দিন?

ট্রেসি জানতে চাইল উৎসুক দুটি চোখে অজস্র প্রশ্ন এনেধরা পড়লে কি করে?

–কপাল খারাপ ছিল। মেয়রের বাড়িতে ভোজসভা বসেছে। সেখানে আমাদের একটা মেয়ে কাজ করছিল। ডিনার খেতে আসা একটা বুড়ি মেয়েটাকে চিনে ফেলে। ওই মেয়েটা কয়েক মাস আগে বুড়ির বাড়িতে কাজ করতে করতে অনেক দামী মাল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ মেয়েটাকে এমন ধোলাই দেয় যে সে বাধ্য হয়ে দলের সব কথা বলে দেয়, তার ফলেই আজ আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। জানো তো, পাপ কখনও চাপা থাকে না।

একটা বড়ো উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছিল। ট্রেসি বলল–এখানে আমি থাকতে পারছি না, বাইরে আমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। তুমি কি আমাকে এখান থেকে পালাবার জন্য সাহায্য করবে–বলো না?

ট্রেসির কণ্ঠস্বরে আকুল আহ্বান ঝড়ে পড়ছে। সেই দিকে একবার তাকালো ওই মেয়েটি, তারপর বলল–পেঁয়াজগুলো কেটে ফেল, রাতের স্টু তৈরি করতে হবে।

এই কথা বলে লিটলচ্যাপ কোথায় যেন চলে গেল।

এখানকার ব্যাপার স্যাপার সত্যিই অদ্ভুত, চারপাশে নিরাপত্তার শক্ত বেষ্টনী কিন্তু সব খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায়। ট্রেসি বেশ বুঝতে পেরেছে, এখানে লিটলচ্যাপের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এখুনি সবার কাছে এই খবরটা পৌঁছে দেবে যে ট্রেসি আছে তারই ছত্রছায়াতে, তাই কেউ তার সঙ্গে লাগতে সাহস করবে না। ট্রেসি

আশা করছিল লিটলচ্যাপ যেন তার দিকে আরও ভালো করে দৃষ্টিপাত করে, লিটলচ্যাপের সাহায্য না হলে ওই পাঁচিল ডিঙিয়ে কখনই সে বাইরে আসতে পারবে না।

সরকারী নিয়মকানুনের সূত্রগুলো ছাপা হয়েছে দশ পাতার একটা ছোট্ট বইতে। এখানে ৭ নম্বর দফায় নির্দেশ দেওয়া আছে যে কোনো ধরনের যৌনতা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। একটা কারাকক্ষে চারজনের বেশি বন্দিনী কখনও থাকবে না। একটা বাঙ্কে একজনের বেশি বন্দিনীকে শুতে দেওয়া হবে না।

বাস্তবে কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাটাই ঘটে। এই নির্দেশ-পুস্তিকাটির কথা কেউ মনে রাখতে চায় না। বরং সব বন্দিনীরা একে নিয়ে হাসাহাসি করে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, নিত্য নতুন মাছ অর্থাৎ নতুন বন্দী জেলখানায় ঢোকে। হাবাগোবা মেয়েদের পেছনে মুরগী এই চিহ্নটা ছাপ মেরে দেওয়া হয়। জীবনে প্রথম অপরাধ করে যারা এখানে আসে এবং যারা আগে সুস্থ স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপন করেছে তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদের মন সবসময় দুর্বলতায় ঢাকা। তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে ওই মেয়েমর্দরা। একটি সুন্দর নাটকের দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। প্রথমে ওই মেয়েমর্দরা নবাগতাকে সহানুভূতির সঙ্গে সম্ভাষণ জানায়। এই শত্রুপুরীতে আমাকে একা থাকতে হচ্ছে না, নতুন মেয়েটি এমনই বুঝতে পারে। তারপর শিকারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বিনোদন কক্ষে। সেখানে টিভি আছে, মদ্দা মেয়েটি তার শিকারকে নিয়ে পাশাপাশি বসে। এক ফাঁকে তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে হাতের তেলোতে আঙুলের ডগা দিয়ে কারুকাজ আঁকতে থাকে। শিকার বাধা দেবার কথা চিন্তা করতেও পারে না। একে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পরিবেশ, তায় অন্য বন্দিনীরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, এখন এই মোটাসোটা চেহারার মেয়েটি তার

কাছে একমাত্র মরুদ্যান।–নতুন বন্দী হঠাৎ লক্ষ্য করে বিনোদন কক্ষে উপস্থিত বাকি সবাই ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যাচ্ছে। তখন সে ওই মদ্দার প্রতি আরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই নির্ভরশীলতা অতি দ্রুত অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হয়। মদ্দাকে খুশী করার জন্য তখন নতুন মেয়েটি নিজের জীবন পর্যন্ত হাসতে হাসতে দিতে পারে। মদ্দার নানা ধরনের আদর আবদার সে হাসি মুখে সহ্য করে।

যারা আপত্তি করে তাদের জোর করে ধর্ষণ করা হয়। প্রথম ত্রিশজনের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ নবাগত বন্দিনী স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সমকামিতায় লিপ্ত হয়। ওদের কথা । যতই ভাবে ট্রেসি ততই তার মাথাটা ঘুরপাক খেতে থাকে। চিন্তারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কীভাবে এইসব নিরপরাধ মেয়েদের সামনে নতুন পথের দিশা দেখানো যেতে পারে, নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে বেচারী ট্রেসি!

ট্রেসি একদিন আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপের কাছে জানতে চেয়েছিল কর্তৃপক্ষ সব জেনে কেন মুখ বুজে বসে আছে?

লিটলচ্যাপ বুঝিয়ে বলেছিল–সব জেলখানাতেই একই রকম নিয়ম। বারোশো মেয়ে মানুষকে কি দীর্ঘদিন শুখাভুখা অবস্থায় রাখা যেতে পারে? তারা কোনো না কোনো ভাবে যৌন সংসর্গ করবে। যৌনতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা যৌনসুখ পাবার জন্য ধর্ষণ করি না। নিজের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি জাহির করার জন্যই এটা করে থাকি। দেখাতে চাই চার দেওয়ালের মধ্যে আমার কথাই শেষ কথা। যদি এখানে বেঁচে থাকতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে। নতুন মুরগী জালে পড়লেই আমরা তাকে গণধর্ষণ করার চেষ্টা করি। তবে যদি সে কোনো মদ্দার খদ্দের হয়ে যায় তাহলে

গণ ধর্ষণের হাত থেকে বেঁচে যাবে। ওটা হয়ে গেলে অন্য কেউ তাকে কখনও বিরক্ত করবে না। এখন তুমি ভেবে দেখো ট্রেসি, তুমি কোন্ পথের বাসিন্দা হবে? তুমি কি চাইবে সকলে মিলে তোমার শরীরটা খামচে খুবলে নিক? নাকি তুমি একটা মদ্দার প্রতি থাকবে অনুগতা? হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি, ওই মদ্দা হয়তো তোমাকে এমন কিছু কাজ করতে বলবে যাতে তোমার গা-টা ঘৃণাতে রি রি করবে, তবু তুমি তো নিরাপদ জীবনের সন্ধান পাবে। এখানে যত বন্দিনী আছে তাদের সাথে তুমি কথা বলতে পারো, দেখবে তাদের সবাই স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় পথটি বেছে নিতে চাইবে। কিন্তু বেশির ভাগের ক্ষেত্রে এমন সৌভাগ্য হয় না, তাদের সকলে মিলে গণধর্ষণ করে। দিনের পর দিন তাকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হয়।

লিটলচ্যাপের এই কথাগুলো শুনে ট্রেসির তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি খুলে গেল। এতদিন সে লিটলচ্যাপকে হৃদয়হীন এক মদ্দা মেয়েমানুষ হিসেবেই ভেবে এসেছিল। কিন্তু লিটলম্যাপের মনের মধ্যে যে এত সুন্দর চিন্তা-ভাবনার স্ফুরণ আছে তা ট্রেসিকে অবাক, করে দেয়। সত্যিই কী বিচিত্র মাটির নীচের এই জগৎ। পৃথিবীর বাসিন্দারা এই জগতের কোনো খোঁজ রাখে না, রাখা সম্ভব নয়।

লিটলচ্যাপ বলতে লাগল–শুধু যে বন্দিনীরাই এমন কাজ করে তা যেন ভেবো না খুকুমণি, পাহারাদাররাও কম যায় না। টাটকা মাংস দেখলে ওদের মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। ধরো নতুন কোনো কয়েদীর নেশা করার অভ্যেস আছে, মেট্রন তাকে নিয়মিত নেশার ট্যাবলেট সাপ্লাই দেবে, কিন্তু তার বদলে মেট্রন চাইবে ওই নবাগতার শরীরের ওপর একটু স্পর্শ সুখের আরাম পেতে। অনেক মেট্রনই এই কাজে এক নম্বরের বদমাইশ। পুলিশগুলো আরও ভয়ংকর। ওরা সেলের চাবি যোগাড় করে রাখে।

রাতের বেলায় গারদের দরজা খুলে সোজা সেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিজেদের যৌন ক্ষুধা মেটায় বিনা পয়সাতে। অনেক সময় মেয়েদের পেটে বাচ্চা এসে যায়। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পুলিশ রক্ষীরা। তারাই অ্যাবরসনের ব্যবস্থা করে। ধরো তোমার কিছু দরকার, সিগারেট অথবা চকোলেট, তুমি একটা পুরুষ পাহারাদারের বউ হয়ে যাও, দেখবে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তুমি কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাও, ওই পুলিশদের সাথে বোঝাঁপড়া করে নাও দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে জেলখানার ভেতর কী বিচ্ছিরি একটা নিয়মনীতি চালু আছে।

–কী বীভৎস ব্যাপার! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

–আরও কদিন এখানে থাকো। তাহলে সব ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। বিদ্যুতের আলো পড়লো লিটলচ্যাপের কামানো মাথার ওপর, মাথাটা চিকচিক করে উঠেছে–জেলখানার ভেতর রেপ কেস দেওয়া হয় না তা জানো কি?

–না।

–মেয়েরা তালার গর্তে সেগুলো ঢুকিয়ে দেয়, তাই সেখানে চাবি ঢোকে না। সেই সুযোগ নিয়ে কয়েদীরা অন্য ঘরে চলে যায় নতুন মেয়েদের ভোগ করবে বলে। আমরা নিজেদের নিয়ম নিজেরাই গড়ে নিই। কেউ মুখ খোলে না, সকলে যোবা সেজে থাকে।

জেলখানায় চার দেওয়ালের মধ্যে প্রেম পর্ব চলে অদ্ভুত ধারাতে। প্রেমিক প্রেমিকারা নিজেদের গড়া নিয়মনীতি কঠোর ভাবে মেনে চলে। এই অস্বাভাবিক পরিবেশে মদ্দা মেয়েরা এবং তাদের স্ত্রীরা কেমন সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছে। মদ্দারা নিজেদের নাম

পাল্টে পুরুষদের নাম নিয়ে নেয়। যেমন আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপ হয়ে গেছে আর্নি, ট্রেসি হয়েছে। ট্রেব, বারবারা বব আর ক্যাথলীন কেলী। এই ষণ্ডামার্কা মেয়েরা চুল ছোটো করে, কেউ আবার মাথা কামিয়ে নেয়, কেউ কোনো কাজ করে না। তাদের তথাকথিত স্ত্রীরা সমস্ত কাজ করে দেয়, ইস্ত্রি করা থেকে সেলাই করা সবকিছু তাদের কাজ। একসময় লোলা আর পাউলিটা লিটলচ্যাপের নজরে পড়ার জন্য নিজেদের মধ্যে জোর লড়াই চালিয়ে ছিল। সেই লড়াই মাঝেমধ্যে হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হতো।

ঈর্ষার রূপ এখানে ভয়ংকর, প্রায়ই প্রচণ্ড মারামারি হয়। যদি কোনো স্ত্রী অন্য কোনো মদ্দা মেয়ে মানুষের দিকে তাকায় বা উঠোনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে গল্পগুজব করে তাহলেই আর রক্ষা নেই। দুই মদ্দার মধ্যে তখন দারুণ ঝগড়া শুরু হয়। এছাড়া জেলখানায় আরেকটি জিনিস ট্রেসিকে অবাক করে দিয়েছে। তাহল এখানে প্রেমপত্র চালাচালি হয়। চিঠিগুলোকে মুড়ে মুড়ে ছোট্ট ত্রিভুজের আকারে নিয়ে আসা হয়। কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা। তাই ব্রেসিয়ারের মধ্যে বা জুতোর মধ্যে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখা সহজ। ট্রেসি দেখেছে খাবার ঘরে ঢোকার সময় বা কাজ করতে যাবার সময় সকলের চোখের সামনে কেমনভাবে ওই ছোট্ট চিরকুট এর হাত থেকে ওর হাতে চলে যাচ্ছে।

ট্রেসি এটাও লক্ষ্য করেছে কয়েদীরা অনেক সময় পুলিশের প্রেমে পড়ে যায়। অথবা পুলিশের অনুগত হয়ে যায়। জীবনের প্রতি প্রচণ্ড হতাশা থেকেই তাদের মনে এই বোধের জন্ম হয়। জেলখানার সবকিছু নির্ভর করে ওই পুলিশদের ওপর। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তারাই একমাত্র সেতুবন্ধন। ট্রেসি অবশ্য সে ধরনের মানসিকতা দেখায়নি। আসলে বাইরের পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে দেখা করতে সে উদগ্রীব। একমাত্র যে ছিল সে হল চার্লস, তাকে এখন ধীরে ধীরে স্মৃতির দৃশ্যপট থেকে

মুছে দিয়েছে ট্রেসি। এখন শত চেষ্টা করলেও চার্লসের মুখখানি আর তার মনের দর্পণে ভেসে ওঠে না।

একদিন রাতে ট্রেসি একটা অবাক করা দৃশ্য দেখতে পেল। দেখতে পেল লিটলচ্যাপ একটা প্যাকেট থেকে ডালের পাঁপড় ভাজার টুকরো দরজা দিয়ে বারান্দায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ট্রেসি জানতে চাইল–এটা কি হচ্ছে?

তাকে এভাবে প্রশ্ন করতে দেখে লিটলচ্যাপ খুবই চটে যায়। সে বলে–চুপ করে থাক, আমি কি করছি তা নিয়ে তোর মাথাব্যথার কারণ কী? বেশি বকবক করবি না, মেজাজটা আজ আমার মোটেই ভালো নেই।

একটু পরে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটা ঘর থেকে নারীকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ ভেসে এলনা না দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে একলা থাকতে দাও, কিন্তু কে কার কথা শোনে? ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর অনেক ঝিমিয়ে এল। ট্রেসি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, সে নীরবে কাঁদতে থাকলো। সকালে লিটলচ্যাপ বলল, আমরা কেন পাঁপড় ভাজা ছড়িয়ে রাখি বলতো? পুলিশরা এলে শব্দ হবে, তখন আমরা সাবধান হয়ে যাব।

তার মানে কাল রাতে কোনো একটি একলা মেয়েকে পুলিশ জোর করে ধর্ষণ করছিল? হায় ঈশ্বর, চোখের সামনে এ কোন নরক দর্শন করালে আমাকে?–কিছুদিনের মধ্যে ট্রেসি আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠল, সে এখন অনেক গোপন শব্দের আসল অর্থ শিখে গেছে। জেলখানা যাওয়াকে কেন কলেজে যাওয়া বলে তাও সে জেনেছে। পৃথিবীতে যত

রকুমের পাপের কথা চিন্তা করা যায় সেইসব পাপের ওস্তাদ কারিগররা এখানে বসবাস করে। ওস্তাদেরা একে অন্যের কাছে গুপ্তবিদ্যা জাহির করে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচে তারা পরস্পরকে টেক্কা দিতে চায়।

একদিন সকালে খেলার মাঠে ট্রেসি একটা অবাক করা দৃশ্য দেখল। এক মেয়ে ওস্তাদ পকেট মারার নিয়মনীতি শেখাচ্ছে। একদল কম বয়েসী মেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের পলক ফেলার আগে ওই মেয়ে ওস্তাদ পকেট সাফ করার কায়দা জানে, আড়াই হাজার ডলার ফী দিলে কলম্বিয়ার কোন স্কুলে পকেট মারার গুপ্ত বিদ্যা শেখানো হয় তাও সে বলছে গড়গড় করে। শিলিং থেকে পুরো পেপাশাক পরা একটা নকল মানুষ ঝোলানো থাকে, তার পায়ে লাগানো থাকে অনেকগুলি ঘণ্টা, বেকায়দায় ছুঁলে ঘণ্টাগুলো ঝনঝন শব্দ করে বাজতে থাকে। যদি কোনো শিক্ষার্থী ঘণ্টা না বাজিয়ে পকেটের মানিব্যাগ তুলতে পারে তখনই তার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এবার মেয়েটিকে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়, অবশ্য নাম এবং ঠিকানা পাল্টে, বোঝ যায় এখন সে চড়ে খেতে পারবে।

লোলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–আমি একটা লোকের সঙ্গে ছিলাম, ভীড়ের মধ্যে সে ।

লোকটা ওভার কোট পড়ে দু-হাত ঝুলিয়ে পথ হাঁটতে, সেই ফাঁকে লোকের পকেট মেরে সাফ করতো।

–কিন্তু করতো কি করে?

–ওর ডান হাতটা ছিল কৃত্রিম, লোকে সেটা বুঝতে পারতো না।

টিভি ঘরটাতেও এমন অনেক শিক্ষাদানের পালা চলতো। ট্রেসি একদিন শুনলো লকার থেকে মালপত্র চুরি করা এক কয়েদীর সব থেকে প্রিয় কাজ। কাজটা খুবই সহজ, ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এর জন্য বড়ো বড়ো স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে হয়। যখন কোনো বুড়ি সুটকেস বা বড়ো প্যাকেট নিয়ে নড়তে চড়তে না পারে তখন। তার দিকে এগিয়ে আসতে হয়। সাহায্য করার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। মালটা লকারে রেখে চাবিটা তুলে দিতে হয় ওই বুড়ির হাতে। ব্যস কেল্লা ফতে।

–কী করে সম্ভব? ট্রেসি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল।

–যে চাবিটা বুড়ির হাতে তুলে দেওয়া হবে সেটা অন্য একটা ফাঁকা লকারের। আসল লকারটা খোলা অবস্থাতেই থেকে যাবে। বুড়ি চলে গেলে চট করে মাল সরিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়তে হবে। অবশ্য এর জন্য লকার মালিকদের সাথে ভালো বন্দোবস্ত করতে হবে। আমি ষোলো আনা আয় করলে তোমাকে চার আনা দেবো, তা নাহলে জমজমাট ব্যবসা চলবে কেমন করে?

ট্রেসি একদিন নতুন দুটো মেয়ে কয়েদীর দেখা পেল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা শরীরের ব্যবসা করে এবং তারই অন্তরালে হেরোইন বিক্রি করে। দুজনের মধ্যে একজন দারুণ সুন্দরী, সতেরো বছরের এক ছটফটে তরুণী।

অভিজ্ঞ এক আধ বুড়ি কয়েদী সহানুভূতির সুরে সেই সপ্তদশীকে বলছে–যখনই কোনো পুরুষের সঙ্গে দর কষাকষি করবি, দেখবি লোকটা খোচর কিনা। আদর করার ভান করে তার বুকে পিঠে হাত দিবি, দেখবি লুকোনো অস্ত্র আছে কিনা। আরেকটা কথা মনে

রাখিস ছুঁড়ি, নিজে থেকে কোনো প্রস্তাব দিবি না। দেখবি লোকটা তোর কাছ থেকে কী চাইছে, পরে যদি জানা যায় যে খদ্দেরটা পুলিশ, তাহলেও আইন তোকে কিছু করতে পারবে না। তুই পরিষ্কার বলবি লোকটাই তোকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল।

এইভাবেই জেলখানার রুটিন এগিয়ে চলে নিজস্ব গতিতে। সকাল ৪টে বেজে ৪০ মিনিটে ওয়ার্নিং বেল বাজে, রাত নটায় আলো নিভে যায়, তারই মাঝে প্রহরগুলো কীভাবে কাটে। এক অদ্ভুত গতানুগতিকতার মধ্যে। সব কয়েদীকে একই সঙ্গে খেতে যেতে হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। পাঁচ রকমের বেশি প্রসাধন দ্রব্য রাখার নিয়ম নেই। সকলকে প্রাতঃরাশের আগে বিছানা গুছিয়ে রাখতে হয়।

ট্রেসি অতি দ্রুত এক আদর্শ কয়েদী হয়ে উঠল। কখনও সে কোনোরকম আইন ভাঙার চেষ্টা করে না। তার শরীরটা জেলখানার মধ্যে আটকে রয়েছে একথা সত্যি কিন্তু মন চলে গেছে অনেক দূরে।

বন্দীরা বাইরে কোথাও টেলিফোন করতে পারে না। তবে মাসে দুটো করে পাঁচ মিনিটের। ফোন আসে তাদের কাছে। একদিন অটো স্মিট ট্রেসিকে ফোন করেছিল।

–ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয় জানতে চাইবে ওই ব্যাপারটা, শোনো, মায়ের অন্ত্যেষ্টি খুব ভালো ভাবেই শেষ হয়েছে। টাকা পয়সা যা দরকার সব আমি দিয়ে দিয়েছি।

–ধন্যবাদ অটো, অশেষ ধন্যবাদ, এর বেশী কথা বলা সম্ভব ছিল না দুপক্ষের, অতএব ছোট্ট একটি নীরবতা এবং তারপর ক্রিং করে শব্দ। টেলিফোনের লাইন কেটে গেছে।

ট্রেসির মনের আকাশে তখন একরাশ ভাবনার কালো মেঘ। হায়, আর কোনো টেলিফোন সে পাবে না তার দীর্ঘ বন্দী জীবনে?

লিটলচ্যাপ ট্রেসিকে বলেছিল–শোন, বাইরের কথা একেবারে ভুলে যা, সেখানে তোর জন্য কেউ চোখের জল ফেলবে না, বরং আমাদের সঙ্গে আরও বেশি বন্ধুত্ব কর, আমি তোর সমস্যা বুঝতে পারবো, তুই আমার দুঃখে কেঁদে উঠবি। একদিন দেখবি এই জগতটাকে তুই ভালোবেসে ফেলেছিস!

লিটলচ্যাপ ভুল বলছে, ট্রেসি মনে মনে ভাবলো, হেসে উঠল নিজের মনে। বাইরে অনেকে আছে, জনারণ্যে মিশে আছে তারা। এক-এক করে তাদের সবাইকে বের করতে হবে, তারা কে? জো রোমানো, পেরী পোপ, বিচারক হেনরি লরেন্স, অ্যান্টনি ওরসেত্তি এবং অবশ্যই চার্লস স্ট্যানহোপ তৃতীয়।

একদিন খেলার মাঠে বিগবার্থার সঙ্গে ট্রেসির দেখা হয়ে গেল। খেলার মাঠটা একটা বড়ো আয়তক্ষেত্রের মতো। এক পাশে জেলখানার উঁচু পাঁচিল, অন্য তিনটি দিকে নীচু পাঁচিল। প্রত্যেকদিন সকালে এখানে কয়েদীদের আসতে হয়। এখানে ইচ্ছেমতো কথা বলা চলে, সবাই এখানে প্রাণ খুলে গল্প করে। প্রথম দিন যখন ট্রেসি এখানে এসেছিল তখন তার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। মাথার ওপর অনেকখানি ভোলা নীল আকাশ, ঝকঝকে সূর্য গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে।

কে যেন বলে উঠল-ওগো মেয়ে, আমি তো হন্যে হয়ে তোমাকেই খুঁজছিলাম।

ট্রেসি মুখ ঘুরিয়ে দেখল এ সেই সুইডিশ মেয়ে মানুষটা, জেলে আসার প্রথম দিন তার সঙ্গে ছোট্ট একটা ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল ট্রেসির।

শুনলাম তুমি নাকি একটা কার্ফি ষাঁড়কে বেছে নিয়েছো? কেন গো সুন্দরী? তুমি কি পেছনে লাগা পছন্দ করো নাকি?

ওই কথাটার মধ্যে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত আছে, পেছনে লাগা মানে বিপরীত বিহার, ট্রেসি জেনে ফেলেছে। ট্রেসির ভালো লাগছে না, সে বিগবার্থাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু বিগবার্থা তার সাঁড়াশীর মতো শক্ত হাতে ট্রেসিকে চেপে ধরলো। সে এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল–কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তারপর হঠাৎ গলার স্বরটা একটু নরম করল সে। সে বলল–এখানে তো তোমাকে, অনেক বছর থাকতে হবে সুন্দরী, কেন মিছিমিছি আমার সঙ্গে লাগছো? আমার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করে দেখোনা; আখেরে লাভই হবে। চল, একটু ওদিকে চল, তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে।

এই কথা বলতে বলতে বিগবার্থা তার বিশাল শরীরটা দিয়ে ঠেলতে থাকলো ট্রেসিকে, ঠেলতে ঠেলতে তাকে দেওয়ালের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

ট্রেসি বাধা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সে বেশ বুঝতে পারছে শারীরিক কসরতে বিগবার্থার সঙ্গে সে পেরে উঠবে না। তবুও বলল, আমার এখন মন ভালো নেই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ট্রেসির এই কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠল বিগবার্থা। তার পৃথুলা শরীরের সবখানে হাসির ঢেউ লাগে। সে বলল–তোমাকে শায়েস্তা করতে হবে মনে হচ্ছে, শুনে রাখো তোমাকে আমি দখল করবো, বিগবার্থা যা মনে করে কাজে তা করে দেখায়। তোমার বেলাতেও আমি হার স্বীকার করবো না।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল–মাগী, তোর বড় বড় বেড়েছে, ওর গা থেকে এখনই হাত সরা।

ট্রেসি পেছন ফিরে তাকাল, লিটলচ্যাপ ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কামানো মাথায় সূর্যের আলো চিকচিক করছে।

তাকে দেখে বিগবার্থা একটু হেসে বলল–লিটলচ্যাপ, তোর হাতে একটা ভালো মেয়ে পড়েছে, কিন্তু তুই এর উপযুক্ত মরদ নোস। তুই একটিবার আমার হাতে ট্রেসিকে ছেড়ে দে, আমি ওর সুন্দর শরীরটা থেকে সব রস নিংড়ে বের করবো।

চোখের সামনে এসব দৃশ্য দেখে ট্রেসি অবাক হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে দুই মদানীর মধ্যে শুরু হয়েছে তুমুল তর্ক বিতর্ক। এখুনি সেটা শারীরিক সংঘাতের দিকে পৌঁছে যাবে, ট্রেসি বেচারী বুঝতে পারছে কিন্তু সে কী করবে?

লিটলচ্যাপ গর্জন করে বলল–আমিই তোর উপযুক্ত মরদ, একদিন রাতে আসিস আমি দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। আর যদি কখনও ট্রেসিকে বিরক্ত করিস তাহলে তোর পাছা ভেজে খাব আমি।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। শেষপর্যন্ত ট্রেসি ভাবল সে মধ্যস্থতা করবে কিনা। লিটলচ্যাপের একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। একদিন কথায় কথায় লিটলচ্যাপ বলেছিল–শোনো ট্রেসি, তুমি তো এখানে নতুন এসেছে, এখানকার নিয়মনীতি সব বুঝতে পারোনি, আস্তে আস্তে সব শিখবে, জেলখানাতে যে আগে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত সেই জিতে যায়। কেউ দেখে না সে অন্যায় করেছে কিনা। এখানে সবসময় তোমাকে জমি শক্ত রাখতে হবে। একটু নরমভাব দেখালেই আর রক্ষে নেই, শিয়াল কুকুরে এসে তোমাকে কামড়া কামড়ি করবে।

শেষ পর্যন্ত বিগবার্থা পিছিয়ে গেল। অবশ্য আচরণের মধ্যে পরাজয়ের ছবি আঁকলো না সে, হাসতে হাসতে সে বলল–ঠিক আছে, ট্রেসি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাঁপড়াটা আগামী কালের জন্য ভোলা রইল। তুমি তো আরও অনেকদিন এখানে থাকবে। তখন দেখবো ওই ভেড়ুয়া লিটলচ্যাপ তোমাকে কীভাবে বাঁচায়।

বিগবার্থা চলে যাবার পর লিটলম্যাপ ট্রেসির দিকে তাকিয়ে বলল–বদ স্বভাবের মেয়েমানুষ এই বিগবার্থা। শিকাগোতে নার্সের কাজ করতো, সায়ানাইড খাইয়ে রোগীদের মেরে ফেলতো। ওই করুণাময়ী তোমাকে দেখে মজে গেছে। দেখো ট্রেসি, ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি একটা মরদ জুটিয়ে নাও, তা নাহলে কাক শকুনে তোমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

লিটলচ্যাপের এই ব্যবহারে মাঝেমধ্যে ট্রেসি অবাক হয়ে যায়। প্রথম রাত্রির কথা বার বার তার স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে আসে। পাউলিটা এবং লোলা ছাড়া

এই লিটলচ্যাপও তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছিল। কিন্তু লিটলচ্যাপকে চটালে চলবে না, ট্রেসি ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে লিটলচাপ যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, শরীরে অসুরের শক্তি আছে। তার। জেলখানার দেওয়াল ভেঙে বাইরে আসতে হলে লিটলচ্যাপের সাহায্য নিতেই হবে।

ট্রেসি জানতে চাইল-শোনো, আমি যদি জেলখানার পাঁচিল ভেঙে পালাতে চাই তুমি, কি আমাকে সাহায্য করবে?

সময় ও সুযোগ পেলেই ট্রেসি এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়। আসলে বাইরের পৃথিবীতে যাবার জন্য তার মন ছটফট করছে।

লিটলচ্যাপ কিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তখনই খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল।

সেই রাতে নিজের বাঙ্কে শুয়ে ট্রেসি অনেক কথাই ভাবছিল। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল এই জেলখানার ভেতরে। বাইরের পৃথিবীতে কে কোথায় কেমন আছে তা ভাববার চেষ্টা করল।

প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা লাঞ্চের পর বিনোদন কক্ষে সবাই একঘণ্টা কাটাতে পারে। সেখানে টেলিভিশন আছে, মেয়ে কয়েদীরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজস্ব চ্যানেল দেখে। অনেকে ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ মেলে দেয়। একদিন দুপুরে ম্যাগজিনে একটি ছবি দেখে ট্রেসি অবাক হয়ে গেল, তার মন চলে গেল কয়েক বছর আগের পৃথিবীতে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে চার্লস স্ট্যানহোপ তৃতীয় হাসিমুখে নববধূকে নিয়ে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে। তলায় সুন্দর একটা ক্যাপশান। এই ছবিটা দেখে প্রথমে ট্রেসি ভীষণ ভেঙে

পড়েছিল। তার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিল। পরমুহূর্তে তার সমস্ত যন্ত্রণা তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত হল। এই মানুষটিকে সে একদা ভালো বেসেছিল অথচ বিপদের দিনে এই মানুষটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এমনকি চার্লসের দুর্ব্যবহারের ফলেই আজ ট্রেসির সন্তান মারা গেছে, ট্রেসি কোনদিন চার্লসকে ক্ষমা করবে না।

ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্রেসি, ভাবলো, কবে তার এই স্বপ্নটা সফল হবে।

যেদিন কয়েদীদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার কথা থাকে সেদিন তারা সাজগোজ করে। লিটলচ্যাপ ভিজিটরস রুম থেকে যখন ফিরে আসে তখন কিছুক্ষণের জন্য তাকে খুব হাসি খুশি দেখায়।

একদিন লিটলচ্যাপ ট্রেসিকে বলল–আমার অ্যাল এসেছিল, ভাবতে অবাক লাগে আমার জন্য এখনও অ্যাল অপেক্ষা করে আছে। জানো কেন? আমার জন্য ও পাগল।

ট্রেসি জানতে চাইল–তোমার জন্যে?

–হ্যাঁ কেন নয়, এখানে তোমরা যে লিটলচ্যাপকে দেখতে পাচ্ছ সে কিন্তু আসল লিটলচ্যাপ নয়, আমি একটা মেয়েমানুষ, একটু স্নেহের স্পর্শ পাবার জন্যে আমার মন কাতর হয়ে অপেক্ষা করে। বাধ্য হয়েই আমি অপকর্মগুলি করি! যখন ছাড়া পাব তখন। আমার নিজস্ব স্বপ্নজগত গড়ে তুলবো।

লিটলচাপ দাঁত বের করে হাসলো। তার মুখ থেকে ছিটকে আসা ওই কথাগুলো শুনে ট্রেসি তখন অবাক হয়ে গেছে। সত্যিই তো, প্রত্যেকটি মেয়ের মধ্যে কি এমন একটি স্বপ্নের জগত থাকে?

ট্রেসি বলল, লিটলচ্যাপ তুমি সবসময়ে আমাকে বিপদের হাত থেকে আড়াল করতে চাও কেন বলো তো?

কাঁধ কঁকিয়ে লিটলচাপ বলল–বাঃ বুদ্ধিমতী মেয়ে, এই ভাবে সেন্টুতে সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পেট থেকে আসল কথা বের করতে চাইছো তো?

–হ্যাঁ সত্যি আমি জানতে চাইছি, আর সকলে অর্থাৎ যারা তোমার বন্ধু তারা তোমার সমস্ত কথা কেন মেনে চলে।

–শুনতেই হবে, তা নাহলে ওদের পাছায় আমি লাথি ঝাড়বো।

–কিন্তু আমার বেলায় তো তা হয় না। আমি প্রথম থেকেই তো তোমাকে অগ্রাহ্য করেছি।

–এটা কি তোমার কৌতূহল না অভিযোগ?

–না না জানতে ইচ্ছে করছে।

লিটলচ্যাপ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর বলল–শোনো সব কথা বলছি, না না তুমি যা ভাবছো তা নয়, আমি যা চাই তাই পাই। তুমি একটু আলাদা মেয়ে। নামকরা ফ্যাশনেবল ম্যাগাজিনে যে সমস্ত মেয়েদের ছবি ছাপা হয় তুমি তাদের মতো শান্ত ভদ্র

নিরীহ। তুমি ওদের জগতের লোক। তুমি আজ দুর্ভাগ্যের কবলে পরে এই অপরাধের জগতে এসে পড়েছে। মনে হয় কেউ তোমাকে ফাঁসিয়েছে। শোনো, আমি ভদ্র সুন্দর কোনো কিছুরই সংস্পর্শে এ জীবনে খুব কমই এসেছি। তুমি ওই শ্রেণীর মানুষ।

তারপর হঠাৎ মুখটা অন্য পাশে ঘুরিয়ে লিটলচ্যাপ বলল–তোমার বাচ্চাটার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমি...

সেই রাতে আলো নেভার পর ট্রেসি ফিসফিস করে লিটলচ্যাপকে বলল–আর্নি, আমাকে এখান থেকে পালাতেই হবে, তুমি কি বুঝতে পারছো?

–আমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা করছি, যিশুর দোহাই এখন আর বকবক করে আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিও না।

এবার লিটলচ্যাপ ট্রেসিকে জেলখানার ভাষা শেখাতে শুরু করল। কয়েকদিনের মধ্যে সে বিভিন্ন কোড শব্দ বুঝে গেল।

লিটলচ্যাপ আর বিগবার্থার মধ্যে পরের দিন ঘটে গেল সেই বিস্ফোরণটা। মাঠে সফট বল খেলা হচ্ছিল। পাহারাদাররা কড়া নজর রেখেছে সবার ওপর। বিগবার্থা ব্যাট করছিল, মাঠের শেষ সীমানাতে, ট্রেসি দাঁড়িয়ে বল ধরছিল। হঠাৎ তার দিকে জোর করে বল ছুঁড়ে মারল বিগবার্থা, রান নেবার অছিলাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাটিতে ট্রেসিকে ফেলে দিল, ময়দা ঠাসার মতো ঠেসতে লাগল তাকে। তার মুখ দিয়ে তখন সপিনীর হিস হিসানি শব্দ বেরিয়ে আসছে। সে বলল–আজ পর্যন্ত আমার মুখের

ওপর কেউ কথা বলার সাহস করেনি বুঝলি হারামজাদী, তোর সমস্ত গুমোর আজ আমি ভেঙে দেবো। আজ রাতে আমি তোর বাঙ্কে আসবো, দেখি কে তোকে বাঁচায়!

ট্রেসি নিজেকে বিগবার্থার কবল থেকে ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল কিন্তু পারবে কেন? সে যদি একটা ছোট্ট খরগোশ হয়ে থাকে তাহলে বিগবার্থা মোটা শূকরী। হঠাৎ মনে হল কে যেন বিগবার্থাকে হ্যাঁচকা মেরে তার শরীর থেকে ওপর দিকে তুলে নিয়েছে। সে তাকিয়ে থাকল লিটলচ্যাপের দিকে, লিটলচ্যাপ বিগবার্থার টুটি চেপে ধরেছে।

–রাস্তার কুত্তী কোথাকার, তোকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম আমার ট্রেসির গায়ে হাত দিবি না।

বড়ো বড়ো নখ দিয়ে বিগবার্থার মুখ রক্তাক্ত করে দেওয়া হল।

–আমার চোখ গেলে দিল, এই কথা বলতে বলতে বিগবার্থা লিটলচ্যাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়ে পুলিশরা ছুটে এল। পাঁচমিনিট প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হল। ইতিমধ্যেই দুজনে দারুণ জখম হয়েছে। তাদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হল।

গভীর রাতে লিটলচ্যাপ ফিরে এল। লোলা আর পাউলিটা তার সেবাযত্ন করলো পালা করে।

ট্রেসি ফিসফিস শব্দে জানতে চাইলো–তুমি ঠিক আছে তো?

–চমৎকার আছি, মুখে বললেও গলার জড়ানো শব্দ শুনে ট্রেসি বুঝতে পারলো যে লিটলচ্যাপ ভীষণ জখম হয়েছে।

–আমি শিগগিরি প্যারোলে ছাড়া পাচ্ছি। কিছুদিনের জন্য আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তখন তুমি বিপদে পড়বে ট্রেসি, বিগবার্থা কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না। ও ভয়ংকর, ইচ্ছে হলে তোমাকে মেরে ফেলতেও পারে, এই অপরাধের জন্য পৃথিবীর কোনো আদালতে কোনো শাস্তি হবে না।

লিটলচ্যাপের কথাগুলো শুনে ট্রেসির ঘুমের দফারফা শেষ। অনেকক্ষণ সে শূন্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর লিটলচাপ হঠাৎ বলল–এই নরকে যাতে তোমাকে থাকতে না হয়, এবার বোধহয় সেই আলোচনাটা করতে হবে।

চারপাশের আলো নেভাননা, কিন্তু লিটলচ্যাপের কথা শুনে ট্রেসির মনের আকাশে তখন হাজার সূর্যের রোশনাই!

.

১০.

ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান স্ত্রীকে খবরটা দিলেন কাল থেকে তোমার বাচ্চা দেখা ঝিটাকে বোধহয় আর পাওয়া যাবে না।

সু এলেন ব্র্যানিগান ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন কেন? জুডি তো অ্যামিকে খুবই যত্ন করে।

–কিন্তু ও ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, কাল সকালেই ওর ছুটি।

ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান এবং তাঁর স্ত্রী কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। জেলখানার লাগোয়া সুন্দর একটি কটেজে তখন নেমে এসেছে সুন্দর একটি সকাল। ওয়ার্ডেন হিসাবে ব্র্যানিগান পেয়েছেন একজন রাঁধুনীকে, কাজের একটি মেয়ে আছে তার সংসারে, আছে ড্রাইভার আর মেয়ের জন্য গভর্নের্স। বিনা পয়সায় এতজনকে পাওয়া গেছে, স্বভাবতই মনটা খুশি মাখা ব্র্যানিগানের।

ওয়ার্ডেন সাহেবের একটি মাত্র মেয়ে, তার নাম অ্যামি, বয়স মাত্র পাঁচ বছর। স্বামী, স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়ে জমজমাট একটা সুখী সংসারের খণ্ড চিত্র। কিন্তু এখানে এসে সু প্রথম প্রথম খুবই নিরাপত্তার অভাব বোধ করতেন। জেলখানার চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই কয়েদী, ভয়ংকর অপরাধ করে তবে জেলখানায় ঢুকেছে, এই চিন্তাও সুকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। মাঝেমধ্যে সু জানতে চাইতেন তার স্বামীর কাছে মাঝরাতে ওরা যদি আমাদের খুন করে তাহলে কী হবে? বিশেষ করে আমি আমার ছোট্ট মেয়েটার কথা ভাবছি।

স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে ওয়ার্ডেন বলেছিলেন–ওরা যদি সেরকম কিছু বলে তাহলে ওদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার আছে। এ নিয়ে তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।

ব্র্যানিগানের মুখের কথায় মন ভরেনি সু এলেনের কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সু এলেনের এই আশঙ্কা আদৌ ঠিক নয়। যে সমস্ত কয়েদীরা ভালোভাবে কাজ করে

তারাই শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ডেনের ঘরে ঢোকার অনুমতি পায়, শুধু কি তাই? ওয়ার্ডেনের হাতে অসীম ক্ষমতা। তিনি চাইলে সাজার পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন।

এবার সু এলেনের গলায় নানা অভিযোগের সুর ঝমঝম করে বেজে ওঠে–অ্যামিকে জুডির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম। গভর্নের্স হিসাবে জুডি চমৎকার। কিন্তু এবার কে আসবে তা তো জানি না। অচেনা মানুষেরা বাচ্চাদের সঙ্গে কত রকমের খারাপ কাজ করে সবকিছু জানা আছে আমার।

–জুডির জায়গায় তুমি কাকে নেবে বলে ঠিক করেছো?

কিছুদিন ধরেই ওয়ার্ডেন এ বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। ডজনখানেক মেয়ে কয়েদীর কথা ভেবে রেখেছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলেছেন, তবে ট্রেসি হুইটনিকেই এই পদে নিযুক্ত করতে হবে। ওই মেয়েটার দুঃখজনক ঘটনা এখনও তার মনকে বিচলিত করে। পনেরো বছর ধরে অপরাধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করে আসছেন ওয়ার্ডেন সাহেব। এ বিষয়ে তার একটা চাপা অহংকার আছে। বন্ধু বান্ধবেরা বলে থাকেন, তিনি নাকি এক মনস্তত্ত বিশারদ হয়ে উঠেছেন। বেশ কিছু অপরাধী আছে যারা হল দাগী আসামী, জেল থেকে ছাড়া পেলে সুযোগ বুঝে আবার ওই একই অপরাধ করবে। অপরাধের জন্য তাদের মনে কোনোরকম অনুশোচনা নেই। অন্যরা সাময়িক উত্তেজনার বশে অপরাধ করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোভের বশবর্তী হয়েও মানুষ প্রথম অপরাধে হাতেখড়ি করে।

ট্রেসি হুইটনিকে এর কোনো শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব নয়। সব অপরাধীদের মতো ট্রেসিও নিজের অপরাধ স্বীকার করেনি। ওয়ার্ডেন চিন্তা করেন সেইসব মানুষদের জন্য যারা ষড়যন্ত্র করে ট্রেসিকে জেলে পাঠিয়েছে। কিছুদিন আগে নিউ অর্লিয়েন্সের গভর্নর ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগানকে নিউ অর্লিয়েন্সের নাগরিক কমিশনের সদস্য করেছিলেন। ব্র্যানিগান রাজনীতি সম্পর্কে মোটেই উৎসাহিত নন, এতে তিনি মাথা ঘামান নি। কিন্তু কমিশনের তদন্তর সময় তিনি ওই লোকগুলো সম্পর্কে অনেক গোপন খবর জেনে ফেলেছিলেন। জো রোমানো একজন মাফিয়া, অ্যান্টনি ওরসেত্তির এজেন্ট, অ্যাটর্নি পেরী পোপ রোমানোদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পায়। এমনকি জজ হেনরি লরেন্সকেও জো কিনে ফেলেছেন। ট্রেসির এই সাজা হবার পেছনে ওই মাথাগুলো একটা চক্রান্ত করেছে, এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

স্ত্রীর কথার জবাবে ওয়ার্ডেন বললেন–হ্যাঁ, একজনের কথা চিন্তা করে রেখেছি।

জেলখানার রান্নাঘরের এক কোণে ছোট্ট একটি খাবার টেবিল পাতা রয়েছে, চারদিকে চারটি চেয়ার। এখানে একটু আড়াল করা জায়গা। দশ মিনিটের বিরতির সময় ট্রেসি আর লিটলচ্যাপ সেখানে বসে কফি খাচ্ছিল।

–বল, তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি জেল থেকে পালাতে চাইছো?

লিটলচ্যাপ উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে ট্রেসির দিকে। ট্রেসি চকিতে একবার লিটলচ্যাপকে দেখে নিল, এই কমাসে সে অনেক বেশি অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। আগে হলে হুড়হুড় করে

পেটের কথা বলে দিতো। এখন বুঝে সমঝে কথা বলে, লিটলচ্যাপকে কি বিশ্বাস করা যায়?

–কয়েকজন লোক আমার পরিবারের ভয়ংকর ক্ষতি করেছে। আমাকে বদলা নিতেই হবে।

–তোমার কি ক্ষতি করেছে ওরা?

–ওরা আমার মাকে খুন করেছে, ধীরে ধীরে কেটে কেটে শব্দগুলোকে হাওয়ার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল ট্রেসি।

–ওরা কারা?

–নাম শুনলে তুমি কি চিনতে পারবে? তুমি ওদের কাউকেই চেনো না। জো রোমানো, পেরী পোপ, হেনরি লরেন্স আর অ্যান্টনি ওরসেত্তি।

এই শব্দগুলো শুনে লিটলচ্যাপের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে চীৎকার করে বলল–হ্যায়, আমি কি ঠিক শুনেছি?

লিটলচ্যাপের আচরণের এই পরিবর্তনে ট্রেসিও অবাক হয়েছে। ট্রেসি বলল–তুমি এদের চেনো?

–রোমানো আর ওরসেত্তির কথা কে না জানে? নিউ অর্লিয়েন্সে ওরাই হল আসল। নেতা। তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি ট্রেসি, তুমি ওদের বিরুদ্ধে লড়তে যেও না, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না। তোমাকে ওরা একেবারে শেষ করে দেবে।

লিটলচ্যাপের এই সাবধান বাণী ট্রেসির মনের মধ্যে কোনো ভাবান্তর আনতে পারলো না। নিস্পৃহ গলাতে ট্রেসি বলল–আমার আর কি শেষ করবে বলো তো? শেষ তো আমি হয়েই গেছি?

লিটলচ্যাপ চারপাশে একবার তাকালো, আড়ি পেতে কেউ ওদের কথা শুনছে কি? জেলখানার এই একটা বিপদ, দুজন বন্দিনী অন্তরঙ্গ কথা বললেই তৃতীয় একজনের কান সেখানে পৌঁছে যায়। অতি দ্রুত খবর চলে যায় এঘর থেকে ওঘরে।

–হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে অথবা তুমি একটা অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে ছেলে। ওইসব পুরুষদের কথা তুমি মুখে আনছো কি করে আমি তো বুঝতেই পারছি না। ট্রেসি, তুমি আমার ছোটো বোনের মতো, আমি বলি কি, আমার কথা শোনো, ওদের কথা ভুলে যাও। অন্যভাবে বাঁচবার চেষ্টা করো।

–না সম্ভব নয়, যদিও আমাকে মরতে হয় তাহলেও আমি প্রতিশোধের কথা ভাববো। বলল, তুমি কি এখান থেকে আমাকে বের করতে পারবে?

বেশ কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ বসে রইল। তারপর লিটলচ্যাপ বলল–মাঠে কথা হবে।

এবার দুজনে মাঠের এককোণে দেখা করল।

–এই জেল থেকে এর আগে বারো জন পালাবার চেষ্টা করেছিল,.দুজন কয়েদীকে গুলি করে মারা হয়।

লিটলচ্যাপের এই কথা শুনে ট্রেসি কিছু বলল না। ট্রেসি জানে এখান থেকে পালানোটা খুব একটা সহজ নয়, কিন্তু ওই ভয়ংকর কাজটা তাকে করতেই হবে। পনেরো বছর ধরে সে জেলখানার অন্ধকুঠুরির মধ্যে পচতে পারবে না।

–চারকোণে চারটে টাওয়ার আছে, সেখানে চব্বিশঘণ্টা পাহারাদাররা থাকে, ওদের হাতে থাকে মেসিনগান। ওরা কুত্তীর বাচ্চার মতো শয়তান। কয়েদী পালালে ওদের চাকরি চলে যাবে, কেউ যদি পালাবার সামান্যতম চেষ্টা করে তাহলে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ে দেয়। জেলখানার চারদিকের পাঁচিলে আছে কাটা তার। যদি বা কোনোভাবে মেসিনগান আর কাঁটাতারের বেড়া পার হতে পারে তাহলেও তুমি নিশ্চিন্ত নও যে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখতে পারবে। এরপর আছে ভয়ংকর আকৃতির কালো শিকারী কুকুরের দল। কয়েক মাইল দূরে ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্র আছে, তুমি পালিয়ে গেছ এই খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা হেলিকপ্টার নিয়ে তোমাকে অনুসরণ করবে, তোমাকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় ধরে আনবেই। তবে ওরা একেবারে মেরে ফেলতে চায় না, এতে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যায় না।

ট্রেসি তখনও বলছে–তবুও তো মানুষ চেষ্টা করে, চেষ্টা করার মধ্যে কোনো দোষ আছে কি?

যারা পালাতে চায় তারা বাইরে থেকে লোক নেয়। বাইরে তাদের বন্ধু-বান্ধব থাকে, খরচ করার মতো অগুণতি টাকা থাকে। বাইরের বন্ধুরা বন্দুক পাঠিয়ে দেয়, পোশাক পাঠায়। এমন কি বাইরে গাড়ির বন্দোবস্ত করে রাখে। এত সব করার পরেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েদীকে ধরা পড়তে হয়। আর তুমি তো একটা অসহায় মেয়েমানুষ, বাইরে তোমার কিছু নেই, ভেতর থেকে তুমি পালাবার ফন্দি-ফিকির করবে কেমন করে?

নিজের ওপর অগাধ আস্থা এনে ট্রেসি বলল–ওরা আমাকে ধরতে পারবে না।

তখনই একজন মেট্রন ওদিকেই আসছিলেন, ওরা চুপ করে গেল। ট্রেসিকে ডেকে মেট্রন বললেন–ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান তোমাকে ডাকছেন, দৌড়ে যাও।

ওয়ার্ডেন ট্রেসিকে বললেন–আমার বাচ্চা মেয়েটাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন মেয়ে দরকার, তুমি কি সেই কাজটা করবে? অবশ্য তোমাকে আমি জোর জবরদস্তি করছি না, তুমি শান্ত স্বভাবের ভদ্র মেয়ে বলেই আমি তোমার কাছে এই প্রস্তাবটা রেখেছি।

অতি দ্রুত চিন্তা করল ট্রেসি, সে বুঝতে পারলো এটা ঈশ্বরের অভাবিত একটা পুরস্কার। ওয়ার্ডেনের বাড়িতে কাজ করতে করতে জেলখানা সম্পর্কে আরও অনেক গোপন খবর সে অনায়াসে জানতে পারবে।

এক লহমার মধ্যে সে তার উত্তর দিল–হ্যাঁ করবো।

জর্জ ব্র্যানিগান খুশি হলেন। এই মেয়েটাকে যে করেই হোক সাহায্য করতে হবে–এমন একটা অদ্ভুত ধারণা তাকে পেয়ে বসে আছে।

উনি বললেন–বেশ প্রতি ঘণ্টায় ৬০ সেন্ট করে পাবে। মাসের শেষে হিসেব করে ওই টাকাটা তোমার নামে জমা করে রাখা হবে।

এখানকার নিয়ম হল কয়েদীদের হাতে কোনো কঁচা পয়সা দেওয়া হবে না, ছাড়া পাবার সময় সব একসঙ্গে দেওয়া হয়।

একমাস বাদে আমি এখানে থাকবো না, ট্রেসি মনে মনে ভাবল, তুমি কাল সকাল থেকে কাজ করতে পারো, হেড মেট্রন তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে।

–আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ওয়ার্ডেন সাহেব।

এই খবর শুনে লিটলচ্যাপ কি যেন চিন্তা করতে থাকে। সে বলল, এর মানে ওরা। তোমাকে ট্রাস্টি করতে চাইছে।

–ট্রাস্টি মানে কি?

–ট্রাস্টি মানে তুমি একজন ভালো কয়েদী। এতে তোমার পালানোর পথটি সুগম হবে।

–কী করে?

–তিন রকম উপায় আছে এখান থেকে বের হবার। এক–পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে যাওয়া। দুই পিস্তল দেখিয়ে কোনো একজন কর্মচারীকে শায়েস্তা করা। তৃতীয়, পথ হল ওয়ার্ডেনের বাড়িতে কাজ করতে করতে এক ফাঁকে পালিয়ে যাওয়া, তবে কোনোটিই শেষপর্যন্ত কার্যকর হবে বলে মনে হয় না।

–কিন্তু আমি চেষ্টা করবো, করবোই, মনে মনে একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করল ট্রেসি। পরের দিন সকালে ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগানের বাড়িতে ট্রেসিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেদিন জেলখানাতে তার একশো পঞ্চাশতম দিবস। অর্থাৎ একটি একটি করে পাঁচটি মাস কেটে গেছে। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী এবং তার মেয়ের সাথে দেখা হবে ভেবে ট্রেসি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে উঠলো।

গোলাপী রঙের হাউসকোট পরা এক মহিলা দরজা খুলে বললেন–গুড মর্নিং।

–সুপ্রভাত।

মহিলাটি হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কি যেন চিন্তা করে চুপ করে রইলেন। সু এলেন ব্রানিগান দেখতে খুবই সুন্দরী, বয়স ৩৪ কিংবা ৩৫ হবে। এই পৃথিবীতে এমন কিছু মেয়ে আসে যারা সুগৃহিণী হতে ভালোবাসে, সু সেই দলভুক্ত, তবে একটু রোগা, স্বভাবের মধ্যে একটু খিটখিটে ভাব আছে, জেল কয়েদীকে কাজের মেয়ে হিসেবে পেলে তার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে সেটা বুঝতে পারেন না, তাই কথা বলতে বলতে মাঝেমধ্যে চুপ করে যান। তিনি ধন্যবাদ জানাবেন না হুকুম করবেন? ভদ্র ব্যবহার করবেন নাকি মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত

তেমন করবেন? নেশাগ্রস্ত, চোর, ধর্ষক ও খুনীদের মধ্যে বসবাস করার অভিজ্ঞতা এর আগে তার হয়নি।

–আমি মিসেস ব্র্যানিগান, আমার অ্যামির বয়স ৫ বছর, তুমি তো জানো এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কত চঞ্চল হয়। সবসময় অ্যামিকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

সু এলেন কথাগুলো বলতে বলতে ট্রেসির বাঁহাতের দিকে তাকালেন। নাঃ, অনামিকাতে বিয়ের আংটি নেই। তবে নীচু ঘরের মেয়েরা আজকাল ওসব আংটি পরে না।

উনি জানতে চাইলেন–তোমার ছেলেমেয়ে আছে কি?

অঙ্কুরে নষ্ট হওয়া ছেলেটির কথা চকিতে মনে পড়ে গেল ট্রেসির। ট্রেসি বলল–না।

ট্রেসিকে দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছেন সু এলেন। কয়েদি মেয়েদের মধ্যে এই আভিজাত্য সহসা দেখা যায় না।

–অ্যামিকে নিয়ে আসছি, বলে সেই যাত্রায় তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

এই অবসরে ট্রেসি তার বড়ো বড়ো চোখ মেলে দিল চারপাশে। ছিমছাম সাজানো সুন্দর একটি কটেজ, সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার ছাপ, জেলখানার পাশে যে এমন একটা স্বর্গ আছে, কখনও ট্রেসি তার খবর রাখেনি। আসলে অনেক দিন সে কোনো ভদ্র পরিবেশের মধ্যে আসেনি।

একটা বাচ্চা মেয়ের হাতে হাত রেখে সু ফিরে এলেন।

–অ্যামি এই হল...সু আবার কথা হারিয়ে ফেলেছেন। কয়েদিদের নাম ধরে ডাকা উচিত নাকি পদবী ধরে ভেবে তিনি ঠিক করতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, এই হল ট্রেসি হুইটনি, ও তোমাকে দেখাশোনা করবে।

–হাই, অ্যামি বলল, তার বাদামী চোখে দুষ্টুমির ছাপ। দেখতে খুব একটা সুন্দরী নয়, মায়ের রোগা ভাবটা পেয়েছে, কিন্তু আচরণের মধ্যে একটা শান্ত সরলতা লুকিয়ে আছে। এই ধরনের মেয়েকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ট্রেসি মনে মনে শপথ নিল, কিছুতেই সে ওই মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবে না।

–তুমি কি আমার নতুন ম্যানি হবে?

অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল ছোট্ট মেয়েটি।

–হ্যাঁ, তোমাকে দেখাশোনা করবো, তোমার মা-কে সাহায্য করবে এই আর কি।

সু জানতে চাইলেন-জুডি প্যারোলে ছাড়া পেয়ে চলে গেছে তুমি কি ওর মতো চলে যাবে নাকি?

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কোনো মতে ট্রেসি বলল–না, আমাকে আরও অনেক বছর এখানে থাকতে হবে।

ট্রেসির এই উত্তরে স্বভাবতই খুশি হলেন সু, তার মানে আগামী কয়েকবছর নিশ্চিন্তি। এর মধ্যে মেয়েটাও তো তরতর করে বড় হয়ে উঠবে।

ট্রেসিকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে সু এলেন কি কি করতে হবে তা বোঝাতে শুরু করে দিলেন–তুমি নিশ্চয়ই অ্যামির সঙ্গে খাবে। সকালের জলখাবার তুমি তৈরি করবে, তারপর অ্যামির সঙ্গে খেলা করবে। কাজের মেয়েটি দুপুরের রান্না করবে, দুপুরে খাবার পর অ্যামি কিছুক্ষণ ঘুমোবে। বিকেলে খামারের বাগানে ঘুরে বেড়াবে, ও গাছ-পালার সঙ্গে ভাব জমাতে খুবই ভালোবাসে। আশা করি এ ব্যাপারে তোমারও আগ্রহ আছে।

সু এলেন কথা বলে চলেছেন আর ট্রেসি মনে মনে একটা কঠিন যোগবিয়োগের অংক কষছে। অনেকটা সময় সে বাগানে ঘুরতে পারবে, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চয় জেলের মতো নিচ্ছিদ্র নয়। তার মানে? পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার একটা পথ প্রশস্ত হল কি?

কুড়ি একর জমিতে নানাধরনের তরকারি আর ফলের গাছ, এগুলো দেখাশোনা করে ট্রাস্টি অর্থাৎ বিশ্বস্ত কয়েদীরা। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা মস্ত বড়ো কৃত্রিম পুকুরও আছে সেখানে।

পাঁচটা দিন ভীষণ ভালো কাটল ট্রেসির, মনে হল বদ্ধ জগৎ থেকে সে যেন মুক্তির মঞ্চে এসে পৌঁছেছে। এই ভিন্নতর পরিবেশে তাজা হাওয়াতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল সে। অবাধে ঘোরাঘুরি করতে পারছে, এখানে রক্ষীদের রক্ত চক্ষুর ভয় নেই, এই ব্যাপারটা ট্রেসিকে আরও উৎফুল্ল করে তুলল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে পালাবার চিন্তা করছে।

অ্যামির দেখাশোনার কাজ না থাকলে ট্রেসিকে নিজের সেলে ফিরে যেতে হতো। রাতে অবশ্য তাকে বাঙ্কে থাকতে হয়, কিন্তু সকালের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে ওয়ার্ডেন সাহবের বাংলোতে চলে আসে। নিত্য নতুন ধরনের রান্না করে, চার্লসদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ও নানা রেসিপি শিখে ফেলেছিল। কিন্তু অ্যামি সাধারণ খাবার খেতে বেশি পছন্দ করে, তারপর শুরু হয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। অ্যামির সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলায় অংশ নিতে হয়, কিংবা ছড়ার বই থেকে ছড়া শোনাতে হয়।

অ্যামির সঙ্গে খেলতে খেলতে মাঝে মধ্যে ট্রেসি তার হারানো শৈশব দিনে ফিরে যেত। বাবাও ঠিক তার সঙ্গে এমনই খেলা খেলতো, আজ পরিবেশটা কেমন পাল্টে গেছে।

অ্যামি পুতুল পছন্দ করতো, ট্রেসি ওয়ার্ডেন-এর ছেঁড়া মোজা দিয়ে একটা সুন্দর ভেড়া তৈরি করল, অবশ্য সেট-ভেড়া হল না। হল শেয়াল আর হাঁসের মাঝামাঝি কিম্ভুতকিমাকার অদ্ভুত একটা জন্তু। সেটা পেয়ে অ্যামির কি আনন্দ। ট্রেসি মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করল, নাঃ কিছুতেই সে এই মেয়েটাকে ভালোবাসবে না, ভালোবাসা প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আজ অথবা আগামীকাল তাকে জেল থেকে পালাতেই হবে।

বিকেলে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ট্রেসি নজর রাখতো কোন দিয়ে পালানো যায়। সান্ত্রীরা কোথায় দাঁড়ায়, কখন তাদের ডিউটি বদল হয়। সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করতো সে। সে বুঝতে পারল লিটলচ্যাপের সঙ্গে যতগুলো পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছে তার কোনোটাই এখানে কার্যকরী হবে না অর্থাৎ তিনটি পন্থার সবগুলি ভেস্তে যাবে। চতুর্থ একটা পন্থা অবশ্যই তাকে বের করতে হবে।

ট্রেসি একবার জানতে চেয়েছিল–জেলখানাতে ট্রাকে করে যেসব খাবার জিনিসপত্র আসে, তাতে চেপে কেউ কখনও পালাবার চেষ্টা করেছে কি?

লিটলচ্যাপ বলেছিল–ঢোকবার আর বের হবার সময় গেটের প্রত্যেকটি গাড়িতে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করা হয়। তাই খুকুমনি, ওই স্বপ্নটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দাও!

একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে অ্যামি হঠাৎ ট্রেসিকে বলল–আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমার মা হবে?

এই কথা শুনে ট্রেসির মনের মধ্যে একটা ব্যথার গুমরানো অনুভূতি জাগল। সে বলল–একজন মা-ই তো যথেষ্ট, দুজন মা হলে আবার ঝগড়া বেঁধে যাবে।

–হ্যাঁ দরকার আছে, আমার বন্ধু স্যালি অ্যানের বাবা আবার বিয়ে করেছে, স্যালির তো দুটো মা।

একটু ধমকে ট্রেসি বলল–তুমি স্যালি নও, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কর।

অ্যামির মুখ ভার হয়ে গেল–আমার খিদে নেই।

–ঠিক আছে চল বই পড়বো।

ট্রেসি বই পড়ছে হঠাৎ কোলের ওপর নরম হাতের ছোঁয়া পেল।

–তোমার কোলে বসবো?

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠল বেচারী ট্রেসির। সে মুখে বলল–না। মনে মনে বলল–নিজের পরিবারের লোকের কাছ থেকে আদর চেও, আমি আমার সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাইছি না। তুমি কি জান আমার কেউ নেই, ভবিষ্যতে কেউ কখনও আমার আপন হবে না?

মেয়েটাকে এত কথা বলে ট্রেসির মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ট্রেসি রাতে আর সেলের মধ্যে থাকতে পারছে না। অন্য সেল থেকে আসা নতুন কয়েদীদের আর্তনাদ শুনে তার মন ছটফট করে ওঠে। কি করে পালাবে এই কথা ভাবতে ভাবতে রাতের পর রাত কেটে যায়। পালানোর জন্যে কোন কোন কাজ করতে হবে তার একটা আগাম পরিকল্পনা ঠিক করল ট্রেসি। প্রথমেই তাকে দেখতে হবে কোনো ফাঁক-ফোকর পাওয়া যায় কিনা। পাহারাদার বা পুলিশরা কখন ডিউটি পাল্টায় সে ব্যাপারটাও জানতে হবে। চোখ বন্ধ করে ট্রেসি মুক্ত স্বাধীন জীবনের কথা চিন্তা করে। বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে ওই শয়তান লোকগুলোর সাথে বোঝাঁপড়া করা। একেবারে শেষে আসবে চালর্স-এর পালা।

বিগবার্থাকে সে আর এড়িয়ে চলতে পারছে না। ট্রেসি জানে যেখানেই সে থাকুক না কেন, বিগবার্থার দুটি চোখ সবসময়ে তার ওপর নজর রেখেছে। ট্রেসি যেখানেই যায়, কয়েকমিনিটের মধ্যে বিগবার্থা সেখানে পৌঁছে যায়।

একদিন বিগবার্থা সরাসরি ট্রেসির কাছে একটা আবদার করে বসলদারুণ সুন্দর লাগছে তোমাকে আজ মাইরি। তোমাকে না পেলে আমার আর চলছে না।

–আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা কোরো না, কণ্ঠস্বরে আগুন ঢেলে ট্রেসি বলেছিল।

–তোমার মরদটা তো বাইরে চলে যাচ্ছে। ওই কালা কুত্তিটা ছাড়া পাচ্ছে, তখন আমি তোমাকে আমার সেলে বদলী করে নিয়ে আসবো। তুমি সেই ভয়ংকর রাতটার জন্যে মনে মনে তৈরি হও কেমন?

ট্রেসি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিগবার্থার দিকে। বিগবার্থা বলল–হ্যাঁ আমি ওটা, করাতে পারবো, তুমি কি জান আমি কত শক্তিশালী?

.

বুনো ফুলে ভরা-মাঠে ঘুরে বেড়াতে ভীষণ ভালোবাসে অ্যামি, কাছেই ওই বিশাল পুকুরটা, পুকুর পাড়ে উঁচু পাথরের দেওয়াল।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে অ্যামি বলল–চল না ট্রেসি সাঁতার কাটি।

–এখানে সাঁতার কাটা হয় না, ক্ষেতে জল দেবার জন্যে এই পুকুরটাকে ব্যবহার করা হয়।

টলটলে জল দেখে ট্রেসির মনটা কেমন উথাল পাথাল হয়ে ওঠে। ছোট্টবেলায় বাবার সঙ্গে জলে নেমে ডুবে গিয়েছিল সে, সেই ভয়ংকর স্মৃতিটা আবার তাকে আলোড়িত করল।

শেষ পর্যন্ত খবরটা শুনে ট্রেসিকে চমকে উঠতে হয়েছিল।

–এই শনিবারের পর এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

লিটলচ্যাপ কেটে কেটে বলেছিল। ট্রেসির মনে হল তার শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি জল হয়ে গেছে। এবার কী হবে? ওয়ার্ডেনকে সব কথা সে কি জানাবে? কিন্তু জেলে তো একটা অন্য নিয়ম আছে। এখানকার নিয়ম হল হয় তোমাকে মরতে হবে কিংবা মারতে হবে। তাহলে? আমি কি মারবো নাকি? অর্থাৎ লড়াইয়ের আসরে অবতীর্ণ হবো নাকি?

পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে নানারকম আলোচনা হচ্ছে। বাইরে থেকে সাহায্য না পেলে সে কখনও পালাতে পারবে না অথচ সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা চলবে না। বিগবার্থা ক্রমশ আরও অহংকারী হয়ে উঠবে। আরও বেশি প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠবে তার মনের মধ্যে।

রোববার সকালে ট্রেসিকে রান্না ঘরে কাজ করার জন্য যেতে হল। মিসেস ব্র্যানিগান অ্যামিকে নিয়ে নিউ অর্লিয়েন্সে গেছেন। কদিন বাদে লিটলচ্যাপ-এর ছুটি হয়ে যাবে।

লিটলচ্যাপ জানতে চাইল–নতুন কাজ কেমন লাগছে?

–মন্দ নয়, উদাস গলায় ট্রেসি উত্তর দিল।

–দেখো আমি তো চলে যাচ্ছি, আর কখনও ফিরবো না, তবে একটা কথা বলে যাই বাইরে থেকে অ্যালবা. আমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে...

লিটলচ্যাপ-এর কথা শেষ হবার আগে একটা মোটা ভারী কর্কশ পুরুষ কণ্ঠের শব্দ শোনা গেল–ভেতরে আসছি।

ট্রেসি ঘুরে দাঁড়াল, ধোবীখানার নোক একটা মস্ত বড় ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে ঢুকেছে, তার ওপর স্তূপাকারে রয়েছে ময়লা কাপড় জামা, পুলিশদের উর্দি, ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে নোকটা বেরিয়ে গেল। ট্রেসি এক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

–হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, অ্যাল এবং আমি তোমাকে সাহায্য করবো, বাইরে থেকে আমরা-আমরা অনেক কাজ করতে পারি যা ভেতরে বসে করা সম্ভব নয়।

–লিটলচ্যাপ, ধোবীখানার গাড়ি এখানে কেন আসে?

–এগুলো পাহারাদারদের উর্দি। জেলখানার ধোবীখানায় আগে কাঁচতে দিতো, দেখা গেল বোম থাকতো না একটাতেও। ইচ্ছে করেই বোম ছেঁড়া হত। জামাতে খারাপ কথা লেখা থাকতো, তারপর থেকে নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কি লজ্জার ব্যাপার বলো তো?

লিটলচ্যাপ-এর বকবকানি ট্রেসির কানে ঢুকছে না, এতদিন বাদে সে মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছে। তার মুখখানা তখন নতুন আশার আলোতে একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

খবরের কাগজ

জজ, ট্রেসিকে এখানে রাখা বোধহয় উচিত নয়।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন ওয়ার্ডেন। জানতে চাইলেন–কেন? সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে?

মুখ ভার করে সু বললেন–আমার মনে হচ্ছে ট্রেসি বোধহয় অ্যামিকে পছন্দ করতে পারছে না। মনে হয় ও কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পছন্দ করে না।

–অ্যামির সঙ্গে নিশ্চয় ও খারাপ ব্যবহার করেনি। তেমন ভাবে মারধোর করেছে। কি? বকাঝকা?

–না।

–তাহলে?

–কাল অ্যামি দৌড়ে ট্রেসির গলা জড়িয়ে ধরেছিল। ট্রেসি ওকে দুহাত দিয়ে ধরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। অ্যামি সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। অ্যামি বোকা মেয়ে, ইতিমধ্যেই ট্রেসিকে পাগলের মতো ভালোবাসতে শুরু করেছে। হয়তো এই কারণেই আমার ঈর্ষা হচ্ছে।

ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান স্ত্রী-র স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ওঃ এই কথা–তবে জেনে রাখো ট্রেসি এই কাজে সব থেকে উপযুক্ত। যদি সত্যি সত্যি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমাকে বলল, আমি সমাধানের একটা পন্থা বাতলে দেব।

সু এলেন তখনকার মতো চুপ করে গেলেন, কিন্তু স্বামীর এই উত্তরে তিনি যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তা তার আচরণ দেখেই বোঝা গেল।

.

ট্রেসি উৎসুক চিত্তে জানতে চাইল–ধোবীখানার কাপড়গুলো যে ঝুড়িতে যায় সেগুলি কি ভালোভাবে দেখা হয়?

লিটলচ্যাপ উত্তর দিল–না, তবে যখন ঝুড়িতে নোংরা কাপড় জামা রাখা হয় তখন একজন পাহারাদার সবকিছুর ওপর নজর রাখে।

ট্রেসি চিন্তায় পড়ল, আমতা আমতা করে জানতে চাইল আচ্ছা আর্লি, যদি কেউ পাহারাদারের দৃষ্টি অন্যদিকে পাঁচ মিনিটের জন্য আকর্ষণ করে তাহলে কি হবে?

–তাতে কি হবে বলতে বলতে আর্লি লিটলচ্যাপ হেসে ফেলল–যদি কেউ পাহারাদারটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে, বা তাকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায় তাই বলছো তো? হ্যাঁ এখানে সেরকম গায়ে পড়া অনেক বেহায়া মেয়ে আছে, বলো তো তাদের কাজে লাগিয়ে দেব, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি কি গুটি গুটি মেরে ওই ঝুড়ির ওপর বসতে পারবে?

–তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো?

মুহূর্তের জন্য কি ভেবে আর্লি বলল–হ্যাঁ করবো, বিগবার্থার মুখে ঝামা ঘষে দেবার এমন সুযোগ আমি আর কখনও পাবো না।

জেলখানার বাতাসে একটা খবর তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে ট্রেসি হুইটনি জেল থেকে পালাতে যাচ্ছে। কোনো একটা মুখরোচক খবরের সন্ধানে সবাই উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করে। নিজেদের সাহস নেই, কিন্তু কেউ একজন সাহসী হয়ে উঠেছে, একথা ভেবে সকলে মনে মনে অসীম আনন্দ পায়।

আর্লি লিটলচ্যাপ-এর সাহায্যে পালাবার পরিকল্পনা তখন ক্রমশ আরও পেকে উঠেছে। আর্লি ট্রেসির পোশাকের মাপ নিল। লোলা আর পাউলিটা কোথা থেকে কাপড় যোগাড় করল, ট্রেসির নতুন পোশাক তৈরি হল। একজোড়া নতুন জুতো চুরি করে আনা হল। পোশাকের রঙের সঙ্গে জুতো জোড়ার রং একেবারে মিলে গেল। টুপি দস্তানা সব যেন ম্যাজিকের মতো এসে উপস্থিত হল।

এবার দরকার ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভারের লাইসেন্স, মুখ গম্ভীর করে লিটলচ্যাপ বলল–সেসব কোথা থেকে পাবে?

–ভার যখন নিয়েছি তখন তো ব্যবস্থা করতেই হবে।

আর কয়েকদিন বাদে জেমস স্মিন্টের নামে বড় অংকের টাকায় ক্রেডিট কার্ড যোগাড় হয়ে গেল। শেষ অবধি ড্রাইভারের লাইসেন্স।

পরদিন রাতে লিলিয়ান নামের একটা কয়েদি চুপিচুপি ট্রেসিকে ডেকে নিয়ে গেল। প্রথম দিন তার আঙুলের ছাপ যে ঘরে নেওয়া হয়েছিল সেই ঘরে ট্রেসি হাজির হল। ওখানে আরেকজন অপেক্ষা করছিল। চট করে ফটো তোলা হয়ে গেল। কাল সকালে ড্রাইভারের লাইসেন্স হাতে এসে যাবে।

লিলিয়ান বলল, শুনলাম তোমাকে অন্য সেলে ভর্তি করা হচ্ছে? লিলিয়ানের এই কথা শুনে ট্রেসি পাথর হয়ে গেল।

–তুমি জানো না? তোমাকে বিগবার্থার সেলে পাঠানো হবে।

নিজস্ব সেলে ফিরতেই আর্লি-লোলা-পাউলিটা এগিয়ে এল। জানতে চাইল সব ঠিক মতো হয়েছে তো?

ট্রেসির মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে লিলিয়ানের শেষ কথাগুলোতোমাকে বিগবার্থার সেলে পাঠানো হবে।

পাউলিটা জানালো–শনিবারের মধ্যে সবকিছু তৈরি হয়ে যাবে।

ট্রেসি মনে মনে ভাবলোশনিবারের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে হবে।

আর্লি ফিস ফিস করে বলল–সব ঠিক আছে, শনিবার দুটোর সময় ধোবীখানার গাড়ি আসবে। দেড়টার মধ্যে তুমি নোংরা জামাকাপড় রাখার পাশের ঘরে পৌঁছে যাবে, পাহারাদারদের জন্য চিন্তা করো না। লোলা ওকে ভুলিয়ে রাখবে ফষ্টি নষ্ঠি করে। পাউলিটা তোমার সব জিনিসপত্র নিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করবে। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে তোমার পরিচয় পত্র থাকবে, থাকবে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ড। দুটো বেজে পনেরো মিনিটে গাড়ি বেরিয়ে যাবে গেট দিয়ে।

ট্রেসির দম বন্ধ হয়ে এল। বেরিয়ে তো যাবে, কিন্তু মৃতদেহ হয়ে আবার তাকে ফিরে আসতে হবে এই জেলখানার চার দেওয়ালের মধ্যে?

আর কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রেসি মুক্তি পাবে, তার হৃদস্পন্দন ক্রমশ আরও দ্রুত হয়ে উঠেছে।

এবার লিটলচ্যাপ আর বিগবার্থার মধ্যে রেষারেষি শেষপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিগবার্থার সেলের সকলের কাছে এই খবর পৌঁছে গেছে যে ট্রেসি পালিয়ে যাবে কিন্তু সাহস করে এই খবরটা কেউ বিগবার্থার কানে তুলতে পারছে না। খারাপ খবর শুনতে সে মোটেই অভ্যস্ত নয়। খারাপ খবর যে বয়ে আনে এক ঘুষিতে তার নাক ফাটিয়ে দেয়। শেষ। পর্যন্ত শনিবার সকালে বিগবার্থার কানে এই মারাত্মক খবরটা পৌঁছে গেল।

যে জেল বয়টি ট্রেসির ফটো তুলেছিল, সেই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করল।

কথাটা শুনে বিগবার্থা গম্ভীর হয়ে গেল। তার বিশাল শরীরটা তখন নিথর হয়ে গেছে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলল–কখন পালাচ্ছে?

–আজ দুপুর দুটোর সময়, ধোবীখানার কাপড় জামা যে ঝুড়িতে রাখা হয় সেই ঝুড়ির মধ্যে গুটিশুটি মেরে বসে থাকবে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বিগবার্থা মেট্রনের কাছে হাজির হল। সে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে এখন দেখা করতে চায়।

শেষ রাতটা দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি ট্রেসি, উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপেছে তার রোগা শরীর। অতীতের সব ছবিগুলো একের পর এক চোখের পর্দায় ভেসে উঠেছে। কতকাল এই নরকের অন্ধকারে পচে মরতে হয়েছে ট্রেসিকে। এবার সে সত্যি সত্যি মুক্তির সন্ধান পাবে।

ঘুম ভাঙার ঘণ্টা পড়ল। ট্রেসি ধরফর করে উঠে বসল। আর্লি লিটলচ্যাপ কাছে এসে বলল কি ভাবছো? তুমি ঠিক আছে তো?

–হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, কথাগুলো বলল বটে ট্রেসি, কিন্তু উত্তেজনায় তখনও তার বুক ধরফর করে কাঁপছে।

–আমরা দুজনে আজ এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি দেড়টার মধ্যে ওয়ার্ডেন এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো কেমন?

–অসুবিধা হবে না, আমি দুপুরে ঘুমায়। আমি অনায়াসে ফিরে আসতে পারবো।

পাউলিটা বলল–একটুও দেরি কোরো না কিন্তু, এখানে প্রত্যেকটা মিনিট অত্যন্ত মূল্যবান। সময়ের একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে সব পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে যাবে।

ট্রেসি গলায় গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলল–আমি ঠিক সময় ফিরে আসবো দেখো।

গদির তলা থেকে কিছু নোট বের করে লিটলচ্যাপ বলল–বেশি নেই, দুশো ডলার আছে, বাইরের পৃথিবীতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরকার।

–তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব...ট্রেসি কথা শেষ করতে পারল না।

আর্লি বলল–চুপ, নাও টাকাটা রাখো।

.

জলখাবারটা গিলছিলো, ট্রেসি, মাথার ভেতর একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, যে করেই হোক আজ তাকে পালাতে হবে।

রান্নাঘরে আরও অনেকে ছিল, বেশ থমথমে পরিবেশ সেখানে। সবাই তারই কথা চিন্তা করছে, আজকের এই নাটকে সেই মহানায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণ হবে। শেষপর্যন্ত ঠিক মতো সংলাপ উচ্চারণ করতে পারবে তো? নাকি অর্ধেক কথা বলার পর শেষ হয়ে যাবে তার অভিনয়?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আধখাওয়া অবস্থাতেই উঠে পড়ল সে, ছুটল ওয়ার্ডেন-এর বাড়ি যাবার জন্য। বারান্দার শেষে লোহার গেট। পুলিশ দরজাটা খুলতেই উল্টো দিক থেকে বিগবার্থার চোখে পড়ল। দুজনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ট্রেসি মনে মনে ভাবল–বিগবার্থা, একটু বাদে তুমি একটা চমৎকার খবর পাবে। তখন তোমাকে আফশোস করে মরতে হবে।

ট্রেসিকে দেখে বিগবার্থা ভাবল, ও আমার হাতের মুঠোয় আসবে। ওর এই সুন্দর শরীরটা নিয়ে আমি যা খুশি খেলা খেলতে পারবো।

সময় বুঝি আর কাটতে চাইছে না, ট্রেসি অ্যামিকে বই পড়ে শোনাচ্ছে, কি পড়ছে তা খেয়াল ছিল না, তবে এটা বুঝতে পারছিল যে জানলা দিয়ে অ্যামির মা তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন।

–ট্রেসি চল লুকোচুরি খেলি।

ট্রেসির তখন খেলার মতো অবস্থা নেই। যাতে সু-এর মনে কোনো সন্দেহ না আসে তাই সে খেলতে রাজী হল।

–নিশ্চয়, তুমি আগে লুকোও, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।

বাংলোর সামনে একটা উঠোন, ওখান থেকে সেই ঘরটা দেখা যাচ্ছে যেখানে ট্রেসিকে দেড়টার সময় পৌঁছতে হবে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তাকে বাইরে যাবার পোশাক পাল্টাতে হবে, ঢুকে পড়তে হবে ঝুড়ির মধ্যে, ওপর থেকে তার গায়ের ওপর নোংরা জামা কাপড় চাপিয়ে দেওয়া হবে। দুটোর সময় সান্ত্রী ফিরবে ট্রাকে মাল তুলবার জন্য।

দুটো বেজে পনেরো মিনিটে গাড়ি বেরিয়ে যাবে। সামান্য দূরে শহরের মধ্যে ধোবীখানা। ড্রাইভারের জায়গা থেকে পেছনটা আর দেখা যাবে না, রাস্তায় লাল আলো দেখে ট্রাকটা দাঁড়ালেই ঝুপ করে পথে নেমে পড়বে।

একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অ্যামি বলছে–আমাকে দেখতে পাচ্ছো?

এর সঙ্গে আর দেখা হবে না, এখান থেকে পালিয়ে গেলে দুজনের জন্য খুব মন খারাপ লাগবে আমার, একজন লিটলচ্যাপ আরেকজন এই অ্যামি।

নিজেই ভাবল ট্রেসি।

–আসছি তোমাকে খুঁজে বের করবো।

সু এলেন বাড়ির ভেতর থেকে বার বার ট্রেসিকে দেখছিলেন, আজ সকাল থেকেই ট্রেসি বেশ চঞ্চল। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, কোনো কাজে যেন মন নেই। অ্যামিকে ঠিক মতো যত্ন করছে না। স্বামী এলেই অভিযোগ করতে হবে। ট্রেসির স্বভাব চরিত্র মোটেই ভালো লাগছে না সু এলেনের।

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর ট্রেসি দেখল সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এবার অ্যানির খাবার সময় হয়েছে ভেতরে গিয়ে ট্রেসি সু এলেনকে বলল–আমি এবার যাই মিসেস ব্র্যানিগান?

–কেন? দুটি ভূ-ভঙ্গীতে বিরক্তি এনে মিসেস বললেন, তোমাকে কেউ কিছু বলেনি ট্রেসি? তুমি কি জান না আজ আমাদের এখানে কয়েকজন ভি আই পি আসবেন? ওই অতিথিরা আজ এখানেই খাবেন, আমি আজ ঘুমোবে না, তুমি ওকে চোখে চোখে রাখবে।

অতি কষ্টে নিজের উত্তেজনা দমন করে ট্রেসি বললনা না আজ আমি পারবো না।

–পারবে না মানে? সমস্ত শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে শ্রীমতী ব্র্যানিগান-এর।

উনি যে রেগে গেছেন সেটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেসি মত বদলালো। কারণ এখনই যদি মিঃ ব্র্যানিগান-এর কাছে এই খবর পৌঁছে যায় তাহলে উনি ট্রেসিকে হয়তো সেলে পাঠিয়ে দেবেন।

ট্রেসি জোর করে হেসে বলল–মানে বলছিলাম কি অ্যামি এখনও খায়নি।

–তোমাদের দুজনের জন্য পিকনিকের মতো খাবারের প্যাকেট তৈরি রেখেছি। পেছন দিক দিয়ে মাঠে চলে যাও, ওখানে বসে আজ দুপুরের খাবারটা খেও কেমন?

–হ্যাঁ, আমরা কখন ফিরবো মিসেস ব্র্যানিগান?

–তিনটের আগে অতিথিরা চলে যাবেন, ওই সময় ফিরবে।

এই কথা শুনে ট্রেসির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মিসেস ব্র্যানিগান জানতে চাইলেন-ট্রেসি সত্যি করে বলো তত তোমার কি শরীর। খারাপ?

–না না সেরকম কিছু নয়; তাড়াতাড়ি বলল ট্রেসি।

ভি আই পি-রা হঠাৎ জেলখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। গভর্নর উইলিয়াম হোভার নিজেই এসেছেন জেলখানা সংস্কার কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে। প্রতি বছর একবার তারা জেলখানার হাল-হকিকৎ দেখতে আসেন।

–সবই ঠিক আছে ব্র্যানিগান, মেয়ে বন্দীদের বলল আর একটু পরিষ্কার থাকতে, জেলখানাটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাহলে এই বছরে এখানকার বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবো। হাসতে হাসতে বললেন গভর্নর সাহেব।

সকাল দশটার সময় গভর্নর হোভার এবং তার কমিটির সদস্যদের আসার কথা ছিল। সেদিন সকালেই গেট পাহারাদার সমস্ত বন্দীর কাছে একটা গোপন খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, তাহল, নেশার ওষুধ বা ছুরিছোরা কোনো কিছুই রাখা চলবে না।

বিগবার্থা ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সকালে সে ওয়ার্ডেন-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বলা হয়েছে ওয়ার্ডেন আজ খুবই ব্যস্ত থাকবেন, বিগবার্থা যেন আগামীকাল আসে।

একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়ে বিগবার্থা বলেছিল–আমাকে দেখা করতেই হবে, ভীষণ জরুরী এই দেখা করাটা।

বিগবার্থাকে সকলে সমঝে চলে, কিন্তু ওয়ার্ডেন-এর অফিস ঘরে কতক্ষণ বসে থাকবে সে? ঘড়ি দেখল, বারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, হাতে এখনও অনেক সময় আছে।

দিনটা ভারী সুন্দর, আকাশের কোথাও কালো মেঘ নেই, ঝকঝকে রোদ্দুর চারপাশে হা হা করে হাসছে। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ। পুকুরটার ধারে বড় টেবিল ক্লথ পেতে অ্যামিকে ট্রেসি খেতে দিয়েছে। ডিম আর স্যালাড দেওয়া স্যান্ডউইচ অ্যামি মনের সুখে চিবুচ্ছে।

ট্রেসি ঘড়ি দেখল, সর্বনাশ, একটা বাজে, সময় বুঝি হু হু করে কেটে যাচ্ছে। যেমন করেই হোক পালাবার এই সুযোগটা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। এ সুযোগটা ফসকে গেলে আমি আর কখনও পালাতে পারবো না।

একটা বেজে দশ মিনিট, ওয়ার্ডেন-এর সেক্রেটারী টেলিফোন নামিয়ে বললেন–দুঃখিত, ওয়ার্ডেন বলেছেন আজ কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে না। তেমন দরকার থাকলে আগামী কাল...

–দেখা করতেই হবে, আজই, কালকে খবরটা দেওয়ার কোনো দরকার হবে না। হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল বিগবার্থা, আরেকটু হলেই মুখ ফসকে সেই ভয়ংকর খবরটা বেরিয়ে পড়তো। ট্রেসিকে সে কিছুতেই নাগালের বাইরে যেতে দেবে না। অনেক চিন্তা করে সে গেল জেলখানার লাইব্রেরীতে। একটুকরো কাগজে কি যেন লিখল, তারপর মেট্রনকে আসতে দেখে তার টেবিলে কাগজটা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

মেট্রন এসে কাগজটা দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে ধোবীখানায় যাবার ট্রাকটা ভালোভাবে তল্লাশি করলে ভালো হয়।

মেট্রন লেখাটা দুবার পড়লেন। তলায় কারো সই নেই। কেউ কি তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে নাকি? যাই হোক না কেন ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই? টেলিফোন তুলে মেট্রন বললেন–পাহারাদার সুপারকে দাও।

একটা বেজে পনেরো মিনিট।

–তুমি কিছু খাচ্ছো না, অ্যামি বলল, আমার থেকে স্যান্ডউইচ খাবে?

–না আমাকে বিরক্ত কোরো না অ্যামি, আমার মন ভালো নেই।

এই কথা বলে ট্রেসির মনে হল এতটা কড়া না হলেই হয়তো ভালো হতো।

অ্যামি খাওয়া বন্ধ করে জানতে চাইল–তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো? আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

অ্যামিকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল ট্রেসি। বলল, না না আমি তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি?

–আর খাব না, চল বল খেলি। পকেট থেকে রবারের বলটা বের করল অ্যামি।

...একটা বেজে ষোল মিনিট, আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল ট্রেসির। ওই ঘরটায় যেতে এখনও পনেরো মিনিট সময় লাগবে। অ্যামিকে একলা ফেলে সে কি করে যাবে? হঠাৎ ট্রেসি দেখল তার মতো বিশ্বাসী কয়েকটি কয়েদি মাঠে কাজ করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মনস্থির করে ফেলল।

অ্যামি তখন অধৈর্য্য হয়ে চীৎকার করছে, আমার সঙ্গে বল খেলবে না ট্রেসি?

–হ্যাঁ খেলবো অ্যামি, আমি তোমাকে একটা নতুন খেলা শেখাবো।

ট্রেসির এই কথা শুনে অ্যামি চঞ্চল হয়ে উঠল। ছোট্ট শিশু সে, পৃথিবীর দুঃখ শোক সন্তাপ এখনও পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এখনও সে স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছে।

–কি নতুন খেলা?

অধীর আগ্রহে অ্যামি জানতে চাইল।

আজ দেখা যাক কে কত দূরে বল ছুঁড়তে পারে। আগে আমি বল ছুঁড়ি তারপর তুমি ছুঁড়বে, এই কথা বলতে বলতে ট্রেসি কয়েদীরা যেদিকে কাজ করছিল সেদিকে লক্ষ্য করে বলটা ছুঁড়ে দিল।

–কি মজা, তুমি কত দূরে ছুঁড়েছো?

–যাই আমি বলটা নিয়ে আসি, তুমি কিন্তু এখানেই থাকবে।

ট্রেসি ছুটতে লাগল, একটা বেজে আঠারো মিনিট, সময় অত্যন্ত দ্রুত পিছলে যাচ্ছে, মুক্তির ঘন্টা সে শুনতে পাচ্ছে, মাত্র আর কয়েকটা মিনিট, তারপর? তারপর আঃ, মুক্ত পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যাবে সে!

শুনতে পেল অ্যামি তার নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু ওদিকে তাকালে মুক্তির পথ বন্ধ

হয়ে যাবে।

একজন ট্রাস্টি জানতে চাইল কি হয়েছে? এমনভাবে ছুটছো কেন?

–না না কিছু না, ওই যে ছোট্ট মেয়েটি, ওকে দেখতে পাচ্ছ কি? প্লীজ তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ওর দিকে নজর রাখবে? খুব জরুরী একটা কাজ আছে আমার, আমি এখুনি আসছি।

আবার নিজের নামটা শুনে ট্রেসি ঘুরে দাঁড়াল। পুকুরের চারপাশে যে পাথরের দেওয়াল তারই একটার ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যামি। হাত তুলে ডাকছে ট্রেসিকে। ট্রেসি বুঝতে পারলো এখনই চোখের সামনে কি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে। সে বলল–অ্যামি, অ্যামি নেমে পড়।

ট্রেসির চোখের সামনে সেই বিপদটা ঘটে গেল। ব্যালেন্স হারিয়ে অ্যামি পুকুরের জলে, পড়ে গেল।

হায় ভগবান, ছুটতে ছুটতে ট্রেসি থমকে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হল। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আরও দ্রুততর হয়েছে তখন। সে ভাবল হায়, পালাতে গিয়ে আমি একটা খুন করলাম। মনের সঙ্গে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। বিবেক বলছে এখনই তাকে পুকুরের ধারে চলে যেতে। ছোট্ট মেয়েটা শুধু তাকে ভালোবেসে এইভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে? ট্রেসি আজ হৃদয়হীনা রমণীর মত সবকিছু দেখবে? যুক্তি বলছে না, পালাবার এমন সুযোগ আর কখনও পাবে না সে। অন্য কোনো, ট্রাস্টি না হয় মেয়েটাকে জল থেকে উদ্ধার করুক। আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে, তারপর অ্যামির কথা ভাববো।

ট্রেসি ছুটতে শুরু করল, ট্রাস্টিরা ওকে ডাকছিল, কিন্তু কারোর শব্দ তখন ট্রেসির কানে পৌঁছেচ্ছে না। তখন তার পা থেকে জুতো খুলে গেছে সে জানে না, শেষ অবধি, শেষ অবধি সে দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেল, নিচে অনেকটা নিচে গভীর জলে হাত পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার শেষ চেষ্টা করছে অ্যামি, এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা না করে ট্রেসি পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সহসা তার মনে হল, হে ভগবান, আমি তো সাঁতার জানি না।

.

১২.

নিউ অর্লিয়েন্স, শুক্রবার, ২৫শে আগস্ট, সকাল ১০টা।

নিউ অর্লিয়েন্সের ফার্স্ট মার্চেন্টস ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার লেস্টার টেরেন্স-এর কথা বলা যাক। এই পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আত্ম-অহমিকা বোধকে মুঠো বন্দী করে বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন, লেস্টার টোরেন্স সেই দলভুক্ত। তিনি বিশ্বাস করেন নারীসঙ্গ

লাভ এবং যৌনক্ষমতায় তিনি নাকি পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় আসনে আসীন। তার আরেকটি বিশ্বাস আছে, তাহল তিনি খুব সহজেই তার খদ্দেরকে চিনতে পারেন এবং খদ্দেরের মনোভাব বুঝতে পারেন।

চল্লিশ-এর কোঠা শেষ করতে আরও কয়েক বছর বাকি আছে তার। ছিপছিপে চেহারা, কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই, গাল দুটো বসে গেছে, দারুণ একজোড়া গোঁফ হল তার শরীরের সম্পদ। কানের জুলপী অস্বাভাবিক রকমের বড়ো।

দু-দুবার তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি, তাই ব্যাঙ্কের ওপর রাগ আছে ক্যাসিয়ার লেস্টার টোরেন্স-এর। লেস্টার বদলা নেবার জন্য ব্যাঙ্কটাকে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের অফিস করে তুলেছেন।

যে সমস্ত দেহপসারিণীরা রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এক মাইল দূর থেকেও লেস্টার তাদের চিনতে পারেন। নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে লেস্টার বিনা পয়সায় কাজ সারেন। নিঃসঙ্গ বিধবারা হল তার সব থেকে ভালো শিকার। নানা চেহারার নানা বয়সের বিধবা মেয়েরা পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। দারিদ্রতার জ্বালায় তারা জর্জরিত। সংসারের সকলের কাছ থেকে তারা অপমান পেয়ে আসছে। লেস্টার শেষ পর্যন্ত তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। তারা লেস্টারের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ায়। কেউ জমা টাকার থেকে বেশি টাকা তুলে ফেলে। চেক যাতে ফেরত না যায় সেজন্য লেস্টার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দেন। পরিবর্তে কি? পরিবর্তে ওই মহিলা হয়তো লেস্টারকে একদিন নৈশ ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করবেন। লেস্টারের বহু মহিলা মক্কেল নানা সাহায্য চায়, নিজেদের গোপন কথা হরহরিয়ে বলে ফেলে, কেউ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার চায় অথচ

স্বামীর কাছে এই ব্যাপারটা বলা চলবে না, কেউ চেকের কোনো কোনো বিষয় গোপন রাখতে বলে, কেউ আবার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন লেস্টারের শরণাপন্ন হয়। কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চাইছে, লেস্টার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিতে পারেন কিনা? লেস্টার সব ব্যাপারে সবাইকে খুশি করতে অত্যন্ত আগ্রহী, প্রত্যেকদিন অন্তত একজন অসহায় মহিলাকে সাহায্য না করলে রাতে লেস্টার দুচোখের পাতা এক করতে পারেন না।

শুক্রবারে সকালে লেস্টারের হঠাৎ মনে হয় উনি একটা মস্ত বড় জ্যাকপট জিতে ফেলেছেন। ব্যাঙ্কের দরজা দিয়ে ঢোকার মুহূর্তে লেস্টার মেয়েটাকে দেখেছিলেন। মেয়েটার রূপ লাবণ্য লেস্টারকে বিমোহিত করেছিল। লেস্টার সুনিশ্চিত, মেয়েটাকে পায়ে পায়ে তার খাঁচার দিকে এগিয়ে আসতেই হবে। সুন্দর কালো চুলের গোছা কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, স্কিন টাইট জীনস আর সোয়েটার পড়েছে, মনে হচ্ছে ফ্যাসান ডিজাইনের পাতা থেকে বুঝি এখুনি উঠে এসেছে। আঃ, ঈশ্বর যে কেন চোখের সামনে এমন মনোহরিণী মেয়েদের এনে উপস্থিত করেন।

ব্যাঙ্কে আরও চারজন ক্যাসিয়ার আছেন। অন্য তিনজন লেস্টারের ভাগ্যকে সবসময়ে। ঈর্ষা করেন। ক্যান্টিনে কফি খেতে খেতে তারা বলে-লেস্টার, তুই ভগবানের পোষ্যপুত্র নাকি? দ্যাখ, তোর খাঁচা সবার শেষে অথচ সুন্দরী মেয়েরা তোর দিকেই ছোটে, কেন বলতো?

ডিমের পোচ খেতে খেতে লেস্টার জবাব দেন–আমার শরীরে ভগবান একটা চুম্বক ফিট করে দিয়েছেন, তাই লোহার মতো মেয়েরা আমার দিকে ছুটে চলে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মেয়েটি এক এক করে তিনটি খাঁচা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত লেস্টারের খাঁচায় সামনে এসে দাঁড়াল।

লেস্টার বললেন–সুপ্রভাত, আপনার জন্য কি করতে পারি? তারপর একদৃষ্টিতে মেয়েটির উর্ধাঙ্গের দিকে তাকালেন। কবে যে, এই সোয়েটারের বোঝাটা ওই মেয়েটিকে আর বহন করতে হবে না, লেস্টার মনে মনে ভাবলেন। আরও ভাবলেন তিনি, খুকুমণি, তোমার ঠোঁট থেকে খসে পড়া একটুকরো হাসির জন্য আমি জীবনটকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।

মেয়েটি মিষ্টি করে বলল–একটা সমস্যায় পড়ে গেছি, তার কথার মধ্যে দক্ষিণী টান স্পষ্ট।

গলায় দরদ ঢেলে লেস্টার বললে–আপনার সমস্যা সমাধান করবার জন্যই তো ব্যাঙ্ক আমাকে মাসে মাসে মোটা মাইনে দিচ্ছে। বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবো?

–আমিও সে রকম আশা করছি, একটা দারুণ ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়ে ফেলেছি।

মনে মনে লেস্টার ভাবলেন–স্বচ্ছন্দে তোমার সমস্যার কথা আমাকে তুমি গুছিয়ে। বলতে পারো। যদি এখানে বলতে অসুবিধা হয় তাহলে বিকেলে কোনো কাফেতে আসতে পারো।

লেস্টার মুখের ওপর একটা অমায়িক ভাব তুলে বললেন–আমি বিশ্বাস করি না তোমার মতো মেয়ে কোনো ঝঞ্ঝাট বাঁধতে পারে। ঈশ্বর যাকে এমন রূপ দিয়েছেন, নিশ্চয় তার মাথার খোলটাকে একেবারে ফাঁপা করে রাখেননি।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার লেস্টার দেখেছেন, প্রশংসা করলে সব মেয়ে মোমবাতির মতো গলতে শুরু করে।

কিন্তু তখন মেয়েটির বাদামী চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে–সে বলল, সত্যি সত্যি আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আমি জোসেফ রোমানোর সেক্রেটারী, উনি আমাকে এক সপ্তাহ আগে তাঁর কারেন্ট অ্যাকউন্টের নতুন চেক বই নিয়ে রাখতে বলে ছিলেন। আমি একদম ভুলে গেছি। এখন আমাদের সব চেক প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এই খবরটা যদি ওঁর কানে পৌঁছয় তাহলে আমার চাকরি আর থাকবে না।

জোসেফ রোমানোর নাম লেস্টার খুব ভালোভাবেই জানেন, উনি হলেন এই ব্যাঙ্কের একজন গণ্যমান্য কাস্টমার, অবশ্য এখন তিনি খুব অল্প টাকা ব্যাঙ্কে রাখেন। জনান্তিকে শোনা গেছে উনি নাকি অন্যত্র বেশি টাকা খাটান।

মনে মনে মেয়েটিকে তারিফ করলেন লেস্টার, আঃ, রোমানো দেখছি এই ব্যাপারে বাজী জিতে বসে আছেন, সেক্রেটারী রাখার ক্ষেত্রে তার কোনো ভুল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত একটু হেসে উনি বললেন–দেখো, এটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয় শ্রীমতি।

আমি শ্রীমতি নই, আমি কুমারী লুরিন হার্টফোর্ড।

কুমারী, আহা, তাহলে সবকটা ছাড়পত্র পাওয়া গেল, লেস্টার মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে বললেন–আমি এখুনি নতুন চেকবই-এর জন্য বলে দিচ্ছি। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

লেস্টারের এই কথা শুনে মেয়েটি এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে সে বলল–ওঃ না, তাহলে কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে যাবে। মিঃ রোমানো এমনিতেই আমার ওপর চটে আছেন, আমি নিজের কাজ ঠিক মতো করতে পারি না। এবার মেয়েটি খাঁচার ওপর তার সুন্দর তনুবাহার মেলে ধরল। এই প্রথম সোয়েটারের আড়াল থেকে স্তন বিভাজন দেখতে পেলেন লেস্টার, মনের আকাশে খুশির ফানুস উড়ে গেল। মেয়েটি বলছে দুচোখের পাতায় করুণ মিনতি নিয়েযদি একটু তাড়াতাড়ি করে চেক বইটা পাইয়ে দেন তাহলে যে আমার কি উপকার হয়। যদি এর জন্য কোনো বাড়তি চার্জ। দিতে হয়, আমি তাও দেব।

বাড়তি চার্জ, মেয়েটির শরীর জরিপ করতে করতে লেস্টার বললেন–না, দুঃখিত লুরিন, তা সম্ভব নয়।

এবার মেয়েটির চোখে জল এসেছে।

–সত্যি কথা বলতে কি, কর্তব্যের গাফিলতির জন্য আমার চাকরি চলে যেতে পারে। দয়া করে যা বলবেন আমি তাই করবো।

লেস্টার এই কথাগুলি শুনে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তার মানে? মেয়েটিকে কি এখুনিই ফাঁদে ফেলা উচিত?

লেস্টার বলতে শুরু করলেন–ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি, সোমবারে তুমি চেকবই পেয়ে যাবে। কি চলবে তো?

লেস্টারের এই কথা শুনে মেয়েটির গলা তখন কৃতজ্ঞতায় বুজে এসেছে। মেয়েটি বলল–আপনি অসাধারণ।

-অফিসে পাঠিয়ে দেব?

–না, না অফিসে পাঠাবেন না। তাহলে মিঃ রোমানো জেনে যাবেন। বলুন সোমবার কটার সময় আসতে হবে আমাকে?

–আমাকে সব সময় এখানেই পাবে।

একরাশ মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে মেয়েটি চলে গেল। লেস্টার ফাইল ক্যাবিনেট থেকে জোসেফ রোমানোর এ্যাকাউন্ট নাম্বারটা বের করলেন, নতুন চেক বই। এখনই তৈরী করতে হবে, তা নাহলে মেয়েটির ওপর জাল বিস্তার করবেন কেমন করে?

.

নিউ অর্লিয়েন্সের কারমেন স্ট্রীটের এই হোটেলটার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। পাঁচশ হোটেলের মতো এটি খুবই সাধারণ, তাই ট্রেসি এই সস্তা হোটেলটাকে বেছে নিয়েছিল।

সস্তা হলেও জেলখানার সেলের তুলনায় এটি একটা স্বর্গ একথা অনায়াসেই বলতে হবে।

ব্যাঙ্কে লেস্টারের সাথে দেখা করে ফেরার পথে ট্রেসি তার কালো চুলের পরচুল আর চোখের কনট্যাক্ট লেন্স অতি দ্রুত খুলে ফেললাম। চড়া মেক-আপ নিয়েছিল, সেটাও ক্লিনার দিয়ে তুলে ফেলল। তারপর আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। ভাবল, এবার ঠিক মতো কাজ শুরু হয়েছে, জোসেফ রোমানো কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখে সেটা ও মা র ফাইল থেকে জেনে ফেলেছে। জো রোমানো ওর মাকে একটি চেক দিয়েছিল। আর্নি লিটলচ্যাপের কথা মনে পড়ে গেল ট্রেসির, আর্নি বলেছিল জো রোমানো, ভুল করে ওর গায়ে হাত দিও না তুমি।

আর্নি ভুল করেছিল, জো রোমানোকে দিয়েই শুরু হয়েছে ট্রেসির প্রতিশোধের পালা। এর পর একে একে সে সবার সাথে লড়াই করবে। কিভাবে অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে ভাবতে ভাবতে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

ঠান্ডা জলের তলায় ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল ট্রেসি। কোনোরকমে সামলে দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে অ্যামিকে খুঁজে পেল। অ্যামিকে টানতে টানতে জলের ওপর ভেসে উঠল। অ্যামি তখন ভীষণ ভয় পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ট্রেসিকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। একটু পরে অ্যামির মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। তখন সে আর ট্রেসিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হয়তো ছোট্ট অ্যামি বুঝতে পেরেছিল ট্রেসির জন্যই আর তার এই অবস্থা।

তখন সে পাগলের মতো ট্রেসির হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। দুজনেই আবার ডুবতে শুরু করল। ট্রেসি বুঝতে পারছিল সে আর কিছু করতে পারবে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুক ফেটে যাচ্ছে। সলিল সমাধি থেকে অ্যামিকে বাঁচাবার জন্য শেষবারের মতো চেষ্টা করল ট্রেসি। অ্যামিকে জলের ওপর টেনে তুলে ভাসিয়ে রাখতে গেল, ট্রেসি বুঝতে পারল ও আর পারবে না। একটু বাদে দুজনেই মরে যাবে।

তখনই মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। কারা যেন অ্যামিকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে কয়েকটা শক্ত হাত এসে ট্রেসির কোমর ধরে তাকেও টেনে তুলল। কে যেন কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল–সব ঠিক আছে, আপনি ভয় পাবেন না।

মরিয়া হয়ে ট্রেসি মুখ তুলে তাকাল, একজনের কোলে অ্যামি। যাক বাবা, তাহলে অ্যামি শেষপর্যন্ত মরেনি!

ঘটনাটা সমান্য, কিন্তু রাতারাতি গণমাধ্যম ট্রেসিকে এক মহান দুঃসাহসী নায়িকা করে। তুলল। গভর্নর হোভার নিজেই চলে এলেন জেলখানার হাসপাতালে ট্রেসির সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাঁতার জানে না এমন একজন মেয়ে কয়েদী নিজের জীবন বিপন্ন করে ওয়ার্ডেনের মেয়েকে বাঁচিয়েছে বর্তমান সমাজে ব্যবস্থায় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে কি?

ওয়ার্ডেন বলেছিলেন–খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছো তুমি, তুমি না থাকলে মেয়েটি কখনই বাঁচতো না। শ্রীমতী ব্র্যানিগান এবং আমি দুজনেই তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছি।

তখনও ট্রেসি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। সে ধীরে ধীরে বলল–অ্যামি কেমন আছে?

অ্যামি ভালো আছে, এই কথাটা শুনে শান্তিতে ট্রেসির দুচোখ বন্ধ হয়ে গেল। অ্যামির কিছু হলে সে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারতো না। অ্যামিকে সে খুব একটা ভালো বাসতে চায়নি, কিন্তু আমি ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে, এর জন্য খুবই অপরাধবোধ জাগলো ট্রেসির মনের মধ্যে।

দুর্ঘটনাটার ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত হল।

আমি তার বাবাকে বলেছিল–দোষটা আমার, আমরা বল খেলছিলাম, ট্রেসি বলটা আনবার জন্য অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে ট্রেসি পইপই করে বলেছিল আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে, কিন্তু ট্রেসিকে ভালো করে দেখার জন্য আমি পাঁচিলের ওপর উঠে যাই, তখনই জলে পড়ে যাই। ট্রেসি কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিয়েছে বাবা।

সে রাতটা ট্রেসিকে হাসপাতালে রাখা হল। পরদিন সকালে তাকে ওয়ার্ডেনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে টিভির ক্যামেরা আগে থেকেই হাজির ছিল। হাজির ছিল সাংবাদিকদের দল। ট্রেসিকে নিয়ে একটা দারুণ সিরিয়াল তৈরী হতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ ট্রেসির এই অসাধারণ সাহসিকতার কথা শুনল। খবরের কাগজগুলোর পাতায় পাতায় প্রকাশিত হল ট্রেসির এই দুরন্ত

অভিযানের কাহিনী। কয়েকদিনের মধ্যে হাজার হাজার চিঠি আর টেলিগ্রাম পৌঁছতে লাগল জেলখানাতে। সকলেই অনুরোধ করছে কর্তৃপক্ষ যেন ট্রেসিকে ক্ষমা করে দেয়।

শেষপর্যন্ত গভর্নর হোভার ব্যাপারটা নিয়ে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

ওয়ার্ডেন মনে করিয়ে দিলেন যে ট্রেসি হুইটনি একটা গুরুতর অপরাধের জন্য জেলে বন্দী অবস্থায় সময় কাটাচ্ছে।

গভর্নর বেশ চিন্তায় পড়লেন, তিনি বললেন–কিন্তু এর আগে সে তো কোনো অপরাধ করেনি তাই নয় কি?

–তা সত্যি স্যার।

–মনের কথাটা বলছি আপনাকে। ওপর থেকে আমার ওপর প্রচুর চাপ আসছে, মেয়েটির জন্য কিছু একটা করতেই হবে।

–আমার ওপরও স্যার।

–অবশ্য জনগণের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে আমরা জেলের প্রশাসন চালাবো নাকি কী বলেন?

–নিশ্চয় না স্যার।

–কিন্তু, আবার গভর্নর বেশ ভেবেচিন্তে বললেন, ওই হুইটনি মেয়েটি অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আমাদের দেশের সকলের চোখে ও এখন কল্পলোকের নায়িকা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হাত কচলাতে কচলাতে ওয়ার্ডেন বললেন–হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে এক মত।

শেষ পর্যন্ত গভর্নর সিগার ধরিয়ে প্রশ্ন করলেন–আপনার কি মত ওয়ার্ডেন?

খুব সাবধানে বেছে বেছে শব্দ নির্বাচন করে ওয়ার্ডেন তাঁর মন্তব্য ব্যক্ত করলেন–আপনি নিশ্চয় জানেন গভর্নর, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। ট্রেসি যদি নিজের জীবন বিপন্ন করে জলে ঝাঁপিয়ে না পড়তো তাহলে আমার মেয়ে বাঁচতো না স্যার। তবে আমি মনে করি না ট্রেসি হুইটনি জাত অপরাধী। ও ছাড়া পেলে সমাজ এবং সংসারের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি জোরালোভাবে ওর জন্য সুপারিশ করছি, ওকে যাতে ক্ষমা করা হয় সে বিষয়টা আপনি ভালো করে দেখবেন।

গভর্নর দ্বিতীয়বার গভর্নর নির্বাচিত হওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই সুবিধাজনক বলে মনে হল। তিনি ওয়ার্ডেনকে বললেন–বিষয়টা এখন গোপন রাখবেন। রাজনীতিতে সব কিছু সময় বুঝে করতে হয়।

স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করার পর সু ট্রেসির কাছে এলেন। সু বললেন–ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান এবং আমি চাইছি তুমি আমাদের কোয়ার্টারে এসে থাক। পিছনদিকে একটা শোবার ঘর আছে সেখানে থাকলে তুমি সবসময়ে অ্যামির যত্ন নিতে পারবে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তখন কৃতজ্ঞতায় ট্রেসির দুচোখে জল এসে গেছে। ট্রেসি বলল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

অ্যামির সঙ্গে ট্রেসির সম্পর্ক তখন খুবই মধুর হয়ে উঠেছে। অ্যামির ভালোবাসার ডাকে ট্রেসি প্রাণ খুলে সাড়া দিল। এই প্রাণচঞ্চল সুন্দর মেয়েটির সান্নিধ্যে এসে ট্রেসির জীবন তখন আরও মধুময় হয়ে উঠেছে। খেলাধুলো আর পড়াশোনাতে সময় কেটে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে তারা দুজন একসঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় ওয়াল্ট ডিজনির কার্টুন দেখেন। সে যেন এখন ব্রানিগান পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে।

যখনই কোনো কাজে তাকে জেলখানার ভেতর যেতে হতো তখন বিগবার্থার চাপা কণ্ঠস্বর তাকে বিরক্ত করতো। বিগবার্থা তাকে লক্ষ্য করে বাছা বাছা কিছু বিশেষণ ছুঁড়ে দিতো। মাঝেমধ্যে সে বলতো কুত্তী, তোর ভাগ্যটা দেখছি খুবই ভালো। তবে তোকে একদিন এখানে ফিরে আসতেই হবে। দেখি ওয়ার্ডেনের বাপ তোকে কি করে বাঁচায়।

অ্যামিকে জল থেকে উদ্ধার করার পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। একদিন ট্রেসি আর অ্যামি সামনের বাগানে বসে খেলছিল, হঠাৎ সু সেখানে এলেন, তিনি বললেন–ট্রেসি, ওয়ার্ডেন এখনই ফোন করেছেন, তোমাকে অফিসে দেখা করতে বলছেন।

এই কথা শুনে ভয়ে ট্রেসির বুক কাঁপতে থাকলো। তাহলে? নিজের অজান্তে সে কি : কোনো কুকাজ করে ফেলেছে নাকি? তাকে কি আবার জেলখানায় ফেরত পাঠানো হবে? তাহলে কি বিগবার্থারই জয় হল? মিসেস ব্র্যানিগান কি চাইছেন না যে তার সঙ্গে অ্যামির ঘনিষ্টতা বেড়ে উঠুক?

–যাচ্ছি মিসেস ব্র্যানিগান।

পুলিশ ট্রেসিকে ওয়ার্ডেন-এর অফিসে পৌঁছে দিল, ওয়ার্ডেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেসিকে দেখে তিনি আন্তরিকতা পূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন–বোসো, তোমার জন্যে একটা খবর আছে, একটু থামলেন তিনি, তার গলায় আবেগের একটা সূক্ষ্ম ছোঁয়া আছে, ট্রেসি সেটা বুঝতে পারলো না।

–লুইসিনিয়ার গভর্নরের কাছ থেকে একটা খবর এসেছে। তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে, এই মুহূর্ত থেকে তুমি স্বাধীন আর মুক্ত।

–হে ঈশ্বর, আপনি যা বলছেন তা কি ঠিক? মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দ বের হল না ট্রেসির!

–আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যই এটা করা হচ্ছে না। একজন সৎ এবং ভদ্র নাগরিক হিসাবে তুমি যা করছে, তার কোনো তুলনা নেই। আমি বিশ্বাস করি তোমার দ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে আমার একটু কষ্ট হচ্ছে, দেখতে দেখতে তুমি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলে, কথা দাও পরে আবার আমার মেয়ের সাথে দেখা করতে আসবে তো?

ট্রেসির মুখে কোনো ভাষা ফুটলো না। হায় ওয়ার্ডেন যদি সেদিনের পরিকল্পনার কথাটা জানতে পারতেন তাহলে নিশ্চয় একথা বলতেন না। এতদিন আমার মৃতদেহ আনার জন্যে তার লোকেরা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতো।

পরশুদিন তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ট্রেসি কোনো রকমে বলল–কি বলে যে আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো আমি বুঝতে পারছি না।

–তোমার কিছু বলার দরকার নেই ট্রেসি। এখানকার সকলেই তোমার কাজের জন্য গর্বিত। মিসেস এবং আমার একান্ত ইচ্ছো তুমি তোমার অভিজ্ঞতা বাইরের কাজে লাগাও। আশাকরি সৎ সুন্দর শোভন জীবন-যাপন করতে পারবে।

–শেষপর্যন্ত আমি স্বাধীন হতে পেরেছি, দুর্বল হয়ে গেছে ট্রেসির সমস্ত শরীর, কোনোরকমে চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল–অনেক কিছু করার আছে আমার ওয়ার্ডেন ব্র্যানিগান!

জেলখানার শেষরাত। ট্রেসির সেল–ওয়ার্ডের একজন মেয়ে কয়েদী বলল–তাহলে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ?

–হ্যাঁ।

এর নাম বেটি ফ্রান্সিসকসে। বয়স চল্লিশের কোটায়, কিন্তু এখনও যৌবনকে ধরে রেখেছে।

–বাইরে যদি কারো সঙ্গে দেখা করতে হয় তাহলে নিউইয়র্কের কোনরাড মরগানের সঙ্গে দেখা করো। অপরাধীদের সংশোধিত জীবন-যাপন করার জন্য মরগান আন্তরিকভাবে সাহায্য করে।

বেটির ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তুলে দিলে ট্রেসির হাতে।

ট্রেসি বলল–ধন্যবাদ আমার তেমন কোনো দরকার হবে না।

–না, কাগজের টুকরোটা রেখে দাও, বিশাল পৃথিবীতে কখন কাকে দরকার পড়ে আমরা কি আগে থেকেই হিসেব নিকেশ করতে পারি?

দুঘন্টা বাদে ট্রেসি জেলখানার দরজা দিয়ে বের হল। টেলিভিশনের ক্যামেরা দাঁড়িয়ে আছে দুপাশে। সাংবাদিকদের সাথে সে কথা বলবে না। কিন্তু আমি তার মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে ট্রেসিকে জড়িয়ে ধরল। একসঙ্গে সব কটি ক্যামেরা তখন অন হয়ে গেছে। সেদিন সন্ধ্যার খবরে এই দৃশ্যটই বার বার দেখানো হচ্ছিল।

সে ভালো পোশাক পরতে পারবে, ভালো দোকানে খেতে পারবে, ভালো সাবান মাখতে পারবে, শুধু তাই নয়, একটা নম্বর থেকে সে আবার নামে ফিরে এসেছে। স্বাধীনতার পাশাপাশি বিগবার্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াটাও বটে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ছকে ফেলতে হবে, ফিলাডেলফিয়াতে চার্লস স্ট্যানহোপ তৃতীয় দেখলো, ট্রেসি জেলখানা থেকে ছুটি পাচ্ছে। মনে মনে সে চিন্তা করলো, ও এখনও তেমনই সুন্দর। চার্লস বিশ্বাস করে ট্রেসিকে কোনোভাবে ফাঁসানো হয়েছে। যে

আপরাধের জন্য তাকে জেলখানায় থাকতে হল, সেই অপরাধ সে কোনোদিনই করেনি। চার্লস তার আদর্শ স্ত্রীর দিকে একবার তাকলো, স্ত্রী আপন মনে সেলাই করে চলেছে। চার্লস মনে মনে ভাবলো শেষপর্যন্ত জীবনের জুয়া খেলাতে আমি হেরে গেলাম নাকি?

ড্যামিয়েন কুপার নিউইয়র্কে নিজের ফ্ল্যাটে বসে টেলিভিশনে এই ছবিটা দেখতে পেল। ট্রেসি জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। টেলিভিশনটা বন্ধ করে সে নিজের কাজে মন দিল। জো রোমানো এই দৃশ্যটা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো, হুইটনি মেয়েটার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, জেলখানা থেকে ও ভালোভবে শিক্ষা পেয়েছে। আশা করি আমার সঙ্গে আর টক্কর নিতে আসবে না।

রোমানো মনে মনে খুবই খুশী। রেনোয়ার ছবিটাকে ইতিমধ্যে দেশের বাইরে চালান করে দিয়েছে। জুরিখের একজন শৌখীন সমঝদার সেটা কিনে নিয়েছে, নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখার জন্য। বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে পাঁচ লাখ পাওয়া গেছে, জুরিখের ওই ভদ্রলোক দিয়েছে দু-লাখ। অ্যান্টনি ওরসেত্তির সঙ্গে টাকাটা ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। কারণ ওরসেত্তিকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করে রোমানো। লেনদেনের ব্যাপারে সামান্য গোলযোগ দেখা দিলে ওরসেত্তি যে কিভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠে, এর আগে বেশ কয়েকবার দেখতে পেয়েছে রোমানো।

সোমবার দুপুরবেলা, ট্রেসি এখন লুরিন হার্টফোর্ড সেজেছে। হাজির হয়েছে ফাস্ট মার্চেন্টস ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কটা গমগম করছে। সবকটা কাউন্টারের সামনে খদ্দেরদের লম্বা লাইন। লেস্টার টোরেন্সের জানলার সামনে তখন কয়েকজন কাস্টমার অপেক্ষা করছেন। ট্রেসি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এগুতে এগুতে খাঁচার সমানে এসে গেল।

লেস্টার বোধহয় এতক্ষণ ট্রেসির কথাই ভাবছিলেন। আঃ, মেয়েটাকে দেখে তাঁর সমস্ত মন খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠল। আগের থেকেও মেয়েটাকে আরও সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে। শরীরে একটা আলগা চটক আছে। হায়, কবে ওই মেয়েটাকে আমি নিজের মতো করে পাবো?

–দেখো, কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন অসুবিধার কথা বলছে, তখন আমি না করে থাকতে পারলাম না।

ট্রেসি বুঝতে পেরেছে এবার মাছ তার জালে পড়েছে, খেলিয়ে খেলিয়ে তাকে ওপরে তুলতে হবে। সে মুখে হাসি আনলো, উষ্ণ আমন্ত্রণের ইশারা জাগালো তার দুটি চোখের তারায়। সে বলল–সত্যি আপনার তুলনা হয় না।

–এই নাও, ড্রয়ার খুলে চেকবই-এর বাক্স বের করলেন লেস্টার, ট্রেসির হাতে চারশো নতুন চেক তুলে দিলেন। বললেন–হবে তো? এতে কাজ হবে তো?

–যথেষ্ট, এবার লেস্টারের চোখে চোখ রেখে ট্রেসি বলল–আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

এই কথা শুনে লেস্টারের সমস্ত শরীরে একটা মৃত্যু শিহরণ বয়ে গেল। তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করার কোনো কারণ আছে কি? কি বলো লুরিন?

–খুবই সত্যি কথা বলেছেন আপনি।

–আচ্ছা তুমি কেন এখানে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলোনি? আমি সবদিক দিয়ে সাহায্য করবো।

–আমি জানি আপনি সাহায্য করবেন, ট্রেসি মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব দেখালো।

–একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে ডিনার খেতে খেতে এনিয়ে আলোচনা করলে কেমন হয়?

–খুবই ভালো হয়।

ট্রেসি তো তাই চাইছিল, যে করেই হোক লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে হবে। যে কোন বাজে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করতে হলে ক্যাশিয়ারকে হাতে রাখতেই হবে।

–কোথায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো লুরিন?

–কেন আপনি কষ্ট করবেন? আপনি কত ব্যস্ত মানুষ, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

লাইন থেকে সরে দাঁড়ালো ট্রেসি।–এক মিনিট, লেস্টার এখনই এই ব্যাপারটা পাকা করতে চান, তার আগে অন্য খদ্দের এক থলি খুচরো তুলে দিল লেস্টারের হাতে।

ব্যাঙ্কের মাঝখানে চারটে টেবিল পাতা, সেখানে টাকা জমা দেবার এবং তোলবার শ্লিপগুলো থাকবন্দী রাখা থাকে। টেবিলে ভীষণ ভীড়, লেস্টার যাতে দেখতে না পায়, এমন একটা কোণে সরে গেল ট্রেসি। একজন খদ্দের সরে যেতে ট্রেসি চেয়ারে বসে

পড়ল। আটটা প্যাকেট ভর্তি ফাঁকা চেকগুলো লেস্টার দিয়েছিলেন একটি কাগজের বাক্সে করে। কিন্তু চেকের ব্যাপারে ট্রেসির কোনো আগ্রহ নেই। প্যাকেটগুলোর পেছনে দেওয়া জমা দেওয়ার স্লিপগুলো তার দরকার।

ট্রেসি সাবধানে জমা দেওয়ার স্লিপগুলোকে আলাদা করলে। তিন মিনিটের মধ্যে ওর হাতে আশিটা জমা দেওয়ার স্লিপ চলে এল। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা সে ভালোভাবে দেখলো। কুড়িটা স্লিপ ধাতুর পাত্রে ঢুকিয়ে দিল।

পাশের টেবিলে গিয়ে আরও কুড়িটা স্লিপ ওইভাবে ঢুকিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আশিটা স্লিপ চালান হয়ে গেল। জমা দেবার এই স্লিপগুলো ফাঁকা ছিল, কিন্তু তার তলার দিকে চুম্বক লাগানো অংশে নম্বর দেওয়া থাকে, কম্পিউটার যন্ত্র সহজেই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা করে দেয়। টাকাটা কে জমা দিচ্ছে সেটা দেখা কম্পিউটারের কাজ নয়, ওই স্লিপগুলোর মাধ্যমে জো রোমানোর নামে টাকা জমা হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে কাজ করার অভিজ্ঞতায় ট্রেসি জানে দুদিনের মধ্যে চুম্বক লাগানো জমা স্লিপগুলো কাজে লেগে যাবে। সত্যিকারের টাকা জমা দিয়েও এইভাবে স্লিপ জমা দেওয়ার ব্যাপারটা ধরতে ধরতে পাঁচদিন লেগে যাবে। ট্রেসির যা কিছু ষড়যন্ত্র তা ওই পাঁচদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

হোটেলে ফিরে ফাঁকা চেকগুলো নষ্ট করে ফেলল, এবার ট্রেসি গেল নিউ অর্লিয়েন্স হলিডে ট্রাভেল এজেন্সীর দপ্তরে। ডেস্কের পেছনে বসে থাকা এক যুবতী বলল, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

নিজের পরিচয় দিয়ে ট্রেসি বলল–আমি জোসেফ রোমানোর সেক্রেটারী। মিঃ রোমানো, রিও ডি জেনেরিওর একটা টিকিট চেয়েছেন, আগামী শুক্রবার পেলে ভালো হয়।

–একটাই টিকিট চাই?

–হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাসের কোণের দিকে, আর যাতে সিগারেট খেতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করতে হবে।

যুবতী কম্পিউটার নিয়ে বসলো, কয়েক মিনিট পড়ে বলল–সব ঠিক আছে, প্যান আমেরিকান প্লেনে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট পাবেন। ফ্লাইট নাম্বার ৭২৮, সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় টেক অফ।

ট্রেসি যুবতীটিকে আশ্বাস দেবার জন্য বলল, মিঃ রোমানো একথা শুনে খুবই খুশি হবেন।

–টিকিটের দাম পড়বে ১৯২৯ ডলার। টাকা কি নগদে দেবেন, না আমরা চার্জ করে নেব?

মিস্টার রোমানো সবসময় নগদে দেন। ওঁর অফিসে বৃহস্পতিবার টিকিট পৌঁছাতে হবে। সেখানেই টাকাটা দিয়ে দেওয়া হবে।

–ম্যাডাম, আমরা কি কাল টিকিট পাঠিয়ে দেব?

–না-না, কালকে মিস্টার রোমানো থাকছেন না। বৃহস্পতিবার ঠিক সকাল এগারোটায়, মনে থাকবে তো?

–ঠিক আছে। ঠিকানাটা?

–মিস্টার জোসেফ রোমানো, ২৭ পয়ড্রাস স্ট্রিট, সুইট নম্বর ৪০৮।

যুবতীটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়ে বলল, বৃহস্পতিবার সকালে টিকিট পৌঁছে যাবে।

একটু দূরে লাগেজ স্টোরস। দোকানে ঢোকার আগে জানলায় সাজানো বাক্স প্যাটরাগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ট্রেসি।

একজন কেরানী এগিয়ে এসে বলল–সুপ্রভাত ম্যাডাম, বলুন আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

ট্রেসি বলল, আমি আমার স্বামীর জন্য লাগেজ কিনতে চাই।

–ঠিক জায়গাতে এসেছেন। এখন আমরা ভালো জিনিস কম দামে ছেড়ে দিচ্ছি।

–না-না, কম দামী জিনিস আমি চাই না। দেওয়ালের গায়ে কতগুলো দামী স্যুটকেস সাজানো ছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে ট্রেসি বলল–ওই ধরনের জিনিস চাই।

–সুন্দর জিনিস। আপনার স্বামীর পছন্দ হবে, এই জাতীয় স্যুটকেস তিনটি সাইজের হয়। কোনটা দেব আপনাকে?

একটুখানি চিন্তা করে ট্রেসি বলল–তিনটে সাইজের একটা করে দেবেন।

–ভালো কথা, আমরা বিল পাঠিয়ে দেব, নাকি আপনি নগদে দেবেন?

–ডেলিভারী দিলেই হবে, নাম জোসেফ রোমানো, বৃহস্পতিবার সকালে পৌঁছে দিতে হবে।

–নিশ্চয়ই দেব মিসেস রোমানো।

–সকাল এগারোটার সময়।

–আমি নিজে যাব।

–তাহলে তো খুব ভালো হয়। একটু ভেবে ট্রেসি আবার বলল, স্যুটকেসের গায়ে J. R. অক্ষরদুটো লিখে দেওয়া যায় কি?

–নিশ্চয়ই যায়। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

ট্রেসি একটু হেসে জোসেফ রোমানোর অফিসের ঠিকানাটা ওই ছেলেটির হাতে তুলে দিল। সেখান আর এক মুহূর্ত থাকল না।

তারপর কাছের একটা পোস্টাফিস থেকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল। টেলিগ্রামটি রিও ডি-জেনেরিওর কোপাব্লাঙ্কা বিচের রিও ওখোল প্যালেস-এর বিখ্যাত হোটেলে।

ট্রেলিগ্রামে বলা হল, শুক্রবার থেকে দুমাসের জন্য আপনাদের হোটেলের সব থেকে ভালো সুইটটা আমার নামে বুক করতে হবে। টেলিগ্রামে টাকার অঙ্কটা জানিয়ে খবর দেবেন। জোসেফ রোমানো, ২৭ পয়ড্রাস স্ট্রিট, স্যুইট নম্বর ৪০৮, নিউ অর্লিয়েন্স লুইস্পিনিয়া, ইউ. এস. এ।

তিনদিন বাদে ট্রেসি ব্যাঙ্কে ফোন করল। লেস্টার টোরেন্সের সাথে যোগাযোগ করে মিষ্টি ভাষায় বলল, আমাকে হয়তো আপনার মনে নেই। আপনি যা ব্যস্ত মানুষ, আমি মিস্টার রোমানোর সেক্রেটারী লুরিন হার্টফোর্ড বলছি।

লেস্টার মনেপ্রাণে এমন একটি ফোনের জন্য অপেক্ষাতে ছিলেন। তিনি হৈ-হৈ করে বললেন, মনে নেই মানে? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাকে। তোমাকে যে একবার দেখবে, তার মনের প্রেক্ষাপটে তোমার ছবি চিরদিনের জন্য ধরা থাকবে।

–মনে আছে? কী আশ্চর্য, আপনাকে রোজ তো কত কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

কিন্তু ম্যাডাম, অপরাধ নিও না। তোমার মতো আর কেউ নয়, তুমি কি ডিনার খাবার কথাটা ভুলে গেছো।

–না, আমি ছটফট করছি, আগামী মঙ্গলবার কি আপনার সময় হবে?

–হ্যাঁ, সময় হবে।

–তারিখ তা হলে পাকা রইল। আহা, আমি একটা বোকা গঙ্গারাম, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আসল খরবটা নেওয়া হয়নি। মিস্টার রোমানো জানতে চাইলেন, তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে। আপনি কি বলতে পারবেন?

লেস্টার টেরেন্স এ ধরনের খবর কাউকে দিতে চান না। ব্যাঙ্কের নিয়মনীতিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। কিন্তু এখন তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে ফোনটা একটু ধরবেন কি?

লেস্টার উঠে গিয়ে অ্যাকাউন্ট বইটা দেখে এলেন। এই একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগল তার, গত কয়েকদিন ধরে মিস্টার জোসেফ রোমানো প্রচুর টাকা জমা দিয়েছেন। এর আগে রোমানো তো এত টাকা কখনো রাখেননি। তাহলে কোনো একটা অঘটন কি ঘটতে যাচ্ছে? লুরিনের পেট থেকে সব কথা বের করতে হবে ডিনারের সময়।

ফিরে এসে ফোনটা তুলে ট্রেসিকে বললেন–তোমার সাহেব আমাদের খুব ব্যস্ত করে তুলেছেন। ওনার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় তিন লক্ষ ডলার জমা আছে।

–ঠিক আছে, হিসাবের সাথে একদম মিলে যাচ্ছে।

–তাহলে মঙ্গলবার?

–আমি ফোন করে জায়গাটা ঠিক করে রাখব, ডার্লিং। মিষ্টি করে বলল ট্রেসি। কিন্তু এই সম্পর্কটা বোধহয় ওখানেই ছিন্ন হয়ে গেল।

এবার আমরা আর এক অপরাধী অ্যান্টনি ওরসেক্তির কাছে যাব। পয়ড্রাস স্ট্রিটের ওপর একটি অকাশ ছোঁয়া বাড়ির মালিক তিনি। একদিকে নদী, অন্য দিকে লুইসিনিয়ার বিখ্যাত সুপারড্রাম। প্যাসিফিক এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানীর অফিস এই বাড়ির পাঁচতলাটা দখলে রেখেছে। এরই একপ্রান্তে ওরসেত্তির অফিস। ঠিক বিপরীত দিকে জো রোমানোর অফিস। মাঝের বিশাল হলঘরে চারজন মহিলা রিসেপশনিস্টকে দেখা যায়। এরাই আবার সন্ধ্যেবেলা ওরসেত্তির বন্ধু বা খদ্দেরদের সঙ্গ দেয়। ওরসেত্তির ঘরে দুটো বিশাল দেহী মানুষ বসে থাকে। তারা হল ওরসেত্তির দেহরক্ষী, ড্রাইভার এবং মালিশওলা। মাঝে মধ্যে তারা ওরসেত্তির ফাঁই ফরমাস খাটে।

বৃহস্পতিবার সকালবেলা, ওরসেত্তির নিজের অফিসঘরে বসে আগের দিন কত টাকা জমা হয়েছে, তার হিসাব নিকাশের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। প্যাসিফিক এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানী যে কত রকমের ব্যবসা করে সে বোধহয় নিজেও তার খবর রাখে না।

ওরসেত্তির বয়স ষাটের কোটার শেষের দিকে। তার শরীরের গঠনটা অত্যন্ত বিচিত্র, ওপরের অংশটা বিশাল। পা দুটো সেই তুলনায় ছোটো এবং রোগা। সে যখন দাঁড়ায়, তখন মনে হয় একটা ব্যাঙ বোধহয় উঠে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। মুখে অসংখ্য কাটাকুটির চিহ্ন। চট করে দেখলে একটা মাতাল মাকড়সার কথা মনে পড়ে যায়। প্রচুর মদ গিলে বেচারা মাকড়সা এলোমলো পায়ে হেঁটে গেছে তার মুখের ওপর দিয়ে। মুখের হাঁটা বড্ড বড়ড়া, ঠোঁটটা কালো। পনেরো বছর বয়েস থেকে তার মাথার চুল পাতলা

হতে শুরু করেছে। তারপর থেকে সে কালো পরচুল পরে থাকে। এটা তাকে মোটেই মানায় না। কিন্তু মুখের ওপর সত্যি কথাটা বলবে কে?

তার চোখের দৃষ্টি পাকা জুয়াড়ির মতো। কখনো সেখানে কোনো আবেগের খেলা দেখা যায় না। মনে হয় সে যেন নিস্পন্দ চোখের তারা দিয়ে কাউকে ভালো ভাবে দেখার চেষ্টা করছে। যখন সে তার পাঁচ মেয়ের সঙ্গে থাকে তখন চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ আর ভালোবাসা ঝরে পড়ে। ওরসেত্তির মনের কথা বুঝতে হলে তার কণ্ঠস্বর শুনতে হবে। এমনিতে তার গলা বেশ কর্কশ, একুশ বছরের জন্মদিনে তার গলায় তার জড়িয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন থেকে সে খ্যাড়খেড়ে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছে। যে দুজন ভুল করে ওই কাজটা করেছিল, দুদিনের মধ্যে তাদের মৃতদেহ মর্গে জমা পড়ে যায়। কিন্তু ওরসেত্তির এর পর থেকে আর জোরে কথা বলতে পার না।

নিউ অর্লিয়েন্স হল ওরসেত্তির রাজত্ব। ঘুষ, বন্দুক, আর ব্ল্যাকমেলকে সঙ্গী করে সে তার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। নানাজনের কাছ থেকে ভোলাবাবদ যা পায়, তা সংগ্রহ করে আজ শহরের এক মস্ত বড়ো ধনী। অন্য দলের কাঁপোনরা ওরসেত্তিকে মহাগুরু বলে সম্মান করে। বিপদে আপদে তার কাছে আসে শলা-পরামর্শ করার জন্য।

সেদিন সকালে মনটা বেশ খুশিখুশি ছিল ওরসেত্তির। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছে। লেকভিটা অঞ্চলের ফ্ল্যাটে তার রক্ষিতার কাছে গিয়ে। সপ্তাহে তিনদিন নিয়ম করে সে ওই ফ্ল্যাটে যায়। আজ সকালের মধুর স্মৃতিতে তার মন এখনো আচ্ছন্ন। ব্যবসাপত্র বেশ ভালোই চলছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। ওরসেত্তি জানে, সমস্যা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তার সমাধান করতে হয়। আর একটা ব্যাপারে সে অসম্ভব চালাক। যদি

লোকের মধ্যে বৈরীতার সামান্য চিহ্ন দেখা দেয়, তখনই সে লোকটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে সে কারো সাথে আপোস করে না।

ওরসেত্তির ডান হাত হল জো রোমানো। দুজনের স্বভাব চরিত্রে দারুণ মিল আছে। তাই একে অন্যকে অসম্ভব ভালোবাসে। জো রোমানো ছোটো থেকেই পকেটমারের কাজে যথেষ্ট নাম করেছিল। তখনই সে ওরসেত্তির নজরে পড়ে যায়। এবার ওরসেত্তি জো রোমানোকে শিখিয়ে পড়িয়ে বড়ো করে তুলেছে। ওরসেত্তির কাছে জো রোমানো প্রায় ছেলের মতোই। জো রোমানো ওরসেত্তিকে খুবই বিশ্বাস করে। ওরসেত্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সে আজ এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। গত দশ বছর ধরে সে ওরসেত্তির ডান হাত হিসাবে কাজ করছে।

দরজায় টোকা দিয়ে ওরসেত্তির প্রাইভেট সেক্রেটারী লুসি ঘরে ঢুকল। মেয়েটার বয়েস চব্বিশ বছর, গ্রাজুয়েট, দেখতে দারুণ, সুন্দরী, স্থানীয় কয়েকটা বিউটি কনটেস্টে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছে। সত্যিই তাক লাগানো রূপের বাহার তার, নিজেকে কেমন করে আরো আবেদনময়ী করে তুলতে হয়, মেয়েটি সেটা ভালোভাবেই জানে। আমরা আগেই বলেছি, ওরসেত্তি সবসময় সুন্দরী মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দিন কাটাতে ভালোবাসে। অবশ্য এটা হল তার ব্যবসার একটা কৌশল। এভাবেই সে রূপসী মেয়েদের টোপ হিসাবে ব্যবহার করে।

ওরসেত্তি ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। লুসিকে বলা আছে দুপুরের আগে যেন তাকে বিরক্ত না করা হয়। তাকে এই সময় আসতে দেখে ওরসেত্তি খুবই অবাক হয়ে গেল। চোখের তারায় অসংখ্য বিরক্তি এনে সে প্রশ্ন করল–কী হয়েছে?

–আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কে একজন মিস গিগি দুপ্রেস ফোন করেছে। মনে হয় মেয়েটার মাথা খারাপ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ও বারবার ফোনে আপনাকেই চাইছে।

ওরসেত্তি তার মনের কমপিউটার চালু করল। গিগি দুপ্রেস? এই জীবনে অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে সঙ্গত করেছে সে। একবার ভাবল, লাসভেগাসে মনে হয় ওই মেয়েটির সঙ্গেই রাত কাটিয়ে ছিল। নাঃ, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, যাই হোক, কে বলছে, কি বলছে, একবার শোনা দরকার, ওরসেত্তি ফোনটা তুলল। চোখের ইঙ্গিতে লুসিকে চলে যেতে বলল।

–হ্যাঁ, কে বলছো?

–আপনি কি মিস্টার অ্যান্টনি ওরসেত্তি? মেয়েটির গলায় ফরাসী টান আছে। ফরাসী মেয়েরা আরো বেশী যৌন আবেদনময়ী হয়ে থাকে। ওরসেত্তির মন বিহ্বল, মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল।

–যদি তাই হয়?

–ভগবানকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হল। ঠিকই বলেছে সেক্রেটারী, মেয়েটির মাথায় গোলমাল আছে। যাই হোক কী বলছে শুনতে হবে। ওরসেত্তি ঠান্ডা মাথায় ভাবল।

–ওকে যেমন করে পারেন, থামান।

–দেখুন ম্যাডাম, আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আপনি কী বলছেন, তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

–আমি আমার জো-এর কথা বলছি। জো রোমানো। ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলেছিল, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?

–জো রোমানোর সঙ্গে আপনার যা গোলমাল সেটা আপনারা দুজনে মিটিয়ে নিন। আপনাদের দুজনেরই বয়েস হয়েছে, এব্যাপারে আমাকে মিছিমিছি টেনে আনছেন কেন?

–ও আমাকে মিথ্যে বলেছিল, আমি এইমাত্র খবর পেলাম, ও ব্রাজিল চলে যাচ্ছে। আর তিন লাখ ডলারের অর্ধেকটা আমার, কিন্তু আমাকে কিছু জানায়নি।

হঠাৎ ওরসেত্তির মনে হল, ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ আছে। সে জানতে চাইল,– আপনি কোন্ তিন লাখ ডলারের কথা বলছেন?

–যে টাকাটা জো তার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রেখেছে। মানে যে টাকাটা...

ওরসেত্তির মুখ চোখ গম্ভীর হল। এবার সে রহস্যের চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে চাইছে। সে বলল, দেখা যাক, আপনার জন্য কী করতে পারি ম্যাডাম।

জো রোমানোর অফিস ঘরটা খুবই আধুনিক। দেওয়ালে হালকা বিস্কুট রঙের প্রধান্য। কয়েকটা দামী পেন্টিং সুন্দরভাবে সাজানো–এ নিয়ে রোমানোর গর্ব আছে। শহরের বস্তি

থেকে এতদূর পথ পার হয়েছে সে, অহংকার তো হবেই। মোটামুটি লেখাপড়াও শিখে নিয়েছে। ছবির কদর করে। সঙ্গীত শিল্পীদের সম্মান করে। মদ খায়, অন্যরা সেখানে গায়ের জোর খাঁটিয়ে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে জো রোমানো বুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজ হাসিল করে। সত্যি যদি এই কথা মেনে নেওয়া হয়, যে নিউ অর্লিয়েন্সের আসল রাজা ওরসেত্তি তবে আর একটা সত্যি আমাদের স্বীকার করতে হবে–। তা হল, ওই রাজ্যে জো রোমানো হল প্রধানমন্ত্রী।

জো রোমানোর সেক্রেটারী ঘরে ঢুকে জানাল মিস্টার রোমানো, একজন লোক রিও-ডি-জেনেরিওর প্লেনের টিকিট নিয়ে এসেছে। টাকাটা ওকে দিয়ে দেব কি?

–রিও-ডি-জেনেরিও? রোমানো অবাক হয়ে তাকাল, বলে দাও–ওরা ভুল করেছে।

উর্দি পরা একজন লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, আমাকে এই টিকিটটা ||||||||| জো রোমানোর অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

–দেখো, কেউ হয়ত ভুল করেছে, নাকি বিমান কোম্পানী নতুন একটা কয়দা কানুন বের করল। এভাবে ওরা কাস্টমারদের বোকা বানচ্ছে নাকি?

–না, স্যার। আমি...

জো রোমানো হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিল। শুক্রবারের টিকিট। আমি হঠাৎ শুক্রবার রিও-ডি-জেনেরিওতে যাব কেন?

–কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে, টিকিটটা লোকটির হাতে তুলে দিতে দিতে জো রোমানোনা মন্তব্য করল-যাও, ফেরত নিয়ে যাও।

–না-না, এত তাড়াতাড়ি নয়, বলতে বলতে ওরসেত্তি ঘরে ঢুকে পড়ল। টিকিটটা হাতে তুলে নিল।

–এই যে এতে লেখা আছে, ফাস্ট ক্লাসের টিকিট, সিগারেট খাওয়া চলবে, রিও ডি-জেনেরিও শুক্রবার। শুধু যাবার টিকিট, রিটার্ন টিকিট কাটা হয়নি।

জো রোমানো হেসে বলল, ভুল করে পাঠানো হয়েছে।

তারপর সেক্রেটারীর দিকে ঘুরে বলল–ঐ ট্রাভেল এজেন্সিকে ডেকে বলে দাও তো। দেখো, কোন বেচারার টিকিট আমার ঘাড়ে পড়েছে, ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে।

ঠিক এই সময় সহকারী সেক্রেটারী জোলীন ঘরে এসে বলল, আমাকে মাপ করবেন স্যার, সুটকেসগুলো এসে গেছে। আমি কি সই করে নিয়ে নেব?

জো রোমানো হাঁ করে তাকিয়ে রইল।সুটকেস? স্যুটকেসের অর্ডার তো আমি দিইনি ।

সকাল থেকে কী হচ্ছে?

ওরসেত্তি হুকুম দিল স্যুটকেসগুলো এখানে নিয়ে এসো।

রোমানো বোকার মতো মন্তব্য করল–কী ব্যাপার বলো তো? সকলের একসঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

দোকানের কর্মচারী তিনটে স্যুটকেস নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডেলভারী স্লিপটা পড়ে সে বলল–এতে লেখা আছে, মিস্টার জোসেফ রোমানো, ২৭, পয়ড্রাস স্ট্রিটে পৌঁছে দিতে হবে। সুইট নম্বর ৪০৮।

এবার জো রোমানো সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেছে। কাহাতক এই রঙ্গ রসিকতা সহ্য করা যায়? সে বলল, তুমি আমার চোখের সামনে থেকে এখনই দূর হয়ে যাও। আমি কোনো কিছুর অর্ডার দিইনি।

ওরসেত্তি স্যুটকেসগুলো পরীক্ষা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল–কিন্তু জো, এতে তোমার নাম লেখা আছে!

–কী বললেন? দাঁড়ান, মনে হচ্ছে, কেউ উপহার পাঠিয়েছে।

–আজ কি তোমার জন্মদিন?

–না, তবে মেয়েদের তো আপনি ভালো করেই চেনেন, কোনো গায়ে পড়া মেয়ে হয়তো আমার সঙ্গে আরও একটু বেশী আলাপ জমাতে চাইছে। তাই উপহার পাঠানোর এই সরল সহজ পথটাই সে গ্রহণ করেছে।

কথা শেষ হবার আগে ওরসেত্তি বলল–তুমি কাল ব্রাজিল যাচ্ছো কেন?

–ব্রাজিল? কেউ ঠাট্টা করেছে।

অদ্ভুত হেসে ওরসেত্তি দুজন সেক্রেটারী আর দুজন লোককে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলল। তারপর জানতে চাইল-ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে জো?

একটু সামলে নিয়ে জো রোমানো বলল–জানি না, হাজার দেড়েক, কী দুয়েক হবে।

–পরীক্ষা করার জন্যই বলছি, তুমি কি একবার ব্যাঙ্কে ফোন করে দেখবে?

–কী জন্য?

–দেখোই না একবার।

–বেশ। জো রোমানো তার সেক্রেটারীকে ফোন করে বলল, ফার্স্ট মার্চেন্টস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টট্যান্টকে ফোনে দাও তো।

এক মিনিট বাদে ব্যাঙ্কের ফোন বেজে উঠল–আমি জোসেফ রোমানো বলছি। আমার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, জানাবেন কি? আমার জন্ম তারিখ ১৪ই অক্টোবর।

শেষেরটা কোড নম্বর। ওরসেত্তির ফোনের এক্সটেনশান লাইনটা ধরল। একটু বাদে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জানাল, আপনার অ্যাকাউন্টে তিন লাখ ন হাজার পাঁচ ডলার সাঁইত্রিশ সেন্ট আছে মিস্টার রোমানো।

রোমানোর মনে হল, তার শরীরের সমস্ত রক্ত কে বুঝি শুষে নিচ্ছে। সে আরো একবার প্রশ্ন করল-কত বলছেন?

–তিন লাখ ন হাজার পাঁচ ডলার সাঁইত্রিশ সেন্ট।

–বুদ্ধ কোথাকার, কার অ্যাকাউন্ট কার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস। আমি এখনই তোর চাকরির বারোটা বাজিয়ে দেব। তুই এখনই ম্যানেজারকে লাইনটা দে।

রেগে গেলে রোমানো এইভাবেই তুই তুকারি করতে শুরু করে। কিন্তু রোমানোকে। আর কোনো কথা বলতে দিল না ওরসেত্তি। সে বুঝতে পারল, কোথাও একটা গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সে চট করে রিসিভারটা রোমানের হাত থেকে কেড়ে নিল।

–এই টাকাটা তুমি কোথা থেকে পেলে জো?

–বিশ্বাস করুন, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, এই টাকার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

–ঠিক করে বলো।

এবার কঠিন চোখে জো রোমানোকে জরিপ করতে থাকে ওরসেত্তি। ওরসেত্তি বুঝতে পেরেছে, এবার বিশ্বাসের পাথরে ফাটল ধরেছে, এর শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়তে হবে।

জো রোমানো তখন ঝরা পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ চেষ্টা করছে। সে বলছে, বিশ্বাস করুন আমাকে, আপনি তো বহুকাল ধরে আমাকে চেনেন। কেউ বোধহয় আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

–ওই কেউ তোমাকে খুবই ভালাবাসে। সে নিশ্চয়ই তোমাকে তিন লক্ষ ডলার ধারে দিয়েছে।

ওরসেত্তি একটা বড়ো সোফায় গা এগিয়ে দিল। আবার জোকে নজর বন্দী করল। বলতে লাগল–সব কিছু ঠিকঠাক করা আছে।

তাই নাকি? সব ঠিকঠাক করা আছে। রিও-ডি-জেনেরিওতে যাবার টিকিট, স্যুটকেস, মনে হচ্ছে তুমি নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চাইছো।

–না, রোমানো আর্তনাদ করে উঠল। আপনি তো জানেন, আমি কখনো আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিনি। আমার কাছে আপনি বাবার মতো।

জো রোমানো ঘামতে শুরু করেছে। এমন সময় দরজায় টোকা। সেক্রেটারী মাথা বাড়াল, হাতে একটা খাম, দুঃখিত, আপনার নামে একটা কেবল আছে। আপনাকেই সই করতে হবে।

জো রোমানো এবার বোধহয় সত্যি সত্যি ফাঁদে পড়েছে। মরিয়া হয়ে সে বলল–এখন না, আমি ব্যস্ত আছি।

ওরসেত্তি সই করে সেটা নিয়ে নিল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কেবলটাতে চোখ বোলাল।

মর্মভেদী দৃষ্টিতে জো রোমানোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ওরসেত্তি বলল–আমি পড়ে শোনাচ্ছি জো, তুমি শুনতে পারবে তো? এই শুক্রবার, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে দুমাসের জন্য আমাদের প্রিন্সেস সুইটটা আপনার জন্য রিজার্ভ করা হল। সই আছে এস মন্তালবান্দ, ম্যানেজার, রিও ওখোল, কোপাব্লাঙ্কা বিচ, রিও ডি জেনেরিও। কি জো, এবার তুমি বলবে সব কিছু মিথ্যে? তবে মনে রেখো, তুমি কিন্তু সাপের গর্তে পা দিয়েছ।

.

১৩.

আন্দ্রে গিলিয়ান রান্না ঘরে খাবার বানাতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ দুম করে শব্দ হল। এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রটা থেমে গেল।

আন্দ্রে এই ঘটনাতে খুবই বিরক্ত। সে বলল–ধ্যুৎ, আজকে খেলার দিন, আজকে এমন ঘটনা ঘটলে চলবে কেমন করে?

সুইচগুলোতে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল সে। এটা-ওটা টিপে এয়ার কন্ডিশনারটা চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু মেশিনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে।

তার মানে মিস্টার পোপ আজ দারুণ ক্ষেপে যাবে। আন্দ্রে জানে ওর মালিক শুক্রবারের রাতগুলোর জন্য সাদর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। প্রতি শুক্রবার এই বাড়িতে

পোকার খেলা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বাড়িতে খেলাটি চলে আসছে। শহরের বিশেষ মানুষেরা সেই খেলাতে যোগ দেন। এয়ার কন্ডিশনার কাজ না করলে গরমে খেলা অসহ্য হয়ে উঠবে। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর মাসে নিউ অর্লিয়েন্সে যা গরম পড়ে।

আন্দ্রে ঘড়ি দেখল, চারটে বাজতে চলেছে, রাত সাতটা থেকে অতিথিরা আসতে শুরু করবেন। প্রথম সে ভাবল, মিস্টার পোপকে একটা ফোন করবে। তারপর মনে পড়ল উনি আজ সারাদিন কোর্টে ব্যস্ত থাকবেন। এত খাটাখাটনির পর একটু বিনোদনের আসর না বসালে বাঁচবেন কেমন করে?

টেলিফোনের বই দেখে একটা নাম্বারে ফোন করল আন্দ্রে। এক্সিনো এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিস।

ফোন ধরেই মেয়ে রিসেপসনিস্ট মুখস্থ করার মতো গড়গড় করে বলে গেল–এই মুহূর্তে মেকানিক নেই, নাম-ঠিকানা দিয়ে রাখুন, এলেই পাঠিয়ে দেব।

রাগে গড়গড় করতে করতে আন্দ্রে পেরী পোপের নাম ঠিকানা জানাল। বলল, এখুনি যেন মেকানিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দ্রে গিলিয়ান তিন বছর ধরে রাঁধুনির চাকরি করছে। সে জানে, তার মনিবের ক্ষমতা অসীম। এত কম বয়েসে এত বুদ্ধি রাখতে আর কাডিকে দেখেনি সে। নামকরা লোকেরা পর্যন্ত তার মনিবের কথায় ওঠা-বসা করে। লোককে সম্মোহিত করে রাখার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর মনিব ইতিমধ্যেই করায়ত্ত করেছেন।

গরম ধীরে ধীরে বড়ছে। রান্নার কাজটা এগিয়ে রাখতে হবে। আন্দ্রে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আধ ঘন্টাবাদে ঘন্টার আওয়জ হল। আন্দ্রে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। কোম্পানীর পোশাক পরা দুজন লোক এসেছে। তাদের হাতে যন্ত্রপাতির বাক্স। একজন কালো চামড়ার,

অর্থাৎ নিগ্রো অন্য জন সাদা চামড়ার।

নিগ্রো লোকটি জিজ্ঞেসা করল–এয়ার কন্ডিশনার খারাপ হয়েছে?

–হ্যাঁ, ভাগ্য ভালো তোমরা এসে গেছে। একটু তাড়াতাড়ি করো। কিছুক্ষণ পর থেকেই নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করবেন।

আন্দ্রে দুজন মেকানিককে নিয়ে গেল সেই ঘরে, যেখানে এয়ার কন্ডিশনারটা আছে। নিগ্রো মিস্ত্রীটি যন্ত্রের তলার দিকটা খুলে কী সব দেখে নিয়ে মন্তব্য করল ঝঞ্ঝাটটা এখানে নেই, অন্য কোথাও আছে, যেখান দিয়ে হাওয়া ঢোকে সেই গর্তে।

আন্দ্রে জানাল, এই বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে এয়ার কন্ডিশনার আছে। তাই মোট ফোকরের সংখ্যা আট-নটার কম হবে না।

ওগুলো একে একে দেখার জন্য আন্দ্রে মেকানিক দুজনকে নিয়ে বসার ঘরে মধ্যে দিয়ে আর একটা ঘরে যাচ্ছিল। বসার ঘরটা বেশ বড়ো এবং সুন্দর সাজানো। বাঁদিকে খাবার

ঘর, ডানদিকে আড্ডা মারার ঘর। সেখানে তাস খেলার টেবিল পাতা। ওই ঘরে ছাদের কাছে এয়ার কন্ডিশনারের গর্তটা দেখল তারা।

তাস খেলার টেবিলের ওপরের ছাদ দেখে মেকানিকরা বলল–এই ঘরের ওপর কী আছে?

–চিলেকোঠা।

–ওখানে একবার যেতে হবে। আন্দ্রে একটা ঘরে নিয়ে গেল। এতকোণে একটা ইলেট্রিক ফিটিংস-এর তারগুলো জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে।

পেয়েছি। আন্দ্রে তাড়াতাড়ি করে জানতে চাইল–ঠিক হয়ে যাবে তো সব?

–নিশ্চয়। তবে একটু সময় লাগবে। মনে হচ্ছে কনডেনসার খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের কাছে নতুন কনডেনসার আছে, এখুনি লাগিয়ে দেব।

–একটু তাড়াতাড়ি করো ভাই। মিস্টার পোপ এখুনি ফিরে আসবেন। তিনি যা রগচটা মানুষ, খেটেখুটে ফিরে এসে যদি এই অবস্থার সামনে তাকে পড়তে হয়, তাহলে অবস্থা খুবই খারাপ হবে।

–আমাদের হাতে ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার কাজ করো।

সাদা মেকানিক আশ্বাস দিল আন্দ্রেকে।

ওরা দুজন আবার নেমে গেল। ট্রাক থেকে দুটো বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে উঠে এল চিলেকোঠায়। আন্দ্রে রয়ে গেল রান্না ঘরে।

এবার আমরা দুজন মেকানিকের পরিচয় দেব। নিগ্রোটির নাম অ্যাল, সাদা চামড়ার নাম র‍্যালফ। ওরা চিলেকোঠায় এসে ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা একটি ক্যাম্প চেয়ার বের করল। বের করল একটা ড্রিল মেশিন। স্যান্ডউইচ খাবার ট্রে, দু টিন বিয়ার, একটি শক্তিশালী বাইনোকুলার, যা দিয়ে অল্প আলোতেও সব কিছু দেখা যায়। আর বের করল, দুটি জ্যান্ত ইঁদুর। যাদের ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

এবার ওরা দুজন একমনে কাজ করতে শুরু করল।

নিগ্রো অ্যাল কাজ করতে করতে মনের আনন্দে কথাটা বলল–এবার আর্নেস্টাইন আমাকে বাহবা দেবেই।

প্রথমে অ্যাল কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতে আপত্তি জানিয়ে ছিল।

–তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কোথাকার কে পেরী পোপ, তাঁর জন্য আমি কেন ছুটতে যাব? আর যদি একবার ধরা পড়ি, তা হলে?

–ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। ও কোনো দিনই কারোর পেছনে লাগবে না। আল আর আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপ কথা বলছিল লিটলচ্যাপের ফ্ল্যাটে বসে।

–এতে তোর কী লাভ হবে? অ্যাল জানতে চাইল।

–পেরী পোপ লোকটা খচ্চর। জন্মের ঠিক নেই। বেজন্মার বাচ্চা।

এই কথা শুনে অ্যাল হেসে উঠল হো-হো করে। বলেছিল–এই পৃথিবীর অদ্ধেক লোকই তাই। তাদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব কেন আমি মাথার ওপর নেব।

–এই কাজটা আমি করতে চাইছি আমার বন্ধুর জন্য। লিটলচ্যাপ শেষ পর্যন্ত বলে–বসল।

–ট্রেসি?

–হ্যাঁ।

ট্রেসিকে অ্যালের পছন্দ হয়েছিল। সেদিন ট্রেসি জেল থেকে ছাড়া পায়, সেদিন তিনজন একসঙ্গে ডিনার খেয়েছিল।

–ভদ্রবাড়ির মেয়ে কিন্তু তাই বলে, ওর জন্য আমি এতটা বিপদের ঝুঁকি নেব? অ্যাল আমতা আমতা করতে থাকে।

–এই জন্য যে ওকে আমরা সাহায্য করতে না পারলে ও অন্য কারো কাছে চলে যাবে। সে তোর মতো ভালো কাজ করতে পারবে না। আর যদি ও ধরা পড়ে যায়, তাহলে চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এবার সত্যি অ্যাল অবাক হল। সে বলল–লিটলচ্যাপ, মেয়েটাকে তুমি সত্যি ভালোবাসো।

-হ্যাঁ।

লিটলচ্যাপ কতটা ভালোবাসে, সেটা অ্যালকে বোঝানো মুশকিল। তবে ভালোবাসার থেকে বড় কথা হল, ট্রেসি ধরা পড়লে আবার তাকে জেলে যেতে হবে এবং এবার সে নিশ্চিতভাবে বিগবার্থার, খপ্পরে পড়বে। ব্যাপারটা লিটলচ্যাপের কাছে মোটই ভালো লাগবে না। ট্রেসিকে লিটলচ্যাপ আশ্রয় দিয়েছে, বিগবার্থার হাত থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে। বিপদের দিনে সত্যি সত্যি তার পাশে বান্ধবী হিসেবে দাঁড়াতে হবে। সে বলল অ্যাল, একাজটা তোমাকে করতেই হবে।

এটাই হল লিটলচ্যাপের একটা অদ্ভুত স্বভাব। আদরের আতিশয্যে মাঝে মধ্যে সে তার হবু স্বামীকে তুই-তুকারি করতে ভালোবাসে আবার কখনো তুমি বলে সম্মান দেয়।

অ্যাল বলল–এই কাজটা আমি একা করতে পারব না।

তার গলার স্বরে পরিবর্তন এসেছে। খুশী হয়েছে লিটলচ্যাপ। তার মানে অ্যাল গররাজী।

অ্যালকে একটু বেশী মাত্রায় আদর করতে শুরু করলো। সে বলল–আচ্ছা র‍্যালফ কয়েক দিনের জন্য ছাড়া পেয়েছে নাকি?

অতএব জুটি বেঁধে গেল। সন্ধ্যে সাড়ে ছটার মধ্যে অল আর র‍্যালফ চিলেকোঠার কাজ সেরে রান্নাঘরে আন্দ্রের কাছে গিয়ে হাজির হল।

–কাজ হয়ে গেছে?

–দারুণ ঝাটের কাজ ছিল, এখানে একটি এসি-ডিসি কনডেনসার আছে।

অ্যালের কথা শেষ হবার আগে আন্দ্রে ব্যস্ত হয়ে বলল–ওসব কথা পরে শুনব আগে বলল কাজটা হয়েছে কিনা?

–পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করবে ওই এয়ার কন্ডিশনার।

–আঃ বাঁচালে, কী বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব। আমি তো আমার মনিবের, কথা ভাবছিলাম, বিলটা রেখে যাও।

–বিল কোম্পানী পাঠাবে। অমায়িক ভাবে অ্যাল বলল।

–ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আন্দ্রে তাড়াতাড়ি রান্না সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেকানিক দুজন ব্যাগ দুটো নিয়ে ভ্যানে চড়েছে। গেটের বাইরে গাড়ি রেখে অ্যাল চুপটি করে বাগান পেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রের একটি তার খুলে রেখেছিল। সেটা আবার লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিন চালু হয়ে গেল।

কনডেনসারের সঙ্গে লাগানো কাগজে যে সার্ভিস টেলিফোনের নম্বর লেখা, সেটা ছোট্ট একটা কাগজে টুকে নিল। একটু পরে একটা টেলিফোন বুথ থেকে সে এক্সিমমা এয়ার কন্ডিশনিং কোম্পানীকে ফোন করে বলল–পেরী পোপের বাড়ি থেকে বলছি, ৪২, চার্লস স্ট্রিট, আমাদের এয়ার কন্ডিশন মেশিন ঠিকই আছে। লোক পাঠাবার আর দরকার নেই।

প্রতি শুক্রবার রাতে অ্যাটর্নি পেরী পোপের বাড়িতে তাসের একটা জমজমাট আড্ডা বসে। তবে এটা হল তাসের জুয়া, তিন পাত্তির তাস বলতে যা বোঝায়, তাই আর কী!

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওই দিনটির জন্য সাদরে অপেক্ষায় থাকেন। যাঁরা খেলতে আসেন তাদের মধ্যে সরকারের এক সেনেট সদস্যের কথা বলা উচিত। আসেন একজন আল্ডারম্যান, জজ হেনরি লরেন্সও এই খেলার এক সম্মানীয় অতিথি। এছাড়া অ্যান্টনি ওরসেত্তি ও জো রোমানোকে প্রায় প্রতি শুক্রবারই ওই আসরে দেখা যায়।

পেরী পোপের মনটা আজ ফুর্তিতে ভরপুর। বেডরুমে গিয়ে জামাকাপড় বদলাচ্ছে। সে। সাদা সিল্কের একটা প্যান্ট পড়ল। ম্যাচ করা সাদা জামা। এব্যাপার সে খুবই শৌখীন, কয়েকদিন ধরেই একের পরে এক মামলা জিতে চলেছে। অবশ্য জীবনযুদ্ধে তাকে আমরা এক জয়ী সম্রাট বলতে পারি।

নিউ অর্লিয়েন্সে যদি কেউ আইনের সাহায্য পেতে চায়, তা হলে তাকে অনিবার্যভাবে পেরী পোপের কাছে আসতে হবে। অবশ্য তার ক্ষমতার আড়ালে একটা গোপন শক্তির উৎস আছে। ওরসেত্তি পরিবারের সে খুব কাছের মানুষ। পেরী পোপকে সকলে জানে। এক করিতকর্মা মানুষ হিসাবে। খুন, চোরাচালান, নারী ধর্ষণ–যে কোনো অপরাধ হোক না কেন, পেরী সব কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এইভাবে ফুরফুরে শরৎ মেঘের মতো দিন কাটছে তার।

অ্যান্টনি ওরসেত্তি এল সঙ্গে এক গেস্টকে নিয়ে। সে বলল–জো রোমানো আসবে না। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ইন্সপেকটার নিউহাউসকে চেনেন?

নিউহাউস এসে সবার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল।

পেরী পোপ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল–সাইড বোর্ডে মদ আছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা না হয় পরেই হবে। একহাত হয়ে যাক।

সকলের জন্য আলাদা চেয়ার নির্দিষ্ট করা আছে। এই ব্যাপারে পেরী পোপকে কেউ। দোষ দিতে পারবে না। সবাই বসে পড়ল। জো রোমানো যে চেয়ারটায়, বসত, সেখানে বসল ওই ইন্সপেকটার।

–এবার থেকে ইন্সপেকটার, তুমি ওই চেয়ারটিতে বসবে।

ভারী গলাতে হুকুম করল ওরসেত্তি। তার হুকুমকে মান্য করতে হবে–এই আসরে সবাই তা জানে।

নতুন তাসের প্যাকেট বের করে শাল করা শুরু হল। পেরী পোপ, পোকার খেলার চাকতি বের করে ইন্সপেকটারকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল। কালো চাকতির দাম পাঁচ ডলার,

লাল দশ ডলার, নীল কুড়ি আর সাদা একশো ডলার। খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে পাঁচশো ||||||||| ডলারের চাকতি তুলে নিল।

পেরী আরো একবার বলল–বাজির টাকা টেবিলেই শোধ করতে হবে। তিনবার পর্যন্ত ডাক দেওয়া হবে। যে তাস দেবে, প্রথম তাস তারই হবে।

সব বুঝতে পেরেছে, এমন ভঙ্গি করে ইন্সপেকটার বলল ঠিক আছে, ভালোই বুঝতে পারছি।

ওরসেত্তির গলায় বিরক্তির ছাপ। সে চিৎকার করে বলল–এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনই শুরু করতে হবে।

জো রোমানোর কী হয়েছে তা জানবার জন্য পেরী পোপের মনটা ছটফট করছে। ওরসেত্তি মনে মনে চিন্তা করছে, আমি জো রোমানোকে ছেলের মতো ভালোবাসতাম। শেষ পর্যন্ত কুত্তার বাচ্চাটা পেছন থেকে আমাকেই ছুরি মারল। ভাগ্যিস সেই ফরাসী ঘুড়িটা ফোন করেছিল। তা না হলে পুরো টাকা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেত। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। বড্ড বেশী চালাকি করতে গেছে। কার সঙ্গে লেগেছে সেটা ভুলে গেছে। এমনই হয় বোধহয়। বেশী ওপরে উঠলে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

–মিস্টার ওরসেত্তি, কী হচ্ছে? আপনার মন কোথাও উড়ে গেছে মনে হচ্ছে?

কথাটা কানে আসতেই ওরসেত্তি জো রোমানোর চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল, এই টেবিলে বহু টাকার লেনদেন হয়। কেউ হারে, কেউ জেতে। এটা নেহাতই একটা খেলার আসর। কিন্তু ওরসেত্তি হারতে ভালোবাসে না। জীবনের সব খেলায় ও যেমন জয়কে করায়ত্ত করতে চায়, তাসের আসরেও একই ব্যাপার। গত ছ সপ্তাহ ধরে পেরী পোপ খালি জিতেই চলেছে। আজ ভাগ্যের চাকাটা অন্য দিকে ঘোরাতেই হবে।

খেলা শুরু হল। ওরসেত্তি ক্রমশ হারছে। মোটা অঙ্কের বাজি ধরেও হারের ওই ধারাবাহিকতাকে রুখতে পারল না। মাঝ রাতে আন্দ্রে খাবার টেবিল সাজিয়ে যখন

ডাকতে এল, ততক্ষণে ওরসেত্তি তিরিশ হাজার ডলার হেরে গেছে। বেশীর ভাগটা জিতেছে পেরী পোপ।

দারুণ রান্না। ভোজনরসিক হলেও ওরসেত্তির মন পড়ে আছে তাসের টেবিলে। সবার আগে কফির কাপটা হাতে নিয়ে ওরসেত্তি খেলার টেবিলে বসে পড়ল। দু-এক চুমুক দিয়েছে, হঠাৎ কাপে কী যেন পড়ল। চামচ দিয়ে তুলতে গিয়ে দেখল, ছাদের প্লাস্টারের টুকরো। ছাদের দিকে তাকাতেই কপালে আর এক টুকরো পড়ল। কান পেতে শুনতেই মনে হল, ওপরে কে বা কারা ফিসফিস করে কথা বলছে।

ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওরসেত্তি বলল–ওপরে কী হচ্ছে?

এতক্ষণ পেরী পোপ ইন্সপেকটার নিউহাউসকে একটা দারুণ মজার গল্প শোনাচ্ছিল। ওরসেত্তির কথাটা তার কানে গেল। সে বলল, কী বললেন ওরসেত্তি?

প্লাস্টার খসছে। আরো তাড়াতাড়ি।

সেনেটর বললেন, ইঁদুর মনে হচ্ছে।

পেরী পোপ রেগে গেল। বলল–ওসব বাড়িতে নেই।

ওরসেত্তি এবার গর্জন করে উঠল–ওপরে কিছু একটা আছে।

এবার একটা বড়ো টুকরো পড়ল টেবিলের ওপরে। আন্দ্রেকে বলছি দেখতে, পেরী পোপ বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ওরসেত্তি হ্যাঁ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বলল–বেশ বড় একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে।

পেরী পোপ খেলা শুরু করার কথা বলল। ওরসেত্তি রেগে গিয়ে বলল, তার আগে দেখে এসো সত্যি সত্যি ওপরে কী হচ্ছে।

বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে। বাকিরাও এগোতে থাকল।

–হয়তো কাঠবেড়াল তার খাবার জমিয়ে রেখেছে। পেরী পোপ ব্যাপারটাকে লঘু । করার চেষ্টা করে।

চিলেকোঠায় পৌঁছে আলো জ্বালাল পেরী পোপ। দুটি সাদা ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করছে। সেদিকে লক্ষ্য নেই ওরসেত্তির। ঘরের মাঝখানে একটা ক্যাম্পচেয়ার, স্যান্ডউইচ, বিয়ারের খোলা টিন, একটা বাইনোকুলার, ধুলো ভরা মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ওরসেত্তি। ছাদের সিলিং-এ একটা ফুটো। তার দিয়ে বন্ধ করা। টানতেই সেটা উঠে এল। ফুটো দিয়ে তাকাল ওরসেত্তি। সেখান থেকে তাস খেলার টেবিলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

তার মানে? দুই আর দুয়ে চার। তার মানে পেরী পোপ এইসব ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে।

পেরী পোপ তখনো চিৎকার করছে–এসব জিনিস এখানে কে এনে রেখেছে? আন্দ্রেকে মজা দেখাতে হবে।

ওরসেত্তি উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে পেরী পোপকে ফুটোটা দেখিয়ে বলল এসো, প্রিয় বন্ধু, তোমার কীর্তি নিজেই একবার দেখে যাও।

ওখানে গিয়ে তাকাতেই পেরী পোপের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। সে পাগলের মতো সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল–আপনারা আমাকে কি বিশ্বাসঘাতক ভাবছেন? বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের ঠকাতে পারি না।

উত্তেজনায় নিজের আঙুল কামড়ে ফেলল সে।

ওরসেত্তি তার পিঠ চাপড়ে রক্ত হিম করা কণ্ঠস্বরে কলল ঠিক আছে, এসব নিয়ে

তুমি ভেব না। চলো, আবার তাসের টেবিলে যাওয়া যাক।

.

১৪.

–তা হলে? দুখানা পড়ল। তাই না ট্রেসি?

আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপ খুশীতে উচ্ছল হয়ে বলল–বাজারে জোর গুজব, তোমার। উকিলবন্ধু পেরী পোপ আর প্র্যাকটিস করবে না। তার নাকি একটা বাজে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

রয়্যাল স্ট্রিটের একটা ছোট্ট কাফেতে বসে ট্রেসি আর লিটলচ্যাপ তখন কথাবার্তায় মেতে উঠেছে। হাসতে হাসতে লিটলচ্যাপ বলল–তোর বুদ্ধি দারুন, আমার সাথে ব্যবসা করবি?

মুখে নিস্পৃহভাব এনে ট্রেসি বলে–না, তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে।

–এরপর কে? নিজের আগ্রহ চেপে রাখতে পারল না আর্নেস্টাইন।

চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে ট্রেসি উচ্চারণ করেলরেন্স, জজ হেনরি লরেন্স!

.

হেনরি লরেন্সের ওকালতি শুরু হয়েছিল লুইসিনিয়ার লিসভিল শইরে। আইন খুব একটা ভালো বুঝতেন না। কিন্তু দুটি অসাধারণ গুণ ছিল তাঁর। দেখতে দারুণ আকর্ষক। চরিত্রের মধ্যে ছিল একধরনের নমনীয়তা। উকিলদের যেটা মস্ত বড়ো গুণ। অতি সহজেই তিনি সাফল্যের সহজ সরণীর সন্ধান পেয়ে যান। এক বিশেষ শ্রেণীর মক্কেলদের জন্য আইনের জগতে নাম করে ফেলেন। যে কোনো মামলা হাতে নিতেন। কীভাবে জুরী ভাঙতে হয় সেই মন্ত্রটা শিখে নিলেন। সাক্ষীদের অপদস্ত করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মামলায় যারা সাহায্য না করে তাদের কীভাবে ঘুষ দিয়ে কিনতে হয়, তাও জানতেন।

অ্যান্টনি ওরসেত্তি যে ধরনের মানুষ চাইছিলেন লরেন্স ছিলেন ঠিক তার আদর্শ। দুজনের মধ্যে অতি দ্রুত একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। লরেন্স ওরসেত্তি পরিবারের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। একসময় ওরসেত্তি তাঁকে জজের আসনে বসিয়ে ছিলো।

–এই জজটাকে কী করে গাঁথবে, ভেবে পাচ্ছি না। লোকটার টাকা পয়সা অঢেল, ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছে। ওর গায়ে হাত দেওয়া মুশকিল।

ট্রেসি বলল–ধনী আর ক্ষমতাবান, তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না।

ট্রেসি প্ল্যান ছকে ফেলেছিল কিন্তু জজ লরেন্সের চেম্বারের ফোন করার পর সে বুঝতে পারল : প্ল্যানটা পাল্টাতে হবে।

–আমি, একটু জজ লরেন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সেক্রেটারী শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল-দুঃখিত, জজ সাহেব এখানে নেই।

ট্রেসি জানতে চাইল–কখন ফিরবেন?

–ঠিক বলতে পারব না। একই রকম নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর।

–জরুরী দরকার ছিল। কাল সকালে পাওয়া যাবে কি?

–না, উনি শহরে নেই।

–কোথায় গেছেন জানতে পারলে ভালো হত।

–সেটা বোধহয় বলা সম্ভব নয়। জজ সাহেব দেশের বাইরে গেছেন।

ট্রেসি এমন ভাব দেখাল, যেন সে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে।

সে বলল–ও বুঝেছি, কিন্তু কোথায় গেছেন?

–জজ সাহেব ইউরোপে গেছেন। আন্তর্জাতিক আইন আলোচনা চক্রে যোগ দিতে।

–কী আশ্চর্য, এই খবরটা আমাদের জানা নেই।

–আপনি কে কথা বলছেন? সেক্রেটারী জানতে চাইল।

ট্রেসি দ্রুত চিন্তা করে বলল–আমি এলিজাবেথ রোয়ানে জাস্টিন, আমেরিকার মহিলা আইনজীবী সমিতির দক্ষিণ বিভাগের সভানেত্রী বলছি। এই মাসের কুড়ি তারিখে নিউ অর্লিয়েন্সে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় জজ হেনরি লরেন্সকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর। সে বলল–খুবই খুশীর খবর। কিন্তু ওই সময় তো উনি ফিরছেন না।

–সত্যি দুঃখের কথা। আমরা সকলে ওনার অসাধারণ বক্তৃতা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। জজ সাহেবকে সকলে একমত হয়ে নির্বাচিত করেছি।

–এই খবর শুনলে উনিও খুব দুঃখিত হবেন।

–আচ্ছা, ওনার লেখা বক্তৃতা কিছু জোগাড় করে দেওয়া যায়?

–ঠিক বলতে পারছি না। জজ সাহেবের প্রোগ্রাম একেবারে ঠাসা।

–আঃ, কী যে করা যায়, সমস্ত দেশের টেলিভিশনে এই উৎসবটা দেখানো হবে।

সেক্রেটারী একটু ইতস্তত করল। ও জানে, জজ সাহেব আত্মপ্রচারের ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন। এই যে উনি বিদেশে গেছেন, এসবই প্রচারের একটি অঙ্গ মাত্র।

–হয়তো উনি দু-এক লাইনের বাণী লিখে দিতে পারেন। আমি তাকে বলে রাখব। বিষয়টা কী হবে?

ট্রেসি খুশীতে লাফিয়ে উঠে বলল–বাঁচালেন, বিষয়টা আমরাই ওনাকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

সেক্রেটারী আবার দ্বিধার মধ্যে পড়ল। জজ সাহেবের ভ্রমণসূচী গোপন রাখতে হবে। ঠিকানাটা দেওয়া ঠিক হবে কি? আবার সম্মানটাও সে হাতছাড়া করতে চাইছে না। অবশেষে সে বলল, ঠিকানা দিতে আমাকে নিষেধ করে গেছেন। তবে এক্ষেত্রে না দিয়ে

পারছি না। জজ সাহেব এখন মস্কোর ব্রেসিয়া হোটেলে আছেন। ওখানে পাঁচদিন থাকবেন। তারপর...

তারপর জজ সাহেব জাহান্নামে যাক, আমার দরকার নেই জানতে, ট্রেসি মনে মনে বলল। মুখে বলল–অশেষ ধন্যবাদ। আমরা এখনই যোগাযোগ করছি।

মস্কোর রোসিয়া হোটেলের ঠিকানায় জজ হেনরি লরেন্সের নামে তিনটি পরপর কেবল গেল।

প্রথমটাতে লেখা আছে–বিচার সংক্রান্ত পরিষদের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে এবার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন, আপনি আমাদের করতে বলেছেন, বরিস।

দ্বিতীয় কেবলটা পৌঁছল পরের দিন। ভ্রমণসূচীর সমস্যার ব্যাপারে কী করতে হবে তা জানান। আপনার বোনের প্লেন পৌঁছেছে, নিরাপদে অবতরণ করেছে। পাশপোর্ট, টাকাপয়সা হারিয়ে গেছে। তাকে এক প্রথম শ্রেণীর সুইস হোটেলে রাখা হয়েছে। পরে ব্যাঙ্ক মারফত হিসাব করতে হবে।

শেষ কেবলটা লেখা আছে–সাময়িক পাশাপোর্ট পাবার চেষ্টা আপনার বোন করে ফেলেছেন। নতুন ভিসার খবর এখনো পাওয়া যায়নি। সুইজারল্যান্ডের তৈরী নতুন জিনিসগুলোকে রাশিয়ান বলে মনে হচ্ছে। জাহাজে করে বোনকে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠাচ্ছি, পৌঁছোলে আমাদের খবর দেবেন। বরিস।

সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ গুপ্তচর সংস্থা কেবলগুলো চেপে বসে রইল। আরো কেবল আসছে কিনা দেখতে হবে। আর যখন এলো না, তখন তারা জজ লরেন্সকে গ্রেপ্তার করল।

দশ দিন দশরাত ধরে জেরা করা হল।

–খবরটা আপনি কাকে পাঠিয়ে ছিলেন?

জজ লরেন্স আকাশ থেকে পড়লেন। কোন্ খবর? আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারছি না।

–আমরা নকসাটির কথা বলছি। কার কাছ থেকে আপনি নকসাটি পেয়েছেন?

–কোন নকসা?

–সোভিয়েত আনবিক শক্তি চালিত ডুবো জাহাজের নকসা।

–নিশ্চয়ই আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে খবর আমি কী করে জানব?

–সেটাই তো আমরা খুঁজে বের করব। কার সঙ্গে আপনার গোপন মিটিং হবে?

–কীসের গোপন মিটিং। গোপন করার কী থাকতে পারে?

–তাহলে এই বরিস কে?

–বরিস? সে কে?

–যে আপনার নামে সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়েছে।

–সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট? কী যা-তা বলছেন।

ওরা এবার রক্তকঠিন কণ্ঠস্বরে জজ সাহেবকে জরিপ করতে করতে বলল–আপনি বোকামি করছেন। এমন শিক্ষা আপনাকে দেব যে, মার্কিন গুপ্তচররা বুঝবে, আমরা কত শক্তিশালী।

অতি কষ্টে মস্কোর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জজ লরেন্সের দেখা হল। একদিনে সাতকেজি ওজন কমে গেছে তাঁর। রাষ্ট্রদূত ওনার পরিচয় পেয়ে ছুটলেন পলিটব্যুরোর একজন সদস্যের কাছে। বললেন–জজ লরেন্স গুপ্তচর হতে পারেন না। আমি এ গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

পলিটব্যুরোর সদস্য শান্ত গলায় বললেন–এবার এগুলো দেখুন দয়া করে। তিনটি কেবল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হাতে তুলে দেওয়া হল। তিনটি কেবল পড়ার পর রাষ্ট্রদূত বললেন–এর মধ্যে বেআইনী কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?

–তাই নাকি? ভালো করে পড়ুন। বুঝতে পারছেন না। প্রতিটি কেবলের চতুর্থ শব্দটি পড়তে হবে।

সত্যিই তো, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আদালতে সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিক ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামী শেষ পর্যন্ত নিজের দোষ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি গুপ্তচুর হিসাবে রাশিয়ায় এসেছেন, একথা মানতে চাইলেন না, সরকার পক্ষ বারবার লরেন্সকে বলছিলেন, দোষ স্বীকারের জন্য। এইধরনের একটা কনফেসন দিলে শাস্তির মেয়াদ কম হবে। লরেন্স বলতে পারেন নি।

বিচারের পরের দিন পত্রিকায় একটা ছোটো খবর বেরল। জজ হেনরি লরেন্স আমেরিকার গুপ্তচর। তাঁকে চোদ্দো বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।

এই খবর পেয়ে আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ মাথায় হাত দিয়ে বসল। সি. আই. এ বলল, ও নিশ্চয়ই ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের লোক।

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বলল–জজ লরেন্স আমাদের লোক নয়। মনে হয় এফ. বি. আই আমাদের জড়াতে চাইছে।

মোট কথা সব দপ্তরের, বক্তব্য, জজ হেনরি লরেন্স অন্য দপ্তরের হয়ে কাজ করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সি. আই. এর প্রধান বললেন–ওনার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। এত হেনস্তার মধ্যেও উনি কারো নাম ফাস করেন নি। বিচারপতি হয়েও উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য আর ভালোবাসা দেখিয়েছেন। তার জন্য ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা করব।

.

অ্যান্টনি ওরসেত্তির জীবনের চাকা এবার বোধ হয় ঘুরত শুরু করেছে। পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ তাকে বারবার গ্রহণ করতে হচ্ছে। জো রোমানোর বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে যে নাটক শুরু হয়েছিল, তার শেষ অঙ্ক কবে আসবে?

পেরী পোপ আর জজ লরেন্সকে হারাতে হল। এরা সবাই ছিল ওরসেত্তির ভরসা।

জো রোমানোর জায়গায় উপযুক্ত তোক পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারে জোর গুজব, অ্যান্টনি ওরসেত্তি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, নিজের লোকদের আর হাতের মুঠোয় রাখতে পারছে না। এবার বোধহয় পতনের প্রহর শুরু হল।

বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো নিউজার্সি থেকে একটা টেলিফোন এল।

–খবর পেলাম, আপনি নাকি একটু অসুবিধায় পড়েছেন? আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আপনি সাহায্য নেবেন কি?

–হ্যাঁ, অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেছে।

ওপাশে একটু চাপা হাসি–আমাদের কাছে খবর আছে স্যার, সবকটা সমস্যার সমাধান। হয়নি। আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা দেখে নিচ্ছি।

ওরসেত্তির পৌরুষে আঘাত লেগেছে–এটা আমার শহরে, যা করার আমিই করব।

–মিস্টার ওরসেত্তি, আপনার শহরে আমরা নাক গলাচ্ছি, তেমন কিছু ভাববেন না। আমরা সামান্য কয়েক জন লোক পাঠাচ্ছি। যারা সব সিধে করে দেবে। পুরোনো বন্ধুকে এভাবে আমরা সাহায্য করব।

এই কথা শুনে ওরসেত্তির শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। সামান্য কয়েক জন লোক দেখতে দেখতে অসামান্য হয়ে উঠবে? ওরসেত্তি তা সহ্য করবে সেটা কী করে হবে?

.

লিটলচ্যাপ রান্না করছিল। ট্রেসিকে নেমতন্ন করেছে। অ্যাল কখন ফিরবে, তারই অপেক্ষাতে সে বসে আছে।

বাইরে প্রচণ্ড গরম, অ্যাল ফিরল।

–কোথায় গিয়েছিলে? রান্না শেষ হয়ে গেছে?

এই বকুনিটা অ্যাল গায়ে মাখল না। এক মুখ হেসে ট্রেসিকে লক্ষ্য করে বলল–তোমার প্ল্যান কাজ করেছে। নিউজার্সি থেকে লোক আসছে নিউ অর্লিয়েন্সের দখল নিতে। ওরসেত্তির অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। তুমি খুশী হয়েছে তো?

এই শব্দটা ট্রেসির কাছে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত। খুশী হবার মতো মানসিক অবস্থা সে অনেক বছর আগেই হারিয়ে ফেলেছে। মা এবং তার ওপর যে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে, তার শেষ না দেখে ট্রেসি খুশী হতে পারবে না।

পরদিন সকালে একটা ফুলের দোকানে গিয়ে ট্রেসি বলল–সাদা রিয়ন জড়ানো একটা ফুলের রিফ তৈরী করে অ্যান্টনি ওরসেত্তিকে পাঠাতে হবে।

এই রিফগুলি পাঠানো হয় মৃত ব্যক্তির কফিনের জন্য। কার্ডে ট্রেসি লিখল শান্তিতে থাকুন–ডরিস হুইটনির মেয়ের কাছ থেকে।

.

১৫.

ফিলাডেলফিয়া,

মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, বিকেল ৪ টে।

একে একে চারজনকে খতম তালিকায় তোলা গেছে। পঞ্চম নামটি কার? অবশ্যই চার্লস স্ট্যানহোপ তৃতীয়র পালা। বাকিরা ছিল তার অপরিচিত। কিন্তু চার্লস তার প্রেমিক এবং চার্লসের সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ করেছিল। কিন্তু চার্লস দরকারে সাহায্য করেনি।

আর্নেস্টাইন আর অ্যাল এসেছে নিউ অর্লিয়েন্স এয়ারপোর্টে। ট্রেসিকে বিদায় জানাতে হবে।

আর্নেস্টাইন বলল–এই শহরটাকে তুমি পাগলা করে ছেড়ে দিয়েছে। চাইলে এখানকার মেয়র পর্যন্ত হতে পারতে।

অ্যাল জিজ্ঞাসা করল–ফিলাডেলে তুমি কেন যাচ্ছো?

ট্রেসি কিন্তু সব কথা খুলে বলেনি-ব্যঙ্কের পুরোনো চাকরিটা ফিরে পাবার চেষ্টা করব।

–ওরা কি জানে তুমি ফিরছো?

–না, তবে ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে খুবই পছন্দ করেন। আমার মতো দক্ষ কমপিউটার অপারেটর সহজে পাওয়া যায় না।

–ভালো, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, আর নতুন করে কোনো ঝাটে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না।

আর্নেস্টাইন পরম মমতায় ট্রেসিকে আদর করল।

ফিলাডেলফিয়াতে পৌঁছে হিলটন হোটেলে উঠল ট্রেসি। পরের দিন সকাল এগারোটায় ব্যাঙ্কে গিয়ে ক্লারেন্স ডেসমন্ডের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করল। ট্রেসিকে দেখে সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

ট্রেসি বলল–মিস্টার ডেসমন্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিস্টার ডেসমন্ড টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

–হ্যালো মিস্টার ডেসমন্ড, আমি ফিরে এসেছি।

–কিন্তু কেন? কী চাই?

সঙ্গত কারণেই তার কণ্ঠস্বর থেকে রুক্ষতা ঝরে পড়ছে।

ট্রেসি সামান্য হেসে বলল–চাকরিটা আবার ফিরে পেতে চাই।

–মিস হুইটনি, সেটা কী করে সম্ভব? আপনার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ ছিল। জেল খাটার পরেও আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কে আপনি চাকরি পাবেন কী করে?

ট্রেসি হতভম্ব হয়ে গেল। এই মানুষটি কিছুদিন আগে বলেছিল–তোমাকে আমরা হারাতে চাই না। বিয়ের পরেও তুমি এখানে চাকরি করবে।

–আর কিছু বলার আছে মিস হুইটনি? তার অর্থ এবার তুমি বিদায় হও।

লজ্জায় মাথা নীচু করে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল ট্রেসি। মনে মনে শপথ নিল এর উত্তর দিতে হবে।

সারাটা দিন হোটেলে, কাটাল সে। এখানে তার থাকা উচিত নয়। তার কাছে নিউইয়র্ক নিরাপদ জায়গা সেখানে কেউ তাকে চিনবে না।

সন্ধ্যেবেলা এল কাফে রয়্যালে। সেখানকার অসাধারণ পরিবেশ হয়তো তার মনটাকে ভালো করে দেবে। একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল। ভদকা মদ কিনে দেবার জন্য বেয়ারাকে অর্ডার দিল।

একটা চুমুক দেবার পর মনটা বেশ প্রসন্ন হল তার। এপাশ ওপাশ তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চমকে উঠল সে। নিজের চোখ দুটিকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারছে না। উল্টোদিকে বেশ খানিকটা দূরে ঘেরা জায়গায়তে চার্লস তার স্ত্রীকে নিয়ে খাচ্ছে। প্রথমেই তার মনে হল, এখান থেকে উঠে চলে যাবে। চার্লসের মুখোমুখি দাঁড়ানো এখন উচিত নয়। তাহলে পরিকল্পনাটা হয়তো ভেস্তে যাবে।

চার্লস তাকে দেখতে পায়নি। তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রেসি ওদের দেখতে লাগল। কিন্তু এই চার্লসের সঙ্গে আগের চার্লসের অনেক তফাত। মনে হচ্ছে চার্লসের জীবনের ওপর কী যেন ঝড় বয়ে গেছে। অকালে বুড়ো হয়ে যাওয়া চার্লস, সামনের দিকে চুলে টাক পড়তে শুরু করেছে। কোথায় গেল তার প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সজীব চেহারা? এ বোধহয় চার্লসের মৃতদেহ। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার ছাপ।

এই মানুষটির সাথে নিজেকে জড়াতে চেয়েছিল ট্রেসি। এবার ট্রেসি চার্লসের স্ত্রীকে দেখতে লাগল। তার মুখেও কে যেন বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না। বসে বসে খাচ্ছে, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

ট্রেসি বুঝতে পারল, দুজনকে সারা জীবন কাটাতে হবে এমন এক পরিবেশের মধ্যে যেখানে সুখ শান্তি আনন্দ কোনো কিছু নেই। এমন একটা জগতের বাসিন্দা হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? হয়তো এটাই চার্লসের শাস্তি। এই কথাটা মনে হতে ট্রেসির বুক অনেকটা হালকা হয়ে গেল। চার্লসকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত যে পাষাণ ভারটা তার মাথার ওপর চেপে বসেছিল, সেটা নেমে গেল।

ট্রেসি বেয়ারাকে ডেকে খাবার দিতে বলল। অতীতের সব ঋণ সে শোধ করে ফেলেছে। এখন সে মুক্ত আর স্বাধীন।

রাতে হোটেলে ফিরে ট্রেসির হঠাৎ মনে হল, ব্যাঙ্ক কর্মীদের তহবিল থেকে তার কিছু পাওনা আছে। মোটামুটি হিসাব করে দেখল এক হাজার তিনশো পঁচাত্তর ডলার পাঁয়ষট্টি সেন্ট। ক্লারেন্স ডেসমন্ডকে চিঠি লিখল ওই টাকাটা তাকে অবিলম্বে দিতে হবে।

দু-দিন বাদে সেক্রেটারীর কাছ থেকে উত্তর এল—

প্রিয় মিস হুইটনি,

আপনার চিঠির উত্তরে মিস্টার ডেসমন্ড আপনাকে জানাতে বলেছিল যে, নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত থাকায় আপনার প্রাপ্য টাকা সাধারণ তহবিলে জমা পড়ে গেছে। ওটা আর আপনাকে দেওয়া যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে কোনো খারাপ চিন্তা করেন না মিস্টার ডেসমন্ড।

আপনার বিশ্বস্ত

মে ট্রেনটন

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি

তাহলে? ট্রেসি এখন কী করবে? না, পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে নিতেই হবে।

পরের দিন ট্রেসিকে দেখা গেল ফিলাডেলফিয়া অ্যান্ড ফাইডেলিটি ব্যাঙ্কের অতি পরিচিত দরজায়। লম্বা কালো রঙের পরচুল পরেছে সে। চড়া মেক-আপ নিয়েছে। চিবুকে টাটকা কাটা দাগ। ছদ্মবেশ ধারণ করা সত্ত্বেও ট্রেসির মনে হচ্ছিল বোধহয় ব্যাঙ্কের লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে। এই ব্যাঙ্কেই পাঁচ-পাঁচটা বছর চাকরি করেছে সে। সবাই তার পরিচিত। কিন্তু এমন ভান করতে হবে, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে।

হাতব্যাগ খুলে একটি ছিপি জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল সে। একটা কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারে জন ক্রেগটন বসেছিল। রক্ষণশীল মনের মানুষ।

–কী চাই?

–কিছু না সেনর, একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। ট্রেসি ইচ্ছে করেই মেক্সিকান ভাষায় কথা বলছিল।

–নাম কী?

–রিটা গঞ্জালেস।

–কত টাকা জমা রাখবেন?

–দশ ডলার।

হাতে চোট আছে, এই অজুহাত দেখিয়ে ট্রেসি ক্রেগটনকে দিয়ে ফর্মটা ভরাল। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল।

কমপিউটার যন্ত্রের নাগাল পাবার অনেক বেআইনি পন্থা আছে। ট্রেসি এ ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট। ফিলাডেলফিয়া ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের কমপিউটার সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যাবস্থাটি তার নিজের হাতে তৈরী করা। এবার সে প্রথম সুযোগ নেবে।

প্রথমেই সে ব্যাঙ্কের কাছাকাছি একটা কমপিউটার বিক্রির দোকানের খোঁজ করল। দোকানটা পেয়েও গেল। দোকানটা বেশ ফাঁকা ছিল।

ওকে দেখে এগিয়ে এল একজন কর্মচারী।

–বলুন কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

ট্রেসি মেক্সিকান ভাষা মিশিয়ে উত্তর দিল–না-না, আমি এমনি দেখতে এসেছি।

দোকানের অন্য কোণে কয়েকটা ছেলে কমপিউটার গেমস খেলছিল। কর্মচারী সেই দিকে চলে গেল।

ট্রেসি একটি কমপিউটার যন্ত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার সঙ্গে একটা টেলিফোন লাগানো ছিল। সেখান থেকে ব্যাঙ্কের কমপিউটার যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, কিন্তু ব্যাঙ্কের কমপিউটারে একটা কোড নম্বর থাকে। সেটা প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যায়। সেই কোডনম্বরগুলো ট্রেসিই ঠিক করে দিয়েছিল কোড নম্বরগুলো ঠিক করা হত চারটি ঋতু, বছর আর সেই দিনের তারিখ দিয়ে।

মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রেসি ব্যাঙ্কের নম্বরটা ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল–আপনার কোড নম্বরটি প্লীজ।

আজ ৫ তারিখ, ঋতুটি শরৎ, তাই ট্রেসি জানাল কমপিউটার মারফত–শরৎ-১০।

নম্বরটা মিলছে না কেন? কমপিউটারের পর্দা সাদা হয়ে গেল। তা হলে কি ব্যাঙ্ক

নম্বর পঞ্চমলছে না কেন? কমষ্টি ট্রেসি জানাল কমপি

একটা কর্মচারী আসছে দেখে ট্রেসি অন্যদিকে সরে গেল।

সেই কর্মচারীটি ট্রেসিকে আপাদমস্তক দেখল। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে এক বয়স্ক অভিজাত মক্কেল ঢুকলেন। ট্রেসি নিশ্চিন্ত মনে যন্ত্রটার কাছে চলে এল। মিস্টার ডেসমন্ডের চিন্তাধারার সঙ্গে ট্রেসি পরিচিত, হয়তো উনি নম্বর পাল্টে ফেলেছেন। আবার চেষ্টা করা যাক–শীত-১০। পর্দা এবারও সাদা। শেষ চেষ্টা করল-বসন্ত-১০। পর্দা ডাকল, আগে বলুন। ট্রেসির মন আনন্দের নেচে উঠেছে। তাহলে মিলেছে।

ট্রেসি জানাল, টাকা জমা রাখতে চাই। কমিপিউটারের নির্দেশ অনুযায়ী, কত: টাকা, কোথা থেকে কার নামে জমা হবে সব জানিয়ে দিল ট্রেসি। টাকার অঙ্কটা বলার সময় তার বিবেক অন্যভাবে কাজ করল। সে চাইলে কয়েক হাজার ডলার জমা দিয়ে দিতে পারত, কিন্তু দিল না। যে টাকাটা তার পাওনা ছিল, সেটাই জানিয়ে দিল। রিটা গঞ্জালেসের খাতায় ১৩৭৫ ডলার ৬৫ সেন্ট জমা পড়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রেসি ব্যাঙ্কে ফোন করে অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে বলল–রিটা গঞ্জালেসের জমা টাকাটা ফার্স্ট হ্যাঁনোভার ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্কে যেন ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়।

এক ঘন্টা পরে প্লেন ধরে ট্রেসি চলে এল নিউইয়র্কে, পরের দিন সকালে দশটায় ব্যাঙ্ক খুলতেই ট্রেসি রিটা গঞ্জালেসের নামে জমা পড়া টাকাটা নগদে তুলে নিল।

জেল থেকে ছাড়া পাবার সময়, দুশো ডলার পেয়েছিল। অ্যামিকে দেখাশোনা করার জন্য আরো কিছু পেয়েছিল। কিন্তু কিছু একটা তাকে তো করতেই হবে। চাকরি না করলে খাবে কী?

একটা কম দামী হোটেলে উঠল? তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে একটার পর একটা ব্যাঙ্কে দরখাস্ত করল। কিন্তু দেখা গেল, সব ব্যাঙ্কই তার অতীত ইতিহাস জানে। ফলে কোথাও চাকরি হল না।

আরো অনেক জায়গাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল ট্রেসি। শেষে বাধ্য হয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখে সেলসগার্লের চাকরির দরখাস্ত করল। চাকরিটা হয়ে গেল। এবার দোকানে ঢুকতে

যাবে, হঠাৎ মালিক বলল–আরে, তোমাকে আমি টেলিভিশনে দেখেছি। জেলখানাতে একটা বাচ্চাকে বাঁচিয়েছিলে। কী তাই তো?

ট্রেসি কি আর সেখানে থাকতে পারে?

পরে অন্য একটা দোকানে চাকরি হল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে একজন খদ্দের তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করতে শুরু করল–জেলখাটা আসামীর কাছ থেকে জিনিস কিনব না।

সঙ্গে সঙ্গে এই চাকরিটাও গেল ট্রেসির।

না, এভাবে কিছু করা যাবে না। যাদের বিরুদ্ধে সে প্রতিশোধ নিয়েছে, তারা মরেও তাকে রেহাই দেয়নি। কোন পথ সে নেবে ভেবে পাচ্ছে না। সেই রাতে টাকার ব্যাগটা তন্নতন্ন করে খুঁজল, কত টাকা আছে দেখে নিতে হবে। হঠাৎ এক কোণ থেকে বেটি ফ্রাঙ্গিসকাসের দেওয়া কাগজের টুকরোটা বেরোল–কোনরাড মরগান জুয়েলার, ৬৪ ফিফথ এভিনিউ, নিউইয়ক। বেটি বলেছিল, জেলখাটা কয়েদিদের সংশোধনে লোকটা সাহায্য করে।

কোনরাড মরগানের দোকানটা সুন্দর করে সাজানো। বাইরে বন্দুকধারী পাহারা। রিসেপসনিস্টকে বলে ট্রেসি দেখা করতে গিয়ে শুনল, কোনরাডের সঙ্গে সন্ধ্যে ছটায় দেখা হবে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

সন্ধ্যা ছটার সময় ফিরে এসে দেখল, দোকান বন্ধ এবং পাহারাদার চলে গেছে। কী ভেবে সে দরজায় টোকা দিল। টাক মাথা হাসি খুশী মুখের একটি মানুষ বলল–ভেতরে আসুন।

দারুণ সাজানো অফিস ঘরে ট্রেসি ঢুকে পড়ল। লোকটা বলল–কী খাবেন বলুন? হুইসকি কনিয়াক, নাকি শেরী?

ট্রেসি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কীভাবে কোনরাডকে সব কিছু বলবে?

শেষ পর্যন্ত সে বলল–বেটি ফ্রান্সিসকাস আমাকে বলেছিল, অসুবিধাতে পড়লে আপনার সঙ্গে দেখা করতে?

–বেচারী বেটি, ওর ভাগ্যটা ভালো ছিল না।

–ভাগ্য!

–হ্যাঁ, ধরা পড়ে গেল।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–ব্যাপারটা খুবই সামান্য মিস হুইটনি, বেটি আমার কাছে কাজ করত। নিউ অর্লিয়েন্সের এক ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে নিজে থেকেই কাজ করতে শুরু করল এবং ধরা পড়ে গেল।

ট্রেসি তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি–ও কি আপনার কাছে সেলসগার্লের কাজ করত?

কোনরাড মরগান হো-হহা করে হেসে উঠল–না-না, বেটি তোমায় কিছু বলেনি? আমার একটা সাইড বিজনেস আছে। যারা আমার সঙ্গে কাজ করে তাদের আমি ভালো অংশ দিই। তোমাদের মতো লোককে কাজ দিতে পারলে আমি খুব খুশী হব। কিছু মনে । করো না, তোমার অতীত ইতিহাস তো খুব একটা ভালো নয়। কোনো ভদ্র-সংস্থায় তমার চাকরি হবে না। তুমি জেলখাটা আসামী, এই ছাপটা তোমার গায়ে পড়ে গেছে।

ট্রেসি তখনো অবস্থাটা বুঝতে পারছে না।

–আমার বেশ কিছু ধনী মক্কেল আছে। তারা বন্ধুর মতো সব গোপন কথা আমাকে বলে। তারা মাঝে মধ্যে গয়না গাটি বাড়িতে রেখে বেড়াতে যায়। গয়না কোথায় রাখবে, কী ভাবে রাখবে, সব কিছু আমার নির্দেশেই হয়।

মরগানের কথার মধ্যে ট্রেসি উঠে দাঁড়াল-অশেষ ধন্যবাদ মিস্টার মরগান।

তার এই আচরণে মরগান অবাক হয়ে গেল–তুমি কি চলে যাচ্ছো?

হাঁ, আপনার কথার মানে আমি বুঝতে পেরেছি। জেনে রাখুন আমি চোর-জোচ্চর নই? আমি এখানে চাকরি খুঁজতে এসেছিলাম।

এবার মিস্টার মরগানের ঠোঁটে অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। তাইতো দিচ্ছি তোমাকে। কাজ মাত্র দুতিন ঘন্টার, টাকা দেব পঁচিশ হাজার ডলার। কোনো ট্যাক্স লাগবে না।

ট্রেসির রক্ত মাথায় চড়ে গেছে। ঠাস করে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে হল। কোনোরকমে রাগ চেপে দরজার দিকে পা বাড়াল। মরগানের মুখের ভাব তখন পাল্টে গেছে কিন্তু শুনে রাখো মিস হুইটনি, আমার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তা হলে তোমাকে আমি ছেড়ে : দেব না।

–সেই কথাটা দিয়ে যাচ্ছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

–আর একটা কথা, যদি কখনো দরকার হয়, আমার কাছে আসতে দ্বিধা করো না কিন্তু।

ট্রেসি হোটেলে ফিরে গেল। কিছু কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়ে ভাবতে বসল। জেলে ছিল বলেই কি ও আর পাঁচজন সাধারণ অপরাধীর মতো? কিন্তু কে ওকে চাকরি দেবে? ভাল একটা সস্তার হোটেলে চলে যাব। নতুন করে চাকরি খুঁজবো।

পরের দিন লোয়ার ইস্ট সাইডের চারতলার একটি ছোট্ট ঘরে উঠে এল ট্রেসি। কথাবার্তায় বুঝতে পারল, এখানে যারা থাকে, তাদের বেশীর ভাগই বেশ্যা অথবা ব্যাগ ছিনতাইকারী।

পথে বেরোতেই কজন সরাসরি তাকে চোখ ইশারা করল। না, এখানে থাকা চলবে না।

কাছেই একটা অফিস ছিল, যারা চাকরি জোগাড় করে দেয়। মিসেস মারফি নামে এক মহিলা এই অফিসটি চালান। ট্রেসির কাগজপত্র দেখে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, জেলখাটা আসামীকে কেউ কমপিউটারে চাকরি দেবে না।

-কিন্তু আমার যে একটা চাকরি চাই।

–ঠিক আছে, জ্যাকসন হোল নামে একটা ছোট্ট হোটেল আছে, সেখানে ওয়েট্রেসের পদ খালি আছে। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

উপায় নেই, কম বয়সে শখ করে এমন অনেক কাজ করেছিল ট্রেসি। দেখাই যাক না কী হয়?

জ্যাকসন হোল ছোট্ট একটি হোটেল। খাবারটা ভালো, কিন্তু খদ্দেররা নীচু ক্লাসের। প্রথম দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ট্রেসি। আনন্দ একটাই যে, শেষ পর্যন্ত সে চাকরি করছে।

পরদিন ঘটে গেল দুর্ঘটনা। একটা মাতাল খদ্দের তার স্কার্ট ধরে টান মারল। ট্রেসির হাতের চিলি সসের বোতলটা উল্টে পড়ল ওই খদ্দেরের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা গেল তার।

মিসেস মারফির চেষ্টায় অনেক কষ্টে একটা হোটেলে গেল ট্রেসি। এটা মোটামুটি ভালো। এখানে ভালো ভালো খদ্দেররা আসেন এবং রাতে থাকেন। ওর কাজ হল সহকারী হাউসকিপারের। হোটেলে খদ্দেরদের ঘরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা। মাইনেটাও খুব একটা খারাপ নয়।

দেখতে দেখতে সাতটি দিন কেটে গেল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ট্রেসিকে ডেকে পাঠলেন তার ঘরে।

–৮২৭ নম্বর ঘরে কাজ করতে গিয়েছিলে? ওই ঘরে হলিউডের এক অভিনেত্রী থাকেন। তার নাম জেনিফার মার্লো। ট্রেসি জবাব দিল, হ্যাঁ।

–কখন?

–দুপুর দুটোর সময়।

–কেন কিছু হয়েছে?

–হ্যাঁ, তিনটের সময় মিস মালো ঘরে ফিরে দেখেন, তার একটা হীরের আংটি পাওয়া যাচ্ছে না।

এই কথা শুনে ট্রেসির সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য ট্রেসির মনে হল, কে বুঝি তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করে দিয়েছে। জেলখানার অন্ধকার মুহূর্তগুলির কথা আবার তার মনে পড়ে গেল।

ম্যানেজার জানতে চাইলেন–তুমি কি ওনার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে?

সত্যি কথা বলার বদভ্যাস আছে ট্রেসির।–হ্যাঁ, সব ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য ঢুকেছিলাম।

–শোবার ঘরে হীরের আংটিটা দেখেছিলে?

–মনে হচ্ছে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিৎকার করে বললেন–মনে হচ্ছে মানে? একটু দাঁড়াও পুলিশ আসছে।

একজন গার্ড ট্রেসিকে অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ট্রেসি দ্রুত চিন্তা করতে থাকল, পুলিশ এলে আবার জেলে ঢুকতে হবে তাকে। শত্রুরা বারবার জিতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। ভাগ্যের হতে নিজেকে সমর্পণ করে দিল সে।

মিনিট কুড়ি বাদে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এলেন–এই যে খবর ভালো, মিস মার্লো তাঁর আংটিটা ঘরেই পেয়েছেন। সামান্য ভুল আর কী।

ট্রেসি হোটেল থেকে বেরিয়ে পা বাড়াল কোনরাড মরগানের জুয়েলারী দোকানের দিকে।

কোনরাড তাকে দেখে এতটুকু অবাক হয়নি। বুদ্ধিমান মানুষ সে। এই সব জেলখাটা কয়েদিদের নিয়ে কাজ কারবার করে থাকে। সে জানে, এই লোকগুলোকে বারবার তার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

অফিস ঘরে বসে সে বলল–আমার এক খদ্দের লুই বেলামি ইওরোপ বেড়াতে গেছেন। ওই মহিলা লং আইল্যান্ডে সী ক্লিকে থাকেন। শনি রবিবার বাড়ির চাকররা থাকে না। নিজস্ব একটা পাহারাদারী গাড়ি আছে। চার ঘন্টা অন্তর টহল দিয়ে যায়। বাড়ির ভেতর ঢুকতে আর বেরোতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে।

একটু থামল কোনরাড। ট্রেসির দিকে তাকাল। ট্রেসি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব কথা শুনছিল।

–অ্যালার্ম ঘন্টার ব্যাবস্থা আমার জানা আছে। লোহার সিন্দুকের তালা খোলার নম্বরটাও আমি জানি। তোমার কাজ বাড়ির মধ্যে ঢুকে গয়নাগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসা। বাকি ঝামেলা আমি সামলাব।

–কাজটা যদি এত সহজ হয়, তাহলে আপনি নিজে করছেন না কেন?

–এই ধরনের কোনো ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি ব্যবসার খাতিরে শহরের বাইরে থাকি। আশা করি এর আসল অর্থটা তুমি বুঝতে পারছে।

–বুঝেছি।

–মিসেস বেলামির গয়না চুরি করতে যদি বিবেকে বাঁধে, তা হলে তার সম্পর্কে কিছু গোপন খবর জেনে রাখো। মহিলা খুব একটা ভালো চরিত্রের নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে তার অনেকগুলি বাড়ি আছে। সমস্ত বাড়িতে এই ধরনের গয়না আছে। তাছাড়া গয়নাগুলো বীমা করা, এতে মহিলার কোনো লোকসান হয় না।

ট্রেসি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। সে ভাবতেই পারছে না, এখানে বসে বসে সে গয়না চুরি করার প্ল্যান আঁটছে।

–আমি আর জেলে যেতে চাই না মিস্টার মরগান।

–কোনো বিপদ নেই এতে, আমার সঙ্গে কাজ করলে কোনো দিন কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না। হয়নিও আগে? এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একশো ভাগ নিরাপত্তা দিতে পারি। ট্রেসির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনি পঁচিশ হাজার ডলারের কথা বলছিলেন না?

–মাল হাতে পেলেই নগদ পাবে।

এতগুলো টাকা হাতে পেলে ট্রেসিকে আর ওই নরকে থাকতে হবে না। চাকরির জন্য দোরে দোরে ভিক্ষা করতে হবে না। তবু শেষ পর্যন্ত সে বিবেকের দংশনে দংশিত হচ্ছিল। দোনামোনা করছিল।

–আমি বলছিলাম কী, এই শনিবারই কাজটা সেরে ফেল। চাকররা দুপুরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমি তোমাকেই ছদ্মনামে গাড়ি চালাবার লাইসেন্স দেব। তুমি ম্যানহাটন থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে লং আইল্যান্ডে চলে যাবে। পৌঁছবে ঠিক এগারোটার সময়, গয়নাগুলো নিয়ে ফিরে আসবে। গাড়ি চালাতে জানো তো?

–জানি।

–চমৎকার। সেন্টলুই স্টেশন থেকে সকাল ৭-৪৫ মিনিটে একটি ট্রেন ছাড়ে। তোমার জন্য কামরা রিজার্ভ করা থাকবে। স্টেশনে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। তখনই তোমার হাতে ২৫ হাজার ডলার দিয়ে দেব।

ট্রেসি আর কথা বলার সুযোগ পেল না। তবু আমতা আমতা করে সে বলল আমার একটা সোনালী পরচুল চাই।

ট্রেসি চলে যাবার পর কোনরাড একটু দ্বিধায় পড়ল। মেয়েটা দারুণ সুন্দরী, চুরি আটকানোর জন্য ওই বাড়িতে অ্যালার্মের ব্যাপার আছে, এটা কিন্তু কোনরাড জানত না।

কোনরাড মরগান

১৬.

কোনরাড মরগান হাজার ডলার দিয়েছিল। ট্রেসি তা দিয়ে একটা সোনালী আর একটা কালো পরচুলা কিনল। গাঢ় নীলরঙের প্যান্টশার্ট কিনল। কাঁধে ঝোলানো বড়ো ব্যাগ নিতে ভুল করল না। কথা মতো কোনরাডের দেওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স পেল এলেন ব্রাঞ্চের নামে। বেলামি হাউসের নকসা আর আয়রন সেফের কমবিনেশন নম্বর আর রেলের টিকিটটিও হাতে পেয়ে গেল ট্রেসি। এবার বেরিয়ে পড়ল একটা গাড়ি ভাড়া করার জন্য।

লং আইল্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে ট্রেসি ভাবছিল, এটাও ছিল আমার ভাগ্যে। সে চলেছে চুরি করতে। আচ্ছা, আমি যদি ধরা পড়ে যাই, এত বড়ো ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

কোনরাডের কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করছিল ট্রেসি তুমি মোটেই ধরা পড়বে না। এ ব্যাপারে আমার হাত-যশ আছে বলতে পারো। আমি তোমাকে সব দিক দিয়ে বাঁচাবো।

ট্রেসি ঠিকমতো গাড়িটা চালাতে পারছিল না। সে ভাবল, ফিরে গিয়ে কোনরাডকে যদি বলি, পারলাম না, তাহলে কেমন হয়?

শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে এসে থামল সে। ভিক্টোরিয়া আমলের পুরোনো একটা জমকালো বাড়ি। নাম এমবার্স।

একটা বড়ো উইলি গাছের আড়ালে গাড়িটাকে দাঁড় করাল। বড়ো রাস্তা থেকে একটু নেমে যেতে হবে।

কোনরাডের কথাগুলো আর একবার মনে করে নিল ট্রেসি। বাড়িটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। সিকি মাইলের মধ্যে আর কোনো বাড়ি নেই। রাত দশটায় পুলিশের গাড়ি চক্কর দিয়ে যাবে। আবার আসবে রাত দুটোর সময়। তার আগেই ট্রেসির কাজ শেষ হয়ে দিয়ে যাবে। আইলের মধ্যে আর

ট্রেসি ঘড়ি দেখল, ঠিক এগারোটা। ফেরার সময় আছে কি? ওই দরিদ্রতার জীবনে সে আর ফিরতে পারবে না। কিন্তু পালাবার সময় যদি পুলিশের হাতে পড়ে?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ট্রেসি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোনো এক অদৃশ্য, শয়তান বোধ হয় তাকে এই অন্ধ বিবরে নিয়ে এসেছে।

বাড়িটা একেবারে অন্ধকার। ট্রেসির মনে পড়ল কোনরাডের কথা। দস্তানা পরে নিতে ভুলো না। তাহলে শেষ পর্যন্ত এটা আমি করতে যাচ্ছি। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

সদর দরজার বাঁ পাশে অ্যালার্মের ঘণ্টাটা আছে। পাঁচটা বোতাম আছে। লাল আলো জ্বলা মানে অ্যালার্ম চালু আছে। ওটাকে অকেজো করার সাঙ্কেতিক নম্বর হল তিন-দুই চার-এক-এক। লাল আলো নিভে গেলে বুঝবে অ্যালার্ম অকেজো হয়েছে। এবার চাবি নিতে হবে। ভেতরে ঢুকে আবার চাবি লাগবে। টর্চ লাইট ব্যবহার করবে। আলো জ্বালবে

না একবারও। আসল ঘরটা দোতলার বাঁ ধারে, আয়রন সেটা আছে বেলামির বড়ো ফটোর পেছনে। এবার তালা খোলার ব্যাপারটা। নিমেষে কাজ শেষ করতে হবে।

কোনরাডের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দোতলায় পৌঁছে গেল ট্রেসি। সুন্দর। করে সাজানো ঘরটা দেখে তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। চার্লসকে বিয়ে করলে সে এমন একটি ঘরের মালকিন হতে পারত।

মিসেস বেলামির ফটো। উদ্ধত চেহারার মহিলা। এর ক্ষতি করাতে কোনো পাপ নেই। নম্বর মুখস্থ ছিল। আয়রন সেফ খুলে গেল। সামনে একগাদা কাগজপত্র। একেবারে পেছনের দিকে স্যামুয় লেদারের ব্যাগে গয়না।

ব্যাগটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম ঘণ্টা বেজে উঠল। পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল ট্রেসির শরীর। হায় ঈশ্বর, কোনরাড কি ইচ্ছে করে এই ভুলটি করল? নাকি সত্যি সে জানত না?

এখন আর সময় নেই। স্যামুয় লেদারের ব্যাগটা নিজের ঝোলা ব্যাগে পুরে নিল। তরতর করে একতলায় নেমে এল ট্রেসি। বাড়ির ঘণ্টাগুলো তখনো বাজছে। সাইরেন বাজিয়ে একটা ভ্যান ছুটে আসছে। চট করে জানলার পর্দা সরিয়ে ট্রেসি দেখল, সাদা কালো রঙের টহলদারি গাড়িটা দাঁড়িয়েছে বাড়িটার সামনে। উর্দি পরা একজন পুলিশ দৌড়ে চলে গেল বাড়ির পেছন দিকে। অন্য একজন দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজাতে। তার মানে? পালাবার আর পথ নেই। আবার তাকে জেলখানায় ঢুকতে হবে?

না-না, ওরা আমাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না। মাথা ঝাঁকাতে আঁকাতে ট্রেসি অধৈর্য হয়ে মনে মনে বলে উঠল।

সদরে আবার তীব্র শব্দ করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

লেফটেনান্ট মেলভিন ডারকিন দশ বছর ধরে সীক্লিফ পুলিশ বিভাগে চাকরি করছেন। শহরটা মোটামুটি শান্ত। এখানে যারা বসবাস করেন, তারা উঁচু শ্রেণীর মানুষ। ঝুটঝামেলাতে জড়াতে পছন্দ করেন না। অথচ লেফটেনান্ট মেলভিন কাজের লোক। ছোটোখাটো কাজে তাঁর মন ভরে না। মিসেস বেলামিকে উনি ভালোমতো চিনতেন। ভদ্রমহিলার বাড়িতে যে দামী দামী গয়না আর ছবি আছে, সেটাও ওনার জানা ছিল।

রাতে পুলিশ পেট্রল করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে শুনতে পেলেন বেলামির বাড়ির বিপদ সঙ্কেত ঘন্টাটা বাজছে। বড়ো একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে ভেবে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন মেলভিন।

তৃতীয় বার ঘণ্টাটি বাজবার পর দরজাটা খুলে গেল। মেলভিনের মাথা তখন ঘুরে গেছে। দরজার সামনে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। পরনে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম নাইট গাউন। মুখে পুরু করে লাগানো প্রসাধনি ক্রিম। মাথার চুলগুলি রোলার ক্লিপ আঁটা। তার মানে চুল কোঁকড়া করা হয়েছে।

মহিলা কৈফিয়ত নেবার সুরে বললেন–কী ব্যাপার?

মেলভিন ঢোক গিললেন–আপনি? আপনি কে?

–আমি এলেন ব্রাঞ্চ। লুই বেলামির বাড়ির অতিথি। উনি ইউরোপ বেড়াতে গেছেন।

–তা আমি জানি, মেলভিন বোকার মতো বললেন, কিন্তু উনি তো একথা বলে যাননি যে, ওনার বাড়িতে একজন অতিথি থাকবে?

বিজ্ঞের মতো মহিলা মাথা নেড়ে বললেন–ওটাই ওনার স্বভাব। কিন্তু এই শব্দটা আমি সহ্য করতে পারছি না।

মেলভিন এগিয়ে গিয়ে কায়দা করে সুইচ টিপলেন, অ্যালার্ম বন্ধ হয়ে গেল।

মহিলা বললেন–আপনাকে দেখে যে কী আনন্দই হচ্ছে আমার কী বলব। শুতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় অ্যালার্ম বেজে উঠল। আমার স্থির বিশ্বাস বাড়িতে চোর ঢুকেছে। আমি একলা আছি। চাকররাও দুপুরে চলে গেছে।

–আমি কি চারপাশে একবার ঘুরে দেখব?

–নিশ্চয়ই।

লেফটেনান্ট মেলভিন বাড়িটা ঘুরে দেখলেন। না, কেউ লুকিয়ে নেই।

–আজকাল এই ঘণ্টাগুলো কখন কী করে বলা যায় না। কোম্পানিতে খবর দিতে হবে।

–নিশ্চয়ই দেব।

ধন্যবাদ জানিয়ে মেলভিন চলে গেলেন। ট্রেসি লক্ষ্য করল। পুলিশের গাড়িটা চলে গেছে।

তাড়াতাড়ি দোতলায় গেল। মিসেস বেলামির বাথরুমে পোশাক পাল্টাল। মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় অ্যালার্মের সুইচটা ঠিক করে দিয়ে গেল।

ম্যানহাটানে ফেরার পথে ট্রেসি হঠাৎ বুঝতে পারল, কী একটা অসাধারণ কাজ সে করেছে। পুলিশকে কীভাবে বোকা বানিয়েছে। এক বছর বাদে হো-হো করে হেসে উঠল সে।

.

১৭.

ট্রেন ছেড়েছে পেনসিলভানিয়া স্টেশন থেকে। ট্রেসির অশান্ত মনটা এখন অনেক শান্ত হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করে কাঁপছিল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল এখুনি বোধহয় পিঠের ওপর একটা ভারী হাতের থাবা চাপড় মারবে। পুলিশের কণ্ঠস্বর তাকে শোনাবে–চলো ট্রেসি, বাইরের মুক্ত পৃথিবীটা তোমার আসল জায়গা নয়। তোমাকে আবার ওই সমকামিতার আসরে ফিরে যেতে হবে।

যেসব যাত্রী ট্রেনে উঠছিল, তাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল ট্রেসি। কাউকে তেমন সন্দেহজনক মনে হয়নি। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল, চুরির ঘটনাটা এখনো

পর্যন্ত জানাজানি হওয়া সম্ভব নয়। হলেও ওকে জড়ানো যাবে না। সেন্ট লুই স্টেশনে কোনরাড পঁচিশ হাজার ডলার নিয়ে অপেক্ষা করবে। এত টাকা নিয়ে কোথায় যাবে? লণ্ডন প্যারিস প্রভৃতি শহরের নাম মনে এল। মনটা তখন হালকা পাখি হয়ে নীল আকাশে দুটি ডানা মেলে দিয়েছে।

কামরার দরজাটা ভালো করে বন্ধ করল। থলে থেকে স্যাময় চামড়ার ব্যাগটা বের করল। ব্যাগটা ভোলা মাত্র চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল তার। চুনি, পান্না ও হীরে, মুক্তো সব নিয়ে কয়েক লক্ষ ডলার হবে। নিজের কৃতিত্বকে বাহবা দিল। নরম গদিতে গা এলিয়ে তার অভিযানের ইতিবৃত্তটা মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল।

সেন্ট লুই স্টেশনের দিকে ট্রেসি এখন ছুটে চলেছে। পুলিশকে বোকা বানাতে পেরেছে, সত্যি উপস্থিত বুদ্ধি না থাকলে তাকে ধরা পড়তেই হত। নিজের বুদ্ধিকে আর একবার বাহবা দিল।

দরজায় কে যেন টোকা দিল? গয়নার ব্যাগটা থলের মধ্যে চালান করে দিল ট্রেসি। ট্রেনের টিকিটটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

ধূসর রঙের স্যুট পরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে। একজনের বয়স তিরিশ বত্রিশের বেশী হবে না। অন্যজন বছর চল্লিশের। কমবয়েসীটাকে বেশ সুন্দর দেখতে। বুদ্ধিদৃপ্ত চোখ।

বয়স্ক ব্যক্তিটি পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে দেখালেন। সেখানে লেখা আছে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেসটিগেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিভাগ।

উনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন–আমি স্পেশ্যাল এজেন্ট ডেনিস ট্রেভার। ইনি সিক্রেট এজেন্ট টমাস বাওয়ার্স।

ট্রেসির ঠোঁট শুকিয়ে গেল। জোর করে ঠোঁটের কোণে শুকনো হাসির প্রলেপ এনে সে বলল–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিছু গণ্ডগোল হয়েছে কি?

–হ্যাঁ হয়েছে ম্যাডাম। কয়েক মিনিট আগে ট্রেনটা নিউ জার্সিতে ঢুকেছে। চুরি করা জিনিস অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয়।

ট্রেসির মনে হল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে–যাচ্ছে।

ডেনিস ট্রেভার বলল–আপনি দয়া করে আপনার মালপত্র খুলে দেখাবেন কি? মনে রাখবেন, এটা কিন্তু আমার অনুরোধ নয়, এটা আমার আদেশ।

শেষ চেষ্টা করার জন্য ট্রেসি আমতা আমতা করে বলেছিল–নিশ্চয়ই দেখাব। তবে। এভাবে আমাকে বিরক্ত করাটা উচিত হয়নি। আপনাদের কাছে তল্লাসী পরওয়ানা আছে তো?

টমাস বাওয়ার্স বলে বসল–পরওয়ানার দরকার নেই। একটা বিশেষ অপরাধে আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করছি মিস হুইটনি।

হায় ঈশ্বর, এরা আমার আসল নামটা পর্যন্ত জেনে গেল।

ট্রেসির ঝোলানো ব্যাগ খুলতেই স্যাময় লেদারের গয়নার ব্যাগটা বেরিয়ে এল। সেখান থেকে পাওয়া গেল অনেক লক্ষ টাকার গয়না। ট্রেসির পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে ধপ করে বসে পড়ল।

এবার ডেনিস পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে সবকিছু মিলিয়ে নিল। সব ঠিক আছে?

–আপনারা খবর পেলেন কী করে?

এই প্রশ্নটা না করে ট্রেসি থাকতে পারল না।

–সে খবর আপনাকে দিতে আমরা বাধ্য নই। আপনি এখন আমাদের হাতে বন্দী, যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহলে আদালতে বলবেন।

টমাস বাওয়ার্স বলল–দুঃখিত, আপনার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সব কথা আমাদের জানা আছে।

ডেনিস, ট্রেভার বললেন–অত ভদ্রতা করার দরকার নেই।

তারপর উনি পকেট থেকে একটা হাতকড়া বের করলেন।

ট্রেসি কাঁপতে কাঁপতে বলল–এটা কি না করলেই নয়?

–করতেই হবে। হাতকড়া পরাতে যাচ্ছে, এমন সময় টমাস ডেনিসকে বলল–বাইরে চলুন। আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলব।

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। ট্রেসি ওদের কথাবার্তা ভালো ভাবেই শুনতে পাচ্ছিল।

–মেয়েটা তো পালিয়ে যেতে পারবে না। হাতকড়া পরানো কি সত্যি দরকারী?

–কেন ছেলেমানুষী করছো টমাস? চাকরি তো বহুদিন হল।

দুজনে বেশ তর্কাতর্কি করে আবার কামরাতে ফিরে এল। ডেনিস বললেন, ঠিক আছে আপনাকে হাতকড়া পরানো হচ্ছে না। তবে পরের স্টেশনে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা বেতারে খবর দিতে যাচ্ছি, পুলিশের গাড়ি পাঠাতে পরের স্টেশনে। _ কম বয়সী টমাস বাওয়ার্স বলল–এর থেকে বেশী সাহায্য আপনাকে আমি করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আশা করি, আমার সহযোগিতার দাম আপনি রাখবেন।

এজেন্ট দুজন বাইরে গেল, ট্রেসির কামরা দেখিয়ে কনডাকটারকে কী সব যেন বলল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। ট্রেসি ভাবতে পারছে না, কী করে এফ. বি. আই-এর কাছে খবর গেল। কোনরাড মরগান নিশ্চয়ই গয়নাগুলো চুরি করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে না। তাহলে? তাহলে কে এই কাজ করেছে?

পরের স্টেশনে ট্রেনটা এসে দাঁড়াল। ট্রেসি কোট পরে নিল। স্যুটকেসটা পায়ের কাছে রেখে সে এখন পুরোপুরি তৈরী। এবার এজেন্ট দুজন আসবে। কিন্তু কই কেউ আসছে না তো?

এক এক মুহূর্তকে তখন অনন্ত সময় বলে মনে হচ্ছে ট্রেসির। শেষ পর্যন্ত কনডাকটারের গলা সে শুনতে পেল–যাঁরা গাড়িতে আছেন...

তার মানে নামতে বলছে। প্ল্যাটফর্মেই পুলিশ থাকবে বোধ হয়। ট্রেসি স্যুটকেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

কনডাকটার এগিয়ে এল–এখানেই নামছেন ম্যাডাম, সাবধানে নামবেন, আপনার যা। অবস্থা।

ট্রেসি মনে মনে ভাবল কী অবস্থা? প্রশ্ন করতেও ভয় লাগছে।

কনডাকটার বলল–আপনার দাদারা বলে গেছেন, আপনার ওপর কড়া নজর রাখতে। আপনার নাকি বাচ্চা হবে? এখন সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

–আপনার দাদারা?

ট্রেসি হাঁ হয়ে গেল।

–হ্যাঁ দারুণ লোক ওঁরা। আপনার জন্য কত চিন্তাভাবনা করছিলেন।

ট্রেসি প্ল্যাটফর্মে নেমে জানল, দাদারা ট্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরে চলে গেছে। চলে গেছে দশ লাখ ডলারের গয়না নিয়ে।

ট্রেসি একটা ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্টে রওনা দিল। ওরা দুজন যখন ট্যাক্সি ধরেছে, তখন ওরাও নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে যাবে। রাগে সমস্ত শরীরে তখন জ্বালা ধরে গেছে তার। লোক দুটো জোচ্চুরি করে ওকে ঠকিয়েছে। তবে দারুণ অভিনয় করেছে লোক দুটো।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখল, লোক দুটো ডিপারচার গেটে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। লাইন আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে ওরা মেক-আপ পাল্টে ফেলেছে। কম বয়সীটার গোঁফ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখের তারা আর নীল নয়, এমন কী চশমাও নেই। বয়স্ক জন পরচুলা খুলে ফেলাতে তার, মাথায় বিরাট একটা টাক চকচক করছে। তবে পোশাকটা পাল্টাবার সময় পায়নি।

–কিছু একটা ভুলে যাচ্ছেন আপনারা? ট্রেসি সোজাসুজি ওদের কাছে গিয়ে বলল।

ছোটো জন বলল–এখানে কী করছেন? স্টেশনে গাড়ি আসবে পুলিশের।

ট্রেসি পাল্টা প্রশ্ন করল আপনারা না গেলে কী করে হবে?

–আমাদের অন্য একটা জরুরী কাজ আছে, এই প্লেনেই যেতে হবে।

ট্রেসি বুঝতে পারছে না, এখন তার কী করার দরকার। সে বলল–তাহলে আমার গয়নাগুলো ফেরত দিন।

–তা আমরা পারি না, পরে অফিস থেকে রসিদ পাঠিয়ে দেব।

–রসিদ চাই না, আমার গয়না চাই।

ট্রেসি এপাশ ওপাশ তাকিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে আনল।

লোক দুটো চমকে উঠেছে কী হচ্ছে কি? তিনজনেই কি একসঙ্গে জেলে যাব নাকি?

পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসেছে কী হয়েছে ম্যাডাম, কোনো গণ্ডগোল?

–না, তেমন কিছু নয়। এরা আমার হারিয়ে যাওয়া গয়নাগুলো পেয়েছেন। ভাগ্যিস পেয়েছেন, না হলে থানায় যেতে হত।

ট্রেসি আরো বলল–এঁরা বলছিলেন আপনি যদি আমাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

ট্রেসি তারপর লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল–আর কোনো ভাবনা নেই, এবার গয়নার ব্যাগটা দিয়ে দিন।

ওরা শেষ চেষ্টা করল ট্রেসির সঙ্গে যাবার, কিন্তু ট্রেসি বলল–আপনাদের প্লেন ছটায় ছাড়বে। আর বেশী দেরী করা বোধহয় উচিত হবে না।

ব্যাগটা নিয়ে দুজনকে পাঁচটা করে ডলার দিয়ে আরো একবার নিজেকে ধন্যবাদ দিল ট্রেসি। তারপর পুলিশ অফিসারের পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে স্বাভাবিক গলায় বলল–পৃথিবীতে এখনো কত সৎ লোক আছে, তাই না?

.

১৮.

টমাস বাওয়ার্স অথবা জেফ স্টিভেন্স প্লেনের জানলার দিকে বসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিল।

ডেনিস ট্রেভার অথবা ব্রান্ডন হিগিন্স তার কাছে বসে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে- আরে এতে কাঁদার কী আছে? সামান্য টাকার ব্যাপার তো, ভবিষ্যতে এমন অনেক টাকা আমরা আয় করতে পারব।

হিগিন্স হাসছে। এতে হাসির কী আছে? মেয়েটা যেভাবে ওদের বুদ্ধু বানিয়ে গেল, ভাবাই যায় না। কোনরাড মরগান বলেছিলেন, মেয়েটা একেবারে আনাড়ি। এই প্রথম কাজে নামছে, ওকে ঠকানো কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমনই ধূর্ত। এমন একটা মেয়ে পেলে উইলিকাকা খুবই খুশী হতেন।

জেফের শিক্ষা গুরু এই উইলিকাকা। জেফের মা একটা মস্ত বড়ো কারখানা চালাতেন। সেখানে চাষবাসের জিনিসপত্র তৈরী হত। তাঁর সঙ্গে এক মেয়েভুলানো পুরুষের বিয়ে হয়। তিনি কোনো কাজই করতেন না। বড়ো বড়ো প্ল্যান তৈরী হত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো প্ল্যান আর সফল হত না। জেফের বাবার কাজ ছিল, স্ত্রীর কাছ থেকে যে করেই হোক টাকা আদায় করা এবং উচ্চুঙ্খল জীবনযাপন করা। তা নিয়ে বাবা আর মায়ের

মধ্যে তুমুল ঝগড়া হত। কিশোর বয়সে জেফ প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে কোনো দিন বিয়ে করবে না।

বাবার আপন ভাই উইলিকাকার একটা ছোটো কার্নিভাল ছিল। তিনি যখন ওহিয়োর ম্যারিয়নের কাছে আসতেন, তখন একবার দাদার বাড়ি ঘুরে যেতেন। ভারী হাসি খুশী মেজাজের মানুষ। যখনই আসতেন ভাইপো জেফের জন্য মজার মজার উপহার আনতেন। ছোটোবেলাতেই জেফ ওনার কাছ থেকে ম্যাজিকের খেলা শিখে নিয়েছিল। উইলিকাকা কার্নিভালে ম্যাজিক দেখিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন। পরে ওই কার্নিভালটি তিনি কিনে নেন।

জেফের যখন চোদ্দো বছর বয়স, তখন অ্যাকসিডেন্টে মা মারা গেলেন। দুমাস বাদে বাবা উনিশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। মেয়েটি এক মদের দোকানে ওয়েট্রেস ছিল। এই ঘটনার জন্য বাবাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি জেফ।

এই সময় বাবা সেলসম্যানের চাকরি নিয়ে সপ্তাহে তিনদিন শহরের বাইরে ট্যুরে যেতেন। একদিন জেফ আর তার সম্মা বাড়িতে ছিল। গভীর রাতে হঠাৎ জেফের ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খোলার একটা শব্দ পেল সে, কয়েক মুহূর্ত পরে একটা নগ্ন শরীর এসে তার গায়ে ঠেকল। জেফ চিৎকার করতে যাচ্ছিল, তার সম্মা বলে উঠল, আমার ভীষণ ভয় করছে জেফ। বাইরে বাজ পড়ছে। আমাকে জড়িয়ে ধরো।

–কিন্তু বাজ তো পড়ছে না।

–পড়তেও তো পারে, তারপর সম্মা এমন একটা প্রস্তাব করল, যেটা শুনে জেফ শিউরে উঠেছিল। সে ভাবতেই পারেনি, সম্মার কাছ থেকে এমন একটা আমন্ত্রণ আসতে পারে।

সত্মা চলে গেল। জেফ বলে গেল, আসছি, ঝটিতি পোশাক পরে জানলা দিয়ে জেফ বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। এল কানসাসে। দেখা করল উইলিকাকার সঙ্গে। হঠাৎ চলে আসার কারণ জানতে চাইলে জেফ হাসতে হাসতে বলেছিল, সত্যার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না।

উইলিকাকার সঙ্গে বাবার কথা হল টেলিফোনে। ঠিক হল, জেফ এবার উইলিকাকার সঙ্গেই থেকে যাবে।

কার্নিভালের নিজস্ব একটা জগত আছে। একদিন উইলিকা সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। উদগ্রীব দর্শককে কীভাবে ঠকাতে হয়, তাও শিখে নিল জেফ।

কার্নিভালের বন্ধুরা ক্রমশ জেফের বন্ধু হয়ে উঠল। ওই দলে কিছু যুবতী ছিল, যাদের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। জেফ মায়ের বুদ্ধি আর বাবার রূপটা পেয়েছিল। এইসব মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কে আগে জেফের কৌমার্য হরণ করবে, তা নিয়ে একটা জোর লড়াই শুরু হয়ে গেল। জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখানো মেয়েটি শেষ পর্যন্ত জিতে গেল।

উইলিকাকা জেফকে সব কিছু শেখালেন। বললেন একদিন এসব তোমারই হবে জেফ, এখন থেকে না শিখে রাখলে পরে অসুবিধায় পড়তে হবে।

জেফ একটা বিচিত্র খেলা শিখল প্রথমে, লম্বা টেবিলের অন্য প্রান্তে কাপড়ের তৈরী ছটা বেড়াল, খেলুড়েকে একটা বল দেওয়া হয়, ওই বল দিয়ে ছটা বেড়ালকে কাত করতে পারলে বাজি জেতা যায়। বেড়ালগুলো পায়ের বদলে কাঠের চাকতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। টেবিলের তলায় লুকিয়ে থাকে দলের একজন। ইশারা পাওয়া মাত্র সে কাঠের ছড়ি আটকানো একটা বেড়ালকে সোজা করে দেয়। খেলুড়ে তাই হেরে যায়।

–আরে ফেলতে পারলেন না। খুবই সহজ ব্যাপার। বলতে শোনা যায় খেলার পরিচালককে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলার লোকটি কাঠের ছড়িটাকে আলগা করে রাখে। পরিচালক বল ছোঁড়ে, আর ছটি বেড়াল কুপোকাত হয়ে যায়।

–নিন, আবার পরীক্ষা করুন। পরিচালক তাকে আবার ডাকে। সঙ্গে বান্ধবী আছে। তার কাছে হিরো সাজতে হবে। সুতরাং আবার পয়সার খেলা।

এইভাবে লোক ঠকানোর ব্যাপারগুলো জেফ অতি সহজেই শিখে ফেলল। উইলিকাকা তার এই কাজে খুবই খুশী হয়েছেন।

বছর চারেক সে কার্নিভালে কাটিয়েছিল। নানা চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি অর্জন করল। কীভাবে মানুষের মনে লোভের সুড়সুড়ি দিতে হয়, তা শিখে ফেলল। এখন তার বয়স আঠারো বছর। চোখে পড়ার মতো সুন্দর হয়েছে। তার মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি আরো সুন্দর। পুরুষ এবং শিশুরা সকলেই জেফের সান্নিধ্য চাইছে। খদ্দেররা খুব সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

একদিন উইলিকাকা বললেন–শহুরে লোকগুলোর ব্যাপারে এতটা ভাবনা-চিন্তা করবে না, ওদের বাবারা এক-একজন শেরিফ।

ছুরি ছোঁড়ার খেলাটা যে দেখাত, তার বউয়ের জন্য জেফকে কার্নিভাল ছাড়তে হল। তখন কার্নিভাল জর্জিয়ার মিল্ডগেভিলে তাঁবু ফেলেছে। সিসিলির বিখ্যাত ছুরি ছোঁড়া খেলোয়াড় জোরবিনির সঙ্গে নতুন একটা কনট্রাক্ট হল। যৌবনবতী স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে সে ছুরি ছুঁড়ে মারে। দারুণ উত্তেজক খেলা, লোকটার নাম হয়ে গেল গ্রেট জোরবিনি।

তখনো পুরোপুরি কার্নিভাল শুরু হয়নি। জোরবিনি তার স্টেজ এবং সাজসরঞ্জাম সাজাবার কাজে ব্যস্ত। জোরবিনির বউ জেফকে ডাকল তার হোটেলে।

সে বলল–জোরবিনি আজ সারাদিন এখানে কাজে ব্যস্ত থাকবে। চলো না আমরা একটু ফুর্তি আমোদ করি। জেফ ভাবল, মন্দ কী?

–এক ঘণ্টা পরে এসো। জোরবিনির বউ বলল।

–একঘণ্টা কেন?

বউটা হেসে বলল–তৈরী হতে এক ঘণ্টা সময় নেবো।

একটা ঘণ্টা বুঝি আর কাটতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত জেফ পৌঁছালো জোরবিনির বউয়ের ঘরে। অর্ধনগ্ন অবস্থায় বউ দরজা খুলে দিল। জেফ ওকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, বউটা পিছলে সরে গিয়ে বলল, চলো, ভেতরে চলো।

বাথরুমে ঢুকে জেফের চোখ একেবারে আটকে গেছে। বাথটবে ছরকমের বিভিন্ন স্বাদের আর রঙের জেলি রয়েছে, গরম জলে মেশানো অবস্থায়।

–এসব কী?

–শেষ পাতে যা খাও, নাও, এবার জামাকাপড় খুলে এর মধ্যে নেমে পড়ো। বউটার কথা মতো কাজ করল জেফ। চটচটে জেলির সংস্পর্শে এসে শরীরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। দেখতে দেখতে বউটাও বাথটবে নামল। জেফের গা চাটতে শুরু করল অদ্ভুত ভাবে। এ ধরনের উন্মাদনা জেফ কোনো দিন অনুভব করেনি। হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে জোরবিনি ঢুকে পড়ল। নিজের ভাষায় কী যেন বলল সে। তবে সে যে ভীষণ ক্ষেপে গেছে, তা বোঝা গেল।

জোরবিনি বোধহয় ছুরি আনতে শোবার ঘরে গিয়েছিল। এই ফাঁকে কোনরকমে পোশাকগুলো তুলে জানলা দিয়ে লাফ মেরে জেফ বাইরের গলিতে পড়েছে। উলঙ্গ অবস্থায় ছুটছে। দু-একটা ছুরি সাঁ সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে গেল জেফ। চোখের আড়ালে গিয়ে তার জেলি মাখানো গায়ের ওপর প্যান্ট অর জামা চাপাল। চলে এল বড়ো রাস্তায়। প্রথম বাসটা ধরে শহর থেকে পালাল। ছমাস বাদে তাকে দেখা গেল ভিয়েতনামে।

.

ভিয়েতনামের যুদ্ধ জেফকে আরো নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন করে তুলল। শাসক গোষ্ঠীর আমলা তন্ত্রকে নতুন করে ঘেন্না করতে শিখল সে। সে ভাবতেই পারেনি, অর্থ, সম্পদ আর মানুষের প্রাণের এমন অপচয় চোখের সামনে কোনোদিন দেখতে হবে।

যুদ্ধ থেকে ছাড়া পাবার কয়েক সপ্তাহ আগে সে খবর পেয়েছিল উইলিকাকা মারা গেছেন। কার্নিভালের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। তার মানে অতীতটা এখন চিরদিনের মতো অতীত হয়ে গেল। শুধু ভবিষ্যতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে।

এর পরের কয়েকটা বছর দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছিল। জেফের কাছে সমস্ত পৃথিবীটা এখন এক কার্নিভাল। খালি ঠকিয়ে যাও সবাইকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিল এক ডলারে রাষ্ট্রপতির রঙিন ফটো দেওয়া হবে। হাজার হাজার ডলার এল। ফটোর বদলে রাষ্ট্রপতির ছবি দেওয়া ডাকটিকিট একটা করে পাঠিয়ে দিল সবাইকে।

পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিল–পাঁচ ডলার না পাঠালে পশ্চাতে হবে। কীসের জন্য এই পাঁচ ডলার তার কোনো উল্লেখ থাকল না। তবু পাঁচ ডলারের বন্যা বয়ে গেল।

এভাবেই চলছিল, লোক ঠকিয়ে। হঠাৎ এক বন্ধুর কাছ থেকে চাকরির খবর পেল। একটা প্রমোদ তরণী তাহিতি যাচ্ছে। সেখানে কাজের লোক চাই। সমুদ্র ভীষণ ভালোবাসে জেফ। নাবিক হিসাবে সেই চাকরিতে যোগ দিল সে।

জাহাজটা দারুণ সুন্দর দেখতে। দুধসাদা রঙের। সমুদ্রের বুকে রাজহাঁসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুন্দর কেবিন আছে, ক্যাপ্টেন, স্টুয়ার্ট, আর রাঁধুনি ছাড়া পাঁচজন নাবিক আছে। জেফের কাজ হল পাল তোলা আর নামানো। এছাড়া তাকে আর একটা কাজ করতে হত। জাহাজের পেতলের অংশগুলো ঘষে মেজে পরিষ্কার রাখতে হত।

একটা দল হাওয়াই দ্বীপের তাহিতিতে ফুর্তি করতে চলেছে। জেফের বন্ধু বলেছে। মালিকের নাম হল্যান্ডার।

এই হল্যান্ডারের এক পঁচিশ বছরের সোনালী চুলের সুন্দরী যুবতী, তার পুরো নাম লুই হল্যান্ডার, মেয়েটির বাবা মধ্য আমেরিকার প্রায় আধখানার মালিক, অর্থাৎ ভীষণ বড়লোক। লুই হল্যান্ডার বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করতে বেরিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে জেফ একমনে কাজ করছিল। হঠাৎ লুই তার পাশে এসে দাঁড়াল।

–জাহাজে নতুন মনে হচ্ছে? লুই-এর দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল জেফ। আহা এমন সৌন্দর্য এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল।

–তোমার নাম কী?

–জেফ স্টিভেন্স।

–জানো আমি কে?

–না।

–এই জাহাজটা আমার।

–তাহলে আমি আপনার কাছে চাকরি করছি।

হল্যান্ডার একটু হেসে বলল–হ্যাঁ তাই।

–মাইনের টাকাটা যদি পুরো আদায় করতে চান তাহলে আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিন, নিস্পৃহ কণ্ঠে জেফ বলেছিল।

রাত্রে জাহাজের অন্য কর্মীরা হৈ হৈ করে হুল্লোর করত, জেফ কিন্তু গুটিয়ে মনমরা হয়ে বসে থাকতো। এদের তুলনায় সে কতটা নিকৃষ্ট। এদের শিক্ষাদীক্ষা বংশ পরিচয় সবকিছু বলবার মতো, কিন্তু সে কিছুই শেখেনি, উইলিকাকার কার্নিভাল ছাড়া আর কোনো অভিজ্ঞতা নেই তার।

জাহাজের একজন কর্মী ছিলেন অধ্যাপক। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে চাকরী করতেন। দুষ্প্রাপ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি চুরি করে বিক্রি করতেন। এই অপরাধে তার চাকরী চলে গেছে। তিনি জেফের সঙ্গে গল্প করতেন। তার স্বপ্ন আফ্রিকার প্রাচীন প্যারিস অর্থাৎ কার্থেজ শহরে গিয়ে খননকার্য চালাবেন। ইতিহাসের বিস্মৃত সূত্র আবিষ্কার করবেন। জেফের আগ্রহ দেখে তিনি বলেছিলেন তখন তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। কিছুকাল বাদে ওই অধ্যাপক মারা যান। জেফ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই জীবনে অন্তত একবার কার্থেজে যাবে।

তাহিতিতে পৌঁছবার আগের দিন লুই হল্যান্ডার জেফকে ডাকল তার কেবিনে।

জিজ্ঞেস করলো–কেমন লাগছে তোমার এখানে।

–মন্দ কি।

–কী ধরনের মেয়েদের তুমি পছন্দ করো?

–তাতে আপনার কী দরকার?

জেফের ওই কাঠ কাঠ উত্তর শুনে হল্যান্ডারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল।

কাল রাতে একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছি, তুমি অবশ্যই এসো কিন্তু। উত্তর দেবার আগে । জেফ তাকালো ওই সোনালী চুলের মেয়েটির দিকে। তার আত্মারাত্মা কেঁপে উঠল। কিন্তু এ এক অসম আমন্ত্রণ, শেষ পর্যন্ত জেফ ঘাড় কাৎ করলো।

এভাবেই একটা অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হল।

.

এবার হল্যান্ডার-এর পরিচয়টা দেওয়া যাক। বয়েস মাত্র একুশ হলে কি হয়, ইতিমধ্যেই দু-দুবার স্বামী পাল্টেছে সে। তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে এখন চলেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। পরদিন বন্দরে জাহাজ নোঙর করলো। একে একে সকলেই তীরে নেমে যাচ্ছে। এমন সময় জেফের ডাক পড়ল ব্যক্তিগত কেবিনে। সেখানে ঢুকে জেফ চোখ সরাতে পারলো

না। চোখের সামনে এমন একটা আগুন-যৌবনের মেয়ে যদি খাটো স্কার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে অবস্থা কেমন হয়।

–দেখো না জিপটা কিছুতেই লাগাতে পারছি না।

জেফ কাছে গিয়ে পোশাকটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলো, কাচুমাচু মুখে বলল, ম্যাডাম, এখানে হুক লাগাবার ব্যবস্থাই নেই।

হল্যান্ডার দুষ্টুহাসি হেসে বলল–সেখানেই তো আসল সমস্যা। আশা করি তুমি আমাকে সমাধানের উপায়টা বাতলাতে পারবে।

এরপর যা হল ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় কি? ডেকের ওপর আদিম লীলার সাক্ষী হয়ে রইল সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে আসা লোনা বাতাস আর উজ্জ্বল নীল আকাশ।

তারপর প্রতি রাতে একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হতে থাকল। চলতে থাকলো অভিসারের পালা। বন্ধুরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেলুই আরেকটা খেলার পুতুল ধরেছে।

কিন্তু যখন সকলে খবর পেল লুই সত্যি সত্যি জেফকে বিয়ে করতে চলেছে, তখন তারা অবাক না হয়ে পারলো না। কোথায় লুই আর কোথায় জেফ? জেফের অতীত সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, আর লুই কিনা চতুর্থ বারের জন্য জেফকেই বেছে নিল তার স্বামী হিসেবে?

জেফ তার অভাবিত ভাগ্য উন্নতিতে ভীষণ অবাক হয়ে যায়। তার মধ্যে কি এমন আছে যা দেখে লুই তার প্রেমে পড়েছে? কিন্তু জেফের মধ্যে একটা আশ্চর্য পৌরুষ আছে, সুন্দর দেখতে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধির সাহচর্য। স্বামী হিসেবে তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

বিয়ের প্রস্তাব পেতেই জেফ সত্যিই চমকে উঠেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও একটা সুপ্ত বাসনা ইতিমধ্যেই উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। কতদিন আর সে বানজারা জীবন যাপন করবে? এবার তো তাকে ঘরসংসার গুছিয়ে নিতে হবে।

তিনদিন বাদে তাহিতির এক গির্জাতে গিয়ে হল্যান্ডারের সাথে জেফের বিয়ে হয়ে গেল।

নিউ ইয়র্কে ফিরে আসার পর লুই হল্যান্ডারের অ্যাটর্নি স্কট ফোগটি জেফকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত নিরুত্তাপ এই ভদ্রলোক। হাসি শব্দটার মানে বোধহয় ভুলে গেছেন।

তিনি জানালেন–একটা কাগজে আপনাকে সই করতে হবে।

জেফ জানতে চাইল–কী কাগজ?

–এটা একটা না-দাবীপত্র। এতে লেখা আছে যদি ভবিষ্যতে আপনার সাথে হল্যান্ডারের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তাহলে আপনি সম্পত্তির ব্যাপারে কোনোভাবেই নাক গলাতে পারবেন না এবং...

অ্যাটনীর কথা শেষ হবার আগেই জেফ বলল–দিন কোথায় সই করতে হবে। আমি টাকার জন্য ওকে বিয়ে করিনি।

অ্যাটর্নী একটু আশ্চর্য হয়ে দলিলটা বাড়িয়ে দিলেন, সই করে নীচে নেমে এল জেফ, ড্রাইভার সমেত একটা দামী গাড়ি তাকে দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে বসে মনে মনে সে ভাবতে লাগল, আমি হলাম এক নাম করা প্রতারক, আর কত সহজে এই দামী পত্রটা সই করে দিয়ে এলাম। কিন্তু, মানুষ যে কখন কোথায় কি অভিনয় করে কেউ তা জানে না।

নাম করা দর্জির দোকান থেকে দারুণ সুট তৈরি করা হল। জেফের চেহারা তখন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এমন কি লুই-এর তিন-চারজন বান্ধবী জেফের সাহচর্যে আসতে চাইছে।

লুই-এর দাদা বাজ হল্যান্ডারের সুপারিশে জেফকে নিউইয়র্কের বিখ্যাত পিলগ্রিম ক্লাবের সদস্য পদ দেওয়া হল। বাজ একটু মোটাসোটা মাঝবয়েসী পুরুষ। হারভার্ড ফুটবল টিমে দারুণ ব্যাক ছিল। এখনও জাহাজ আছে। আছে মাংস প্যাক করার কোম্পানী। আরও ছোট ছোট ব্যবসা। জেফ স্টিভেন্সকে সে কখনই পছন্দ করে না। কিন্তু বোনের মুখের ওপর না বলতে পারছে না।

বারবার সে বলতো–তুমি আমাদের বংশের ঠিক উপযুক্ত নও। যতদিন আমার বোন তোমাকে পছন্দ করবে ততদিন পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু মনের থেকে তোমাকে যদি

অপছন্দ করতে শুরু করে তাহলে জেফ আমিও আর তোমার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবো না।

বাজ হল্যান্ডারের এই গা জ্বালা কথাগুলো জেফের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুখে সে কিছু বলেনি।

পিলগ্রিম ক্লাবের বাজের বন্ধু-বান্ধবরাও ওকে নিয়ে ঠাট্টা হাসি করতো। জেফ কিন্তু সহজ সরল ভাবে কার্নিভালের গল্পগুলো বলতো। মাঝেমধ্যে সেখানে রঙ চড়াতো, সবাই এসব গল্প শুনে খুব মজা পেতো।

জেফ আর লুই থাকতো ম্যানহাট্টনের পূর্ব দিকে। কুড়িটা ঘরওয়ালা একটা বিশাল বাড়িতে। ঘরে অসংখ্য চাকর-বাকর। এছাড়া লং আইল্যান্ড, বাহামা দ্বীপ, কর্ডিনিয়া আর প্যারিসেও লুই-এর. বড়ো বড়ো বাড়ি আর ফ্ল্যাট আছে। আছে ব্যবহার করার জন্য দশ। বারোটি গাড়ি।

কিছুদিন এইভাবে কেটে গেল, একদিন সকালে হাই তুলতে তুলতে জেফ বলল লুই, কতদিন আর বসে বসে তোমার অন্ন ধ্বংস করবো? লোকে তাহলে বলবে কি? আমাকে গায়ে-গতরে কিছু করতে দাও।

শেষ পর্যন্ত লুইকে রাজী করাতে পারলো জেফ। বাজকে বলতেই জেফকে তার শেয়ার কেনাবেচার ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

উপার্জনের একটা ভালো ব্যবস্থা হয়েছে, এবার বাচ্চা চাই।

লুই রাজী হয়েছে। একদিন পিলগ্রিম ক্লাবে বাজের সঙ্গে জেফ ডিনার খাচ্ছে, বাজের পার্টনাররাও আছে।

বাজ ঘোষণা করলো–এবারের বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে আমরা মাংস প্যাকিং-এর ব্যবসাতে প্রায় চল্লিশ শতাংশ লাভ করেছি।

একজন পার্টনার হাসতে হাসতে বলল, তুমি ইন্সপেকটরকে ঘুষ দিয়েই তো এসব । করেছে। বাজে মাংস কিনে তার ওপর এ ক্লাশ মাংসের ছাপ লাগিয়ে নিয়েছে।

জেফ এতটা ভাবতে পারেনি–আরে ওই মাংস তো বাচ্চারা পর্যন্ত খাবে, কি সর্বনাশ, বাজ, ওই ভদ্রলোক নিশ্চয় ঠাট্টা করে এসব বলছে।

বাজ দাঁত বের করে হাসতে শুরু করে দিল। বলল–দেখো কার মুখে কোন নীতির বুলি।

পরের তিন মাসে জেফ গোপন কারবারের আরও অনেক গোপন খবর পেল। জেফ বুঝতে পারলো কালো পথ কোথায় চলে গেছে।

জেফ মনে মনে ভাবলো এরা সব ভদ্রলোক, কিন্তু এখন বুঝতে পারলো এরা সব জোচ্চোর, বউয়েরা সবকিছু জেনে চুপ করে আছে। স্বামীদের টাকায় ফুর্তি করছে। আর লোক ঠকিয়ে চলেছে।

একদিন জেফ সব কথা লুইকে বলল।

হাসতে হাসতে লুই বলল, জেফ বেশি সরল হবার চেষ্টা কোরো না। জীবনটাকে উপভোগ করছো করে যাও।

জেফ বিন্দুমাত্র সরল লোক নয়। কিন্তু লুইকে ভালেবেসে বিয়ে করেছে, লুইকে সঙ্গিনী করে ভবিষ্যৎ জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাবে–সত্যি সত্যি এমন একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সে।

অন্যদিকে মন চাইল–আমাদের একটা বাচ্চা হোক, তোমার একটা আমার একটা, একবছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

জেফের গায়ে হাত বুলিয়ে লুই বলল–একটু ধৈর্য ধরো লক্ষ্মীটি, আমি ডাক্তার দেখিয়েছি, এবার তুমি একবার দেখিয়ে নাও।

জেফও ডাক্তার দেখালো, সেও ঠিক আছে, তবু বাচ্চা আসে না কেন?

একদিন সকালে মাথাব্যথা করছিল জেফের। লুই-এর ওষুধের বাক্সে অ্যাসপিরিন খুঁজতে গেল। সেখানে একগাদা গর্ভনিরোধক পিল দেখতে পেল।

জেফ বুঝতে পারলো, ব্যাপারটা আসলে কি। দুপুরে ক্লাবে গিয়ে টেবিলে না বসে আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়েছিল, বাজ এলে খাবার টেবিলে যাবে এমনই ইচ্ছে ছিল তার। ০ হঠাৎ জেফের কানে শব্দ ভেসে এল, কারা যেন লুইকে নিয়ে কথা বলছে। লুই যে..

বহুচারিণী এবং ইতালীয়ান বাবুর্চির সঙ্গেও যে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে একথাটা জেফের কানে গেল। সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। অবাধ ব্যাভিচারের পথ প্রশস্ত রাখতেই লুই নাকি জেফের মতো কার্নিভালের লোককে বিয়ে করেছে এমন কথাও শুনতে পেল।

বাড়ি ফেরার পথে জেফ প্রতিজ্ঞা করলো, আগে এই ইতালীয়ান বাবুর্চিটাকে সে খুন। করবে, পরে লুইকে হত্যা করবে। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে যে লুইকে ভালোবাসতো জেফ সেই লুই কিনা এই প্রতিদান দিচ্ছে?

শেষ অবধি মাথা ঠান্ডা করল জেফ। বাজ, এডজেলার, মাইক কুইন্সি আর তাদের বৌরা নিশ্চয় আড়ালে-আবডালে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু এখনই ভেঙে পড়লে চলবে না। অন্য একটা পথ বের করতে হবে। সে লুই-এর সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে চলল।

পরের সপ্তাহে জেফ বুদ্ধি খেলিয়ে একটা প্লান বের করল। সময় বুঝে ক্লাবে লাঞ্চ করার সময় বলল–কম্পিউটার নিয়ে জালিয়াতি হয় সে সম্বন্ধে তোমরা কি জানো?

একজন বলল–কেন তুমি কিছু করতে চাও নাকি?

–আমি কিন্তু এ ব্যাপারে ঠাট্টা করছি না, এটা একটা বড়ো সমস্যা। এর সাহায্যে ব্যাঙ্ক আর বীমা কোম্পানীগুলিকে কোটি কোটি টাকা ঠকানো হচ্ছে জানো কি? সম্প্রতি একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে এমন একটা কম্পিউটার তৈরি করেছে যাতে জালিয়াতি করা যায় না।

মাইক কুইন্সি জানতে চাইল তুমি কি চাও লোকটার পেছনে আমরা টাকা ঢালি?

–সত্যি কথা বলতে কি ওকে মদত দেবার জন্য আমি টাকার জোগাড়ে বেরিয়েছি। আমি জানতে চাইছিলাম কম্পিউটার সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো কি না?

–আমরা কিছুই জানি না, তবে কেউ যদি আবিষ্কার কিছু করে তাহলে তাকে আমরা মদত দিতে পারি। বাজের কথা শুনে অন্য বন্ধু-বান্ধবরা হো হো করে হেসে উঠলো।

দুদিন বাদে জেফ বলল–দুঃখিত আজ তোমাদের টেবিলে বসতে পারছি না, আমার এক অতিথি আসবেন, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ওয়েটার সাদা চুল, আধবুড়ো এক বৃদ্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

মাইক কুইন্সি বলল–হ্যায় ভগবান, উনি, প্রফেসার অ্যাকারমান।

–অ্যাকারমান কে?

–বাজ তুমি কি ফাইনান্স রিপোর্ট পড়োনি? পড়লে জানতে, উনি প্রেসিডেন্টের জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের সভাপতি। আমাদের দেশের সব থেকে বড়ো বিজ্ঞানী।

–আমার শালার সাথে ওঁর কি কাজ থাকতে পারে? জেফ আর অধ্যাপক লাঞ্চ খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছিলেন, বাজ এবং তার বন্ধুরা ক্রমশ ছটফট করতে শুরু করেছে। প্রফেসার চলে যেতেই বাজ জেফকে ডাকলো এই যে লোকটা কে?

জেফ অপরাধীর মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বলল তুমি অ্যাকারমানের কথা বলছো?

–হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?

–আমাদের..., বাজের বন্ধুরা জেফের দিকে তাকিয়ে আছে।

–আমি ওঁর সম্বন্ধে একটা বই লিখবো ভাবছিলাম।

–তুমি কি লেখক?

–না, লিখতে তো পারি!

তিনদিন বাদে জেফের সঙ্গে অন্য এক ভদ্রলোক লাঞ্চ খেলেন। বাজ ওকে চিনতে পেরেছে-উনি তো সেমুর জ্যারেট, কারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার কোম্পানির চেয়ারম্যান। জেফের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক হল কি করে?

দেখা গেল এবারও জেফ খুব অন্তরঙ্গভাবে সেমুর জ্যারেট-এর সঙ্গে কথা বলছে।

–জেফ, ঠিক করে বলো তো জ্যারেটের সঙ্গে তোমার কি কাজ?

জেফ বলল–কিছু না, একটু গল্প করছিলাম, বলতে বলতে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বাজ বলল–অত তাড়াহুড়োর কি আছে, সেমুর জ্যারেট ভীষণ ব্যস্ত মানুষ ত, অকারণে উনি তোমাকে এতটা সময় দেবেন না। ঠিক করে বললো তো?

জেফ বলল–সত্যি কথাটাই বলছি, সেমুর ডাকটিকিট জমায়। একটা খুব দামী ডাকটিকিট ওঁকে জোগাড় করে দিতে হবে, তাই আমাকে অনুনয় বিনয় করছিলেন।

–এই তোমার সত্যি কথা..., মনে মনে ভাবলো বাজ।

পরের দিন চার্লস বার্লেটের সঙ্গে ক্লাবে জেফ লাঞ্চ খাচ্ছিল। বার্লেট হলেন বেসরকারী পুঁজি লগ্নিকরার সবচেয়ে বড়ো সংস্থা বার্লেট অ্যান্ড বালেট কোম্পানীর সভাপতি। দুজনকে প্রায় মুখে মুখ ঠেকিয়ে কথা বলতে দেখে বাজ, অ্যাডজেলার, অ্যালান আর মাইক অবাক হয়ে গেল।

–তোমার শালা দেখছি উঁচু মহলে ঘোরাফেরা করছে এখন। কী ব্যবসা কাঁদছে, এডজেলার প্রশ্ন করল।

–জানি না, তবে জানতে হবে, জ্যারেট আর বার্পেটের মতো লোকেরা যখন ঝুঁকেছেন তখন বুঝতে পারছি মোটা অঙ্কের খেলা হবে।

ওরা দেখল বার্টে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে জেফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন।

–বোসো জেফ। তোমার সঙ্গে কথা আছে। বাজ হাত ধরে বসালো জেফকে।

–অফিস যেতে হবে, কাজ আছে। জেফ বসতে চাইছে না।

–কাজ? তুমি আমার অফিসেই কাজ করো আর আমাকেই কাজ দেখাচ্ছো?

–জেফ বলল–বল, কী কথা শুনতে চাইছো?

–কার সাথে লাঞ্চে খাচ্ছিলে?–আমার পুরোনো বন্ধুরা।

–চার্লি বার্লেট তোমার পুরনো বন্ধু?

–ওই আর কি?

–কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল?

–চার্লি পুরনো গাড়ি পছন্দ করেন। আমি ওঁকে প্যাকার্ড গাড়ি পাইয়ে দেব বলেছি।

এবার বাজ বলল–জেফ আর বাজে বোকো না, তুমি গাড়ি বিক্রি করো না, বই তুমি কোনোদিন লেখো না। আসল ব্যাপারটা খুলে বলোত।

জেফ আমতা আমতা করতে থাকে–মানে, মানে?

–তুমি টাকা জোগাড়ের ধান্দায় আছো তাই না জেফ? অ্যাডজেলার জানতে চাইল।

একটু ঘাবড়ে না গিয়ে তাড়াতাড়ি জেফ বলল–না।

বাজ তার মোটা হাতটা জেফের ঘাড়ে রেখে বলল–কি হচ্ছে জেফ এসব? আমাকে। সব কথা খুলে বলো? এক পরিবারের লোক আমরা।

তারপর খুব দরদ মেশানো গলায় বাজ বলল–ওই অল প্রফ কম্পিউটারের বিষয়?

জেফ এবার সত্যিই ধরা পড়ে গেছে। বাজ আর তার বন্ধুরা উল্লাসিত।

বাজ বলল–তুমি কেন বলোনি প্রফেসর আকারমান এর সঙ্গে যুক্ত আছেন?

–আমি ভেবেছিলাম তোমরা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

–ভুল ভেবেছিলে, পুঁজির দরকার হলে আমরা সকলেই সাহায্য করবো। তুমি এত কিন্তু কিন্তু করছো কেন?

বাজের কথার মধ্যে সহানুভূতি ঝড়ে পড়ছে।

চালাক জেফ বলল–আমার আর প্রফেসারের পুঁজির দরকার নেই। জ্যারেট আর বালেট...

জেফের মুখের কথা টেনে বাজ বলল–ওঁরা দুজন এক নম্বরের শয়তান, ওঁদের শয়তানিতে তুমি যেন ফেঁসে যেও না।

অ্যাডজেলার বলল–জেফ, বন্ধুদের মধ্যে লেনদেন করলে ভয়টা থাকে না।

–কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গেছে।

–সইসাবুদ হয়ে গেছে কী?

–কথা দিয়েছি।

–ওরকম অনেক কথা দেওয়া হয়, গুলি মারো তো।

–তোমাদের সাথে ও নিয়ে আলোচনা করাই ভুল হয়েছে, জেফ প্রতিবাদের সুরে বলল, এই ব্যাপারে প্রফেসর অ্যাকারমানের নাম উল্লেখ পর্যন্ত করা যাবে না।

–তা আমরা জানি, মাইক বলল–প্রফেসর কি মনে করেন জিনিসটা কাজ দেবে?

–উনি এ ব্যাপারটা বার বার পরীক্ষা করেছেন।

একটু বাদে বাজ জানতে চাইল–প্রথমে কত টাকা লগ্নী করতে হবে?

–বিশ লাখ ডলার দরকার। শুরু করতে গেলে আড়াই লাখ হলেই চলবে। বালেট কথা দিয়েছেন–

আবার সেই বালেট, বাজ ঝাঁঝিয়ে উঠল–ওই টাকাটা আমরা দিতে পারবো।

কাগজ কলম আনার কথা বলা হল। চুক্তিটা ওখানেই করতে হবে। বাজ বলল কাল সকালে তোমাকে আড়াই লক্ষ ডলার দিয়ে দেবো।

জেফ বলল–বাজ আমি যে বার্লের্টকে কথা দিয়েছি।

–বালেটকে গুলি মারো, তুমি কার বোনকে বিয়ে করেছো? নাও লেখো।

–কিন্তু বাজ এখনও জিনিসটাকে আমরা পেটেন্ট করাইনি, শেষ ক্ষীণ আপত্তি জানানোর চেষ্টা করল জেফ।

–বাজে কথা ছেড়ে সইটা করো তো।

বাজ জেফের হাতে কলমটা ধরিয়ে দিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জেফ লিখতে শুরু করল–এতদ্বারা আমি SUCABA নামের একটি গণনাকারী কম্পিউটার সম্পর্কিত আমার সমস্ত অধিকার, স্বত্ব, স্বামীত্ব দান করছি ডোনাল্ড বাজ হল্যান্ডার, অ্যাডজেলার, অ্যালান টমসন এবং মাইক কুইন্সিকে, আড়াই লক্ষ ডলারের বিনিময়ে।

জেফ সই করে কাগজটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল–ঠিক আছে তো সবকিছু? এসব ব্যাপার আমি ভালো বুঝি না।

–দাও এর একটা কপি করে দিই। কপি করা হল, সবাই সই করল।

পরদিন সকালে আড়াই লাখ ডলারের চেক পেয়ে গেল জেফ।

বাজ জানতে চাইল-কম্পিউটার কোথায়?

–দুপুরবেলা ওটা ক্লাবে পৌঁছে যাবে, সকলে একসঙ্গে দেখুক এটাই আমার মনোগত বাসনা।

ঠিক দুপুর বারোটার সময় একজন এসে বাজদের টেবিলে দেখা করল। জিনিসটা সে সঙ্গে এনেছে। ছোট্ট প্যাকিং বাক্স দেখে বাজ আর তার বন্ধুরা খুবই খুশি হয়েছে। খুব সাবধানে মোড়কটা খুলল। ভেতরে কাঠের একটা চৌকো ফ্রেম। অনেকটা প্লেটের মতো, মধ্যেটা ফাঁকা, তার লাগানো আছে। বড় বড় পুঁতির মতো জিনিস গাঁথা।

আরে এটা তো একটা অ্যাবাকাস–চীন দেশে এটা দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা হয়।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যালান টমসনের–আরে SUCABA হল উল্টো করে লেখা ABACUS। এটা কী ধরনের রসিকতা?

ঠিক হল এখনই ব্যাঙ্কে ফোন করা হবে, চেকটার পেমেন্ট বন্ধ করতে হবে। ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে জানা গেল জেফ স্টিভেন্সকে সকালেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে জেফ স্টিভেন্স নাকি জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর শেষপর্যন্ত প্রফেসার ভেরমান অ্যাকারমানের ঠিকানাতে ওরা পৌঁছলো।

উনি বললেন, জেফ স্টিভেন্স খুব ভালো লোক, আমাকে নিয়ে একটা বই লিখবেন বলে কথা দিয়েছেন।

সেমুর জ্যারেট প্রথমে মুখ খুলতে রাজী হননি। পরে বললেন–জেফ স্টিভেন্স আমাকে একটা দুলর্ভ ডাকটিকিট দেবেন।

চার্লি বার্লেটও জানালেন–জেফ ১৯৩৭ সালের একটা প্যাকার্ট গাড়ির সন্ধান দিয়েছেন। বাজ আর তার বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা করলো যে করেই হোক জেফকে জেল খাটাতে হবে। তারা অ্যাটর্নীর কাছে ছুটল। অ্যাটর্নী সই করা চুক্তি পটাতে ভালো ভাবে চোখ বুলিয়ে পরীক্ষা করলেন। দুঃখিত মুখে তিনি জানালেন–কিছুই করা যাবে না।

রেনোতে গিয়ে লুইয়ের বিরুদ্ধে জেফ ডিভোর্স নিল। সেখানে গুছিয়ে বসবাস করতে করতে তার সঙ্গে আলাপ হল কোনরাড মরগানের। একসময় কোনরাড উইলিকাকার কার্নিভালে কাজ করতো। কোনরাড বলেছিল–একটা ছোট্ট উপকার আমার করে দিতে হবে। নিউ ইয়র্ক থেকে একটা মেয়ে ট্রেনে চেপে সেন্ট লুই যাচ্ছে, তার সঙ্গে কিছু দামী জিনিসপত্র থাকবে।

ট্রেনের জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ট্রেসির মুখখানা ভেসে উঠল। জেফের ঠোঁটের কোণে তখন ফুটে উঠেছে ক্রুর হাসির চিহ্ন।

.

নিউ ইয়র্কে ফিরে ট্রেসি। এল কোনরাড মরগানের জুয়েলারীর দোকানে। ভেতরে ঢুকে বসার পর কোনরাড বলল–তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম, সেন্ট লুই স্টেশনে অনেক অপেক্ষা করার পরেও

–সেন্ট লুইতে তুমি যাওনি।

–কি বললে, আমি যাইনি?

–যাবার কোনো পরিকল্পনা তোমার ছিল না। তুমি দুজন ঠগ প্রতারককে পাঠিয়েছিলে আমার কাছ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে আনার জন্য।

হতভম্ব কোনরাড বলল–তুমি কী বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–প্রথমে ভেবেছিলাম কথাটা তোমার এখান থেকেই ফাস হয়ে যাবে। পরে বুঝলাম এটা তোমার কাজ। তুমি নিজের হাতে আমার ট্রেনের টিকিটটা কেটেছে। তাহলে অন্যেরা কী করে আমার কামরার নম্বর জানবে? আমি ছদ্মবেশে ছদ্মনামে ট্রেনে গিয়েছিলাম।

–তুমি কি বলতে চাইছো ট্রেসি, গয়নাগুলো কেউ কি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে?

–না, শেষ পর্যন্ত পারেনি, তোমার দোস্তরা প্লেন ধরতে ব্যস্ত ছিল। ওগুলো তো আমার কাছেই রয়ে গেছে।

কোনরাড চুলে গেল, একটু বাদে আবার ফিরে এল, মুখে হতাশার ছাপ–দুঃখিত ট্রেসি, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, তুমি দারুণ চালাক মেয়ে, ঠিক আছে পঁচিশ হাজার ডলার তোমার পাওনা হয়েছে, গয়নাগুলো দাও। ট্রেসি বলল–না পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক টাকা কম হলে চলবে না।

–কি বললে?

–একই জিনিস আমাকে দু-দুবার চুরি করতে হয়েছে। প্রত্যেকবারের পারিশ্রমিকের জন্য আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার চাইছি।

–না অতো দিতে পারবো না।

–ঠিক আছে লাস ভেগাসে ওই গয়নার খদ্দের পেতে আমার এক মুহূর্ত দেরী হবে ।

ট্রেসি উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

–পঞ্চাশ হাজার?

ট্রেসি ঘাড় নাড়লল, হ্যাঁ, ওই টাকাটা পেয়ে ট্যাক্সিতে বসার পর আমি তোমাকে একটা স্টেশনের লকারের চাবি দেবো যেখানে গয়নার থলিটা রাখা আছে।

ট্যাক্সিতে বসে ট্রেসি বলল–ধন্যবাদ মিঃ মরগান, তোমার সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে অনেক আনন্দ আছে।

.

১৯.

ড্যানিয়েল কুপার আগে থাকতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। লুই বেলামির বাড়িতে চুরির ব্যাপারে তাদের সকলকে ডেকে পাঠানো হবে। জে. জে. রেনল্ডের অফিসে এই মিটিংটা শুরু হয়েছে।

মিটিং চলছে, রেনল্ড খোঁচা দিতে ছাড়লেন না–অপরাধী ধরার ব্যাপারে ড্যানিয়েলের সুনাম আকাশ ছোঁয়া। সবসময় কেন সে যে পাচার মতো মুখ করে বসে থাকে।

রেনল্ড বলছিলেন–বেলামির বাড়ির চুরির রিপোর্ট তো তোমরা শুনলে, আরেকটা খবর জেনে নাও, বেলামি আমাদের পুলিশ কমিশনারের কাজিন। কমিশনার কিন্তু ব্যাপারটাতে খুবই চটে আছেন।

একজন জানতে চাইল–পুলিশ কী করেছে?

রেনল্ড জবাব দিলেন, পুলিশ এই ব্যাপারটার কিছুই করতে পারেনি। চোরের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলা হোল, বলেছিলেন পুলিশ কর্তা। কিন্তু চোরটাকে ধরতে পারেনি।

–মেয়েটার বর্ণনা কেমন?

–নাইট ড্রেসটাই ওরা দেখেছিল ভালো। তাছাড়া, চুলে চুল কুঁচকোবার ক্লিপ আঁটা ছিল, তাই রংটা জানা যায়নি। মুখেও পুরু করে ক্রীম জাতীয় জিনিস মাখা ছিল তাই রং বা অন্য কিছু বোঝা যায়নি।

ড্যানিয়েল বলল হ্যাঁ জানতে পেরেছি।

সবাই চমকে উঠল।

–আমি মেয়েটাকে চিনি।

ড্যানিয়েল কুপার তার রিপোর্ট পড়ে শোনালো। আমি শুধু যুক্তি দিয়ে কাজ করি। প্রথমেই চলে গেলাম লং আইল্যান্ডে। জায়গাটা এমন যে গাড়ী না হলে ওখানে সহজে পৌঁছনো যায় না। গাড়ী ভাড়া দেওয়া কোম্পানীগুলোতে হানা দিলাম। না না, আমায় বাধা দেবেন না, মেয়েরা খুব কম গাড়ী ভাড়া নেয়। মেয়েটির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন একটি মেয়ে বাজেট রেন্ট কোম্পানী থেকে গাড়ী নিয়েছিল খবর পেলাম। রাত আটটায় নিয়ে দুটোতে ফেরত দিয়েছে।

–এটাই যে চুরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ কী? রেনল্ড সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

–শুনুন গাড়ীটার মাইল মিটার চেক করে দেখেছি যেতে ৩২ আর আসতে ৩২ মোট ৬৪ কিমি. উঠেছে। এখান থেকে যে লং আইল্যান্ড ৩২ কিমি সে তো আপনারা জানেন। গাড়ীটা এলেন ব্রাঞ্চের ছন্দনামে নেওয়া হয়েছিল।

এতদূর এগিয়ে গেছে ওই ডিটেকটিভ, রেনল্ড বুঝতেই পারছেন না।

ডিটেকটিভ বলল–ওর আসল নাম ট্রেসি হুইটনি।

কে একজন বলল–এটা কি করে জানলে?

–গাড়ী ভাড়া নেবার সময় একটা ফ্রম ভারতে হয়, সেটাতে আঙুলের ছাপ আছে, আমি সদ্য ছাড়া পাওয়া অপরাধীদের ছাপ মেলাতে গিয়ে ধরে ফেললাম। ওকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বছর খানেক আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

রেনল্ড বললেন, তুমি বলেছিলে মেয়েটা নিরপরাধ।

–তখনও পর্যন্ত ছিল, এখন আর নেই।

রেনল্ড মনে মনে ভাবলেন হারামজাদীটা আবার আমাদের ওপর টেক্কা দিল। মুখে বললেন–তাহলে ওকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করা দরকার।

–কিসের অপরাধে? গাড়ী ধরা পড়ার জন্য? এবারে ওর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। তবে ও আবার কিছু করলে তখন ওকে আমি ছাড়বো না।

দাঁতে দাঁত চেপে কুপার বলল।

ড্যানিয়েল তার কালো খাতাটা বের করে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখল–ট্রেসি হুইটনি। সকলে জানে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ড্যানিয়েল বার বার এই নামটা উচ্চারণ করবে।

.

২০.

হোটেলের ঘরে বসে ট্রেসি চিন্তা করছিল। এখন আবার তাকে নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে হবে। আর্নেস্টাইন আর অ্যামির কথা মনে পড়লো, একটা খেলনা কিনে পাঠালো অ্যামির নামে। আড়াইশো ডলার পাঠালো আর্নেস্টাইন লিটলচ্যাপের নামে।

এবার সে ঋণমুক্ত, যেখানে খুশি যেতে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। দামী হোটেলের ঘর থেকে সেন্ট প্যাট্রিক গির্জা আর জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। তার অত্যন্ত প্রিয় আর পরিচিত শহরকে এখন বিদায় জানাতে হবে।

শেষপর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে লন্ডনে যাওয়াটাই ঠিক করলো সে।

টেলিভিশন খুললো, দুজন লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েত দেশে কৃষ্ণসাগরের তীরে। সোচি শহরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় দুজনে মুখোমুখি হতে চলেছে।

ট্রেসি দাবা খেলার কিছুই জানে না, টিভি বন্ধ করে দিল। ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ট্রেসি গেল এক ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসে। কুইন এলিজাবেথ জাহাজে একটা দামী কেবিন বুক করল।

দামী দামী জিনিসপত্র কিনে যাত্রার দিন জাহাজ ঘাটে পৌঁছে গেল। দেখল রিপোর্টাররা ছেকে ধরেছে দুজন দাবাড়ুকে, মেলনিকভ আর নেগুলেস্কো। বার বার ফটো উঠছে। কোনোরকমে নিজের কেবিনে গিয়ে উঠল ট্রেসি। মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে বাইরে এল।

অনেকে এসেছে প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে। ট্রেসির চোখ দুটি হঠাৎ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তাকে ভালোবাসার কেউ নেই।

মনে মনে হাসলো, কেন বিগবার্থা? হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল।

যাত্রার দ্বিতীয় দিন ডাইনিং কারে গিয়ে বসেছে তখন ট্রেসি, কে যেন তার দিকে হাত তুলে ডাকল তাকে।

ট্রেসি মুখ তুলল, এফ. বি. আই-এর সেই জাল অফিসার টম বাওয়ার্স। ট্রেসির অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, না না, এসব দিনগুলোকে ভুলতে হবে।

–কী আশ্চর্য ব্যাপার, আমি আপনার টেবিলে বসতে পারি?

–বসুন।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে লোকটি বলল, মানে বলছিলাম কি আমরা এখন তো বন্ধু হয়ে উঠতে পারি। বিশেষ করে যখন আমাদের একই উদ্দেশ্য।

ট্রেসি বলল কি বলছেন মিঃ বাওয়ার্স?

–না বাওয়ার্স না, আমার আসল নাম জেফ স্টিভেন্স।

–তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

–দাঁড়ান, আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলার আছে আমার।

–বলার কিছুই নেই, একটা বোকা হাঁদা বাচ্চাও ওটা বুঝতে পারতো।

–কোনরাড মরগানের একটা উপকার আমাকে করতে হয়েছিল, জেফ একটু হাসলো, তবে ও আমার ওপর চটে আছে।

–আমিও চটে আছি, জাহাজে কেন উঠেছেন?

–আপনার যা মতলব আমারও তাই, ম্যাক্সি মিলিয়ান পিয়ের পন্ত তো এই জহাজেই চলেছে।

–সে কে?

–তার মানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষটাকে আপনি চেনেন না সে কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

–এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আমি চললাম।

ট্রেসি শান্তি চায়, আর কোনো ঝামেলায় নিজেকে জড়াবে না সে।

রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, ডেকে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রেসি। মাথার ওপর তারার চুমকী বসানো কালো ভেলভেটের সামিয়ানা। নীচে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোের

ঝিকিমিকি। পাশে কে এসে দাঁড়াল এই পরিবেশে আপনি কী অসামান্য সুন্দরী হয়ে উঠেছেন–আপনি কী তা জানেন?

ট্রেসি বলল–কেন আপনি আমার কাছে আসেন বলুন তো?

ট্রেসিকে চলে যেতে দেখে জেফ বলল–একটা কথা, পিয়ের পন্ত এ জাহাজে যাচ্ছেন না, শেষ মুহূর্তে মত পাল্টিয়ে প্লেন ধরেছেন।

–আহারে, তাহলে আপনার পুরো খরচটাই তো বাজে হয়ে গেল–হুল ফুটিয়ে বলল ট্রেসি।

–তা কেন? ট্রেসির শরীর জরিপ করতে করতে জেফ বলল, জাহাজে কিছু উপার্জন হলে কেমন হয়?

–এত বেপরোয়া কি করে হয় মানুষ? মনে মনে ট্রেসি ভাবল। তারপর বলল–জাহাজ লুঠ করে পালাতে হলে প্লেন বা সাবমেরিন দরকার, সেটা কী আপনার পকেটে লুকোনো আছে?

-লুঠ করার কথা তো বলিনি, আপনি বরিস মেলনিকভ কিংবা পিয়েতর নেগুলেস্কোর নাম শুনেছেন তো? এঁরা রাশিয়া যাচ্ছেন চ্যাম্পিয়ানশিপের ম্যাচ খেলতে। ওদের সঙ্গে খেলার বন্দোবস্ত করতে পারলে কেমন হয়?

–হতে পারে, কিন্তু আমি দাবার অ আ ক খ জানি না।

এবার জেফের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। সে বলল–এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো।

–আপনার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, ডাক্তার দেখান।

পরদিন সকালে ডেকে পা দিতেই মেলনিকভের সাথে ধাক্কা লেগে গেল। ট্রেসি ছিটকে পড়ে গেল ডেকে।

গর্জে উঠলেন মেলনিকভ–দেখে হাঁটবেন তো, আরও কিছু খারাপ কথা বললেন তিনি।

ট্রেসি মনে মনে ভীষণ অপমানিত বোধ করল।

কেবিনে ফিরে এসে দেখলো জেফ স্টিভেন্সের কাছ থেকে ছটা, ডাক এসেছে। দেখা করার চিরকুটগুলো ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিল সে।

সন্ধ্যের দিকে বারে গেল ট্রেসি। পিয়েতর নেগুলেস্কো আগে থেকেই সেখানে বসেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে গায়ে পড়ে ভাব জমালেন। ট্রেসির জন্য মদের অর্ডার দিলেন।

বললেন–জানো তো, আমি কে?

ট্রেসি ঘাড় নেড়ে মিষ্টি হেসে বলল–জানি।

–জানতেই হবে, আমি হলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু।

ভদ্রলোক ট্রেসির গায়ে হাত দিয়ে একটা কু-প্রস্তাব করে বসলেন। ট্রেসির সমস্ত শরীর তখন অপমানে ঝা ঝা করছে।

জেফের সঙ্গে দেখা করতে গেল সে।

–কী ব্যাপার? জেফ জানতে চাইল।

ট্রেসি ঝোঁকের মাথায় বলল–মেলনিকভ আর নেগুলেস্কোর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন এখনও তাই ভাবছেন নাকি?

জেফ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ট্রেসির মনের এই পরিবর্তন কেন হল?

–দুজনকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

–ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার প্ল্যান মাফিক এগোই, পরবর্তীকালে আপনাকে আমি সব কিছু জানাবো।

জেফ বরিস মেলনিকভকে বোঝাচ্ছে, এই মেয়েটা ছদ্মনামে এই জাহাজে যাচ্ছে, ও দারুণ দাবা খেলে, ও বলেছে আপনাকে তুড়ি মেরে হারাবে।

এতক্ষণ মেলনিকভ মেয়েদের মগজে কিছু নেই বলেই কপচাচ্ছিলেন, নানাভাবে জেফের প্রস্তাব উড়িয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু এখন তার আঁতে ঘা লাগল। জেফ এবার শেষ চালটা, দিল–মেয়েটা আপনার এবং পিয়েতর নেগুলেস্কোর সঙ্গে একসাথে খেলতে চায়। হেরে গেলে দশ হাজার ডলার দেবে।

কি...কি..বলছে মেয়েটা? আমাদের দুজনের সঙ্গে একসাথে খেলবে? ওর মাথা খারাপ হয়নি। তো?

–না...ভেবে দেখুন দুজনকেই দশ হাজার করে ডলার দেবে। যে দেশে বলবেন সেখানেই টাকাটা জমা দেওয়া হবে।

এই কথা শুনে বরিসের চোখে লোভের আভা ফুটে উঠেছে–এ ধরনের পাগলী মেয়ের নাম তো আমি জীবনে শুনিনি।

–বরিস জানতে চাইলেন, মেয়েটা কোন দেশের?

–আমেরিকান।

–তাই বলুন, ওখানকার বড়োলোকগুলো পাগল হয়।

জেফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঠিক আছে, মেয়েটা পিয়েতর নেগুলেস্কোর সঙ্গে খেলুক।

–নেগুলেস্কোর সঙ্গে মেয়েটা খেলবে?

বরিসের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।

–বলছিলাম ও দুজনের সঙ্গেই খেলতে চাইছে, আপনি যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান তাহলে আলাদা কথা।

বরিস চিৎকার করে উঠলেন বরিস মেলনিকভ ভয় পায় না। আমি মেয়েটাকে একেবারে শেষ করে দেবো। বলুন কবে খেলতে হবে?

জেফ বলল–মেয়েটির ইচ্ছে শুক্রবার, মানে শনিবারই তো আমরা ইংল্যান্ডে পৌঁছে যাচ্ছি।

–তিনটের সময় খেলা হবে।

–নিস্পত্তি একটা খেলাতেই হবে।

–আর বাজী দশ হাজার।

–আর একটা কথা, আপনি হেরে গেলে এক পয়সাও দিতে হবে না। শুধু সইকরা একটা ফটো উপহার দেবেন মেয়েটিকে। আপনি জিতলে দশ হাজার পাবেন। ড্র করলে কিছুই পাবেন না।

–বাজীর টাকা থাকবে কার কাছে?

–জাহাজের ক্যারিয়ারের কাছে।

–ঠিক আছে, শুক্রবার রাতে খেলবো।

পরদিন জেফ নিয়ে পড়লো নেগুলেস্কোকে। তিনিও প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না। তারপর দশ হাজার ডলারের বাজীর কথা শুনে আমতা আমতা করতে থাকলেন। তার চরম

প্রতিদ্বন্দ্বী মেলনিকভ ইতিমধ্যে ফাঁদে ধরা পড়েছেন সেটা শুনে তিনিও রাজী হলেন। আগামী শুক্রবার রাতে তার সাথে মেয়েটির দাবা খেলা হবে।

ট্রেসি প্রায় চিৎকার করে বলল, তুমি বলছো ওরা রাজী হয়েছে?

–হ্যাঁ।

কথাটা ভালো করে বোঝার পর ট্রেসি পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। মাত্র দুদিন জেফের কাছে শিখে সে কিনা পৃথিবীর সেরা দুই খেলোয়াড়ের সাথে দাবা খেলবে?

জেফ অনেক বুঝিয়ে রাজী করালো, যদি ট্রেসি হেরে যায় তাহলেও কুড়ি হাজার ডলার তাকে দিতে হবে না এবং জেফ ওটা জমা রাখবে ক্যাসিয়ারের কাছে।

ক্যাসিয়ারের হাতে কুড়ি হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক জমা দেওয়া হল। দাবা খেলার ব্যাপারটা ঠিক করা হল। জাহাজের সর্বত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ছুটে এসে জেফকে বলল–মিস হুইটনি কি পারবেন?

–পারবেন বলেই বোধহয়। আমার সঙ্গে ওঁর বাজী হয়েছে, জেফ বলল।

একজন যাত্রী বলল–এই ব্যাপারে আমিও যদি কিছু বাজী ধরি?

–ধরতে পারেন। মিস হুইটনির সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে, দশে এক রেট ধরা হবে।

অর্থাৎ এই খেলায় যদি কেউ বাজী জেতে তবে তাকে এক ডলারে দশ ডলার দিতে হবে। সবাই ভারী মজা পেয়ে গেল। সবাই জানে দুজন গ্র্যান্ডমাস্টারের কাছে ট্রেসি হুইটনিকে হারতেই হবে। দেখতে দেখতে দু লাখ ডলারের বাজীর টাকা জমা পড়ে গেল ক্যারিয়ারের কাছে। সমস্ত যাত্রী যেন তখন ক্ষেপে গেছে।

ক্যাসিয়ার শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেনের কানে কথাটা তুলল। সব খোঁজ নিয়ে জানা গেল খেলার মধ্যে কোনো জোচ্চুরি নেই, কিন্তু মেয়েটি এত টাকা কেন হারতে চলেছে সেটা কেউ বুঝতে পারছে না। ক্যাপ্টেন বললেন তিনি দাবা খেলা জানেন, পুরো পদ্ধতির ওপর নজর রাখবেন। শেষে তিনিও গ্রান্ডমাস্টাররা জিতবেন তার ভিত্তিতে পঞ্চাশ ডলার বাজী ধরে ফেললেন।

শুক্রবার রাত নটা, খেলা শুরু হবার মুখে দেখা গেল জেফ খুব ব্যস্ত হয়ে পায়চারী করছে, সব যাত্রীরা সেখানে হাজির হয়েছে, এমনকি জাহাজের কর্মচারীরাও এসে পড়েছে সেখানে। পাশাপাশি দুটি ঘরে খেলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দুই গ্র্যান্ডমাস্টার কখনও একঘরে খেলবেন না।

দর্শকদের কৌতূহল বেড়ে চলেছে, মার্কিনী মেয়েটিকে কেউ চেনে না, কিন্তু সবাই জানে মেয়েটি হারছে।

খেলা শুরু হবার আগে জেফ মেলনিকভ আর নেগুলেস্কোর সঙ্গে ট্রেসির আলাপ করিয়ে দিল।

নেগুলেস্কো জানতে চাইলেন–জাতীয় পর্যায়ের সব খেলাগুলি আপনি ঠিক জিতেছেন?

—হ্যাঁ।

–কী আশ্চর্য আপনার নাম আমি শুনিনি।

মেলনিকভ খুব অভদ্র ব্যবহার করলেন ট্রেসির সঙ্গে। আপনারা আমেরিকানরা কী করে টাকা নষ্ট করতে হয়ে তা জানেন। যাকগে আমার পরিবারের লোকেরা ওই টাকাতে অনেক কিছু কিনতে পারবে।

ট্রেসি গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি কিন্তু এখনও জেতেন নি মিঃ মেলনিকভ।

হো হো করে হেসে উঠলেন মেলনিকভ। মাই ডিয়ার লেডি, তুমি কে আমি জানি না, কিন্তু আমি কে সেটা আমি জানি।

রাত দশটাতে খেলা শুরু হবে। ট্রেসির পা দুটি থরথর করে কাঁপছে। কী ভুলই না করেছে জেফের কথা বিশ্বাস করে, কিন্তু এখন ফেরার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

জেফ বলল, মিঃ মেলনিকভ আপনি সাদা ঘুটি নিয়ে খেলবেন।

খেলা শুরু হল, উপস্থিত জনতা উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। কেউ তার জায়গা থেকে নড়ছে না, বলে একজন মরে গেলে অন্য একজন এসে সেই জায়গাটা দখল করে নেবে।

মেলনিকভ প্রথম চাল দেবেন, একেবারে কচুকাটা করে ফেলতে হবে মেয়েটিকে, এই ভেবে তিনি মন্ত্রীর ঘরের সামনে বোড়ে দুঘর এগিয়ে দিলেন। পাকা খেলোয়াড়ের মতো ভঙ্গি করে মাথা নাড়লো ট্রেসি। তারপর যেন চিন্তা করছে এমন ভাব দেখিয়ে চলে গেল পাশের কেবিনে।

নেগুলেস্কো ওকে দেখে হেসে উঠলেন। আহারে, বরিসকে হারিয়ে এলেন নাকি?

চেষ্টা করছি, নেগুলেস্কোর সামনে বসে, একটু ভাবার ভান করে সাদা খুঁটির বরাতে প্রথম চাল দেবার অধিকার হিসেবে মন্ত্রীর ঘরের বোড়েটাকে দুঘর এগিয়ে দিল ট্রেসি।

নেগুলেস্কো ধরেই নিয়েছেন আধঘন্টার মধ্যে উনি খেলা শেষে করবেন। ট্রেসি প্রত্যেকবারই ওঘরে যাচ্ছে, তারপর এঘরে ফিরে এসে চাল দিচ্ছে।

এইভাবে ট্রেসি জেফের কথা মতো মেলনিকভের চালটা নেগুলেস্কোর সঙ্গে আর নেগুলেস্কোর চালটা মেলনিকভের খেলার সঙ্গে দিতে থাকলো।

যেহেতু দুজন দুই ঘরে তাই কেউ এই কৌশলটা বুঝতে পারলো না।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দুই গ্র্যান্ডমাস্টার বুঝে ফেললেন যে এই ছোট্ট মেয়েটা দাবা খেলা দারুণ বোঝে।

ট্রেসি চারঘন্টা ধরে দুই দিকপালকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো। শেষপর্যন্ত হার বাঁচানো দায় হয়ে পড়লো ওঁদের। যখন দুটি খেলা ড্র হল তখন রাত চারটে বাজে। দুই গ্র্যান্ড

মাস্টারের কালঘাম ছুটে গেছে। শেষে দুজনে ড্র-এর প্রস্তাব দিতে জনতা আনন্দে হৈ-চৈ করতে শুরু করে। তারা ভাবতেই পারেননি যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে জেফ ট্রেসিকে আগলে বের করে দিয়ে এল।

ট্রেসি খুব খুশি হয়েছে। দুটি অহংকারী মানুষের দর্পচূর্ণ করা হয়েছে।

–কত টাকা জেতা হল?

–দুলাখ ডলারের মতো। কাল সকালে জাহাজ সাউদাম্পটনে পৌঁছচ্ছে। ডাইনিংরুমে খাবার সময় টাকাটা ভাগাভাগি হবে কেমন?

জেফ চলে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে ট্রেসি মনে মনে ভাবলো লোকটা আমার ওপর ভরসা রেখেছিল, ওর কথার দাম আছে বটে। এমন অসাধারণ পর্যায়ের প্রতারককে ট্রেসি আর কখনও দেখেনি, যেমন দেখতে ভালো তেমন বুদ্ধি রাখে, কিন্তু ওর সাথে ট্রেসি কখনই নিজেকে জড়াবে না।

জেফ দুপা এগোতেই জাহাজের রেডিও অফিসারের সঙ্গে দেখা, মিঃ স্টিভেন্স, আমরা তো ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, রিপোর্টাররা বোধহয় সাউদাম্পটন বন্দরেই চলে আসবে মিস হুইটনির সঙ্গে দেখা করতে।

জেফ মনে মনে শিহরিত। ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে কেউ যদি চিনে ফেলে?

–জাহাজঘাটে ফিরলে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, টাকাটা যদি দিয়ে দেন?

–নিশ্চয়ই, দুটো বড় বড় ম্যানিলা খামে নোটের তাড়া হাতে পেল জেফ।

–একটা কথা, মহিলা এত অল্প বয়সে এত সুন্দর দাবা খেলা শিখলেন কোথা থেকে?

–কাউকে বলবেন না যেন, গলা নামিয়ে জেফ বলল–শুনেছি ববি ফিশারের কাছে।

–হতেই হবে, ক্যাসিয়ার যেন এমন কিছু আঁচ করেছিলেন।

জেফ বলল–জাহাজ ঘাটে ভেড়ার আগেই চিঠিপত্রের মেল ব্যাগ নেবার জন্য যে স্টিমার আসে, তাতে করে আমাকে তীরে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আমার মা খুবই অসুস্থ।

–নিশ্চয়ই।

জেফ ঘরে ফিরে এসে একটা চিরকুট লিখল, ট্রেসি টাকাটা নিয়ে আমি জলে যাচ্ছি, স্যাভয় হোটেলে দেখা কোরো।

স্টুয়ার্টকে গিয়ে বলল–সকালে এটা মিস হুইটনিকে দিয়ে দেবেন।

ঠিক সকাল ছটায় মেল নেবার জন্য লঞ্চ এসেছে। জেফ দড়ি বেয়ে নামলো লঞ্চে। শেষ বারের মতো জাহাজটাকে দেখলো।

হঠাৎ পরিচিত গলা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ট্রেসি।

–বিশ্বাস করো একটা চিঠি রেখে এসেছি তোমার জন্যে।

–আমি কি অবিশ্বাস করেছি? স্যাভয় হোটেলে টাকা ভাগাভাগি হল।

–বিকেলে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে ট্রেসি?

–নিশ্চয়ই।

–তাহলে তৈরী থেকে সন্ধ্যে ছটায় আসবো।

সন্ধ্যে ছটায় হোটেলে এসে জেফ শুনলো ট্রেসি দুপুরেই চলে গেছে। কোথায় গেছে কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।

জেফ আকাশের দিকে তাকালো। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলো। ট্রেসির সুন্দর মুখখানা তখন ওর মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে আছে।

পার্ক স্ট্রিট এলাকায়

জেফের কাছে থেকে টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে ট্রেসি এবার এলো পার্ক স্ট্রিট এলাকায় একটা ছোট্ট হোটেলে। কারো কাছে সে নিজের আসল পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নয়। এই জায়গাটা মনোমত, ট্রেসির খুশি এখন আকাশছোঁয়া।

দ্বিতীয় দিন হোটেলের বেয়ারা এসে একটা হাতে লেখা চিঠি রাখলো তার সামনে।

লেখা আছে–একজন সাধারণ বন্ধু জনিয়েছেন আমরা পরস্পরের পরিচিত হলে, দুজনেরই লাভ হবে। আজ বিকেল ৪টের সময় রিৎজ হোটেলে আমার সঙ্গে চা খেতে আসতে পারবেন কি? লাল কারনেশন ফুল পরে থাকবো আমি। সইয়ের জায়গায় লেখা আছে গান্থার হারটগ।

এই নামটা কোনদিন শোনেনি ট্রেসি। শেষপর্যন্ত সে হোটেল রিৎজে পৌঁছে গেলো। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারার বছর ষাটের এক মানুষ, দামী স্যুট, কোটের বুকে লাল কারনেশন ফুল গোঁজা।

ট্রেসি ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন–আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য আমি ধন্য।

ট্রেসি বলল–কিন্তু আপনি অন্য কারোর সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেন নি তো?

–আপনার অতীত সম্পর্কে যেটুকু শুনেছি, তাতে পৃথিবীতে একজনই ট্রেসি হুইটনি। থাকার কথা।

এই কথা শুনে ট্রেসির বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। তার অতীত খুব একটা সুবিধার নয়, তবু সে আমতা আমতা করে বলল কী শুনেছেন আপনি?

চা খেতে খেতে কথা হল। কোনরাড মরগানের কথা উঠল। কোনরাড নাকি ট্রেসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গার হারটগের জন্ম জার্মানীর মিউনিখে। বাবা ছিলেন ব্যাঙ্কার, ছোটবেলা থেকে ছবি আর প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য বস্তু জোগাড় করাই তার প্রধান সখ, মা ছিলেন ইহুদী। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে রাজী না হওয়াতে হিটলারের ফতোয়া অনুসারে বাবা ভিখিরী হয়ে গেলেন। যুদ্ধের বোমায় দুজনে মারা যান। বন্ধু বান্ধবেরা তাকে সুইজারল্যান্ডে পাচার করে দেয়। যুদ্ধের শেষে লন্ডনে বাসা বেঁধেছেন হারটগ। প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য বস্তুর একটা দোকান আছে তার। ট্রেসি যদি ওই দোকানে আসে তাহলে তিনি খুবই খুশি হবেন।

বিল মেটাবার পর হারটগ বললেন, হ্যাঁম্পশায়রে একটা ছোট্ট বাড়ী আছে আমার। শনি-রোববার কয়েকজন বন্ধু সেখানে যাচ্ছেন, আপনি কি যাবেন?

শেষ পর্যন্ত ট্রেসি অনেক কিছু ভেবে ঠিক করলো দেখাই যাক না ওখানে গিয়ে।

দারুণ কাটলো শনি আর রোববার। ছোট্ট বাড়ি বলতে দেড়শো বিঘের ওপর একটা প্রাচীন জমিদার বাড়ি। বিপত্নীক হারটগ মাঝেমধ্যে এখানে এসে থাকেন।

অতিথিরাও কম সুন্দর নন, সস্ত্রীক একজন মন্ত্রী এসেছেন, একজন আর্ল-এর সঙ্গে পরিচয় হল। বান্ধবী নিয়ে এসেছেন একজন সেনাপতি। মোরভির মহারানী এসেছেন, সোনালী জরির কাজ করা লালপাড় শাড়ি পড়েছেন তিনি, তার ব্যবহার খুব মিষ্টি।

ফিরে আসার আগে হারটগ ট্রেসিকে বললেন–আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করলে কেমন হয়? ট্রেসি বলল, আপনার দোকানে?

–না, তোমাকে সেলসগার্ল হতে হবে না, তোমার যা বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব, তুমি অন্য কাজ করতে পারবে।

–দেখুন হারটগ, অতীতটাকে আমি পেছনে ফেলেই চলেই এসেছি।

–কিন্তু সামনের কথা চিন্তা করেছো তো? টাকা একদিন ফুরিয়ে যাবে, আমরা দুজন পার্টনার হয়ে কাজ করতে পারি না কি? আমি বড়লোকদের নানা অনুষ্ঠানে যাতায়াত করি, শিকারে যাই, নৌকোয় করে পিকনিকে যাই। ওদের গতিবিধি আমার জানা আছে। তোমার কাজ হল আমার কাজ থেকে খবর নিয়ে দামী ঘড়ি আর গয়নাগুলো সরিয়ে নিয়ে আসা। আধাআধি বখরা কি বলো? প্রস্তাবটা কিন্তু ফেলে দেবার মতো নয়।

–আমি রাজী নই।

একদৃষ্টে ট্রেসির মুখের দিকে তাকিয়ে হারটগ বললেন–বুঝেছি, তবে যদি কোনোদিন মত পাল্টায় তাহলে দেখা কোরো।

–আমার মত কোনোদিন পাল্টাবে না।

সন্ধ্যের দিকে ট্রেসি লন্ডনে ফিরে এল। এই শহরটাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু গান্থার হারটগ ঠিকই বলেছিল, যত টাকাই থাকুক না কেন, একদিন তা ফুরিয়ে যাবেই। অতএব ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।

আরও কয়েকটা শনি-রোববার ট্রেসি ঘুরে এলো হারটগের গ্রামের বাড়ি থেকে। এক রোববার এক পার্লামেন্ট সদস্য বললেন–আমি খাঁটি টেক্সাসবাসী কাউকে দেখিনি, কেমন হয় ওরা?

টেক্সাসের ধনবতী অহংকারী বিধবাকে নকল করে ট্রেসি সকলকে খুব হাসালো।

ট্রেসিকে হারটগ বললেন–এই নকল করার কায়দাটা কাজে লাগিয়ে কিছু রোজগার করছো না কেন?

–আমি অভিনেত্রী নই।

–নিজেকে এত ছোটো করে দেখছো কেন? লন্ডনে একটা বড়ো গয়নার দোকান আছে– পার্কার অ্যান্ড পার্কার। ওরা তোমাদের মার্কিনী ভাষার খদ্দেরদের লুফে নেয়, আমরাও তাকে জিতে নেবো।

মুখে না বললেও মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো ট্রেসি। বুদ্ধির খেলায় অনেককেই সে হারিয়েছে, আরেকবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি?

অক্টোবর মাস পড়ে গেছে, লন্ডনে তখনও বেশ গরম। রাস্তায় পথিক আর টুরিস্টদের ভীড়। একটা সাদা ডেমলার গাড়ী এসে দাঁড়ালো পার্কার অ্যান্ড পার্কার জুয়েলারী শপের সামনে। চড়া মেকআপ নেওয়া স্বর্ণকেশী এক যুবতী লাফিয়ে নামলো। কোট গায়ে, দামী ভেড়ার লোমের কোট। এই গরমে কেউ কোট পড়ে না।

যুবতী প্রশ্ন করলো–এই জোড়াতালি দেওয়া জায়গাটায় ঢোকার পথ কোনদিকে? তার কণ্ঠস্বরে টেক্সাস অঞ্চলের উচ্চারণ।

–ও দিকে, সোফার জানালো। যুবতী টকটক করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দারোয়ান দরজা খুলে সরে দাঁড়ো। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কাউন্টারের সেলসম্যানকে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে নকল পাথরের গয়না ছাড়া আর কিছু বিক্রি হয় কি?

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো সে।

ঠাট্টাটা গায়ে না মেখে সেলসম্যান জানতে চাইলো–কি চাই তার?

–আমার ওল্ড পি জে আমার জন্মদিনে একটা পান্না কিনতে বলেছে। ভালো কিছু আছে কি তোমাদের এখানে?

–এদিকে আসুন।

ট্রে ভর্তি পান্না বের করে কাউন্টারে রাখলো সে।

–ধুস্ এগুলো তো খোকা পান্না। এদের মা-বাবাদের সন্ধান কোথায় পাবো? সেলসম্যানের ঘাড় শক্ত হয়ে উঠল–এগুলোর দাম ত্রিশ হাজার ডলারের মতো।

–আমার হেয়ার ড্রেসারকে ওই টাকাটা বকশিস দিই। এই নুড়িগুলো নিয়ে গেলে ওল্ড পি জে অপমানিত বোধ করবে। সেলসম্যান মনে মনে কল্পনা করল টাক মাথা, ভুড়িওলা একটা লোক এই সুন্দরীর স্বামী। ধনকুবেররা অল্প বয়েসী মেয়েদের বিয়ে করে।

–কেমন দামের মধ্যে চাইছেন যদি একটা আন্দাজ দেন, বিনীতভাবে সেলসম্যান বলল।

–লাখখানেক থেকে শুরু করলে দোষ কি?

বোকার মতো তাকিয়ে রইল সেলসম্যানটি। পরে আমতা আমতা করে বলল–অত বেশি টাকার লেনদেন আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিজেই করেন।

খবর দিতেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গ্রেগরী হ্যালস্টন নিজেই এলেন। তিনি তার খাসকামরায় যুবতীটিকে নিয়ে গেলেন।

যুবতীটি বলল–আমি হলাম মেরী লাও বেনেক। ওল্ড পি. জে. কে চেনো? প্রথম দর্শনে তুমি বলাতে মনে মনে চটে গেলেন হ্যালস্টন।

শোকেসে ট্রে ভর্তি দামী পাথর। একটা বড়ো পাথর দেখিয়ে যুবতী বলল–ওটা বের করো।

-ম্যাডামের রুচির প্রশংসা করতে হয়, এটা দশ ক্যারেট ওজনের ঘাস-সবুজ কোলম্বিয়ান পান্না।

–পান্না কখনো নিখুঁত হয় না। হ্যালস্টন থতমত খেয়ে গেলেন–তা ঠিক। তবে কিন...। এই প্রথম হ্যালস্টন লক্ষ্য করলেন যে যুবতীর দুটি চোখ পান্নার মতো সবুজ।

অন্য আরও কিছু দেখবেন?

এটাই নেবো সোনামনি, যুবতীর বেহায়াপনায় লজ্জা পেলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

–দামটা পড়বে একলাখ ডলার। দামটা কিভাবে দেবেন?

–চেকে। আমার এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, পরে ওল্ড পি. জে. র কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে দেবো।

–ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি পাথরটা পরিষ্কার করে কাল আপনাকে ডেলিভারী দিয়ে দেবো।

অচেনা লোকের হাতে এত দামী পাথরটি কখনই দেবেন না, তাছাড়া ঠকতে তিনি রাজী নন, আজ পর্যন্ত তাকে কেউ ঠকাতে পারেনি।

কোন হোটেলে পাথরটা ডেলিভারী দিতে হবে তা হ্যালস্টন জেনে নিলেন। যুবতী খসখস করে চেক লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফোন করলেন হ্যালস্টন, মিসেস মেরী লাও বেনেকের নামে কোনো অ্যাকাউন্ট আছে কিনা? থাকলে কত টাকা আছে?

ব্যাঙ্ক জানালো লাখ ডলারের অনেক বেশী টাকা জমা আছে অ্যাকাউন্টে। এই খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন হ্যালস্টন।

সকালে চেকের টাকা তোলা হল, পান্না পৌঁছে গেল হোটেলে।

বিকেলে মিসেস বেনেক আবার পৌঁছলেন গ্রেগরী হ্যালস্টনের কাছে। এই মার্কিন মেয়েমানুষগুলো একেবারে বাজে, বিশেষ করে টেক্সাসের, তিনি ওই পান্নাটা ফেরত দিতে এসেছেন। উপায় নেই, মুখে হাসি ফুটিয়ে সেলসম্যান বললো, আপনার স্বামী বোধহয় পান্নাটা পছন্দ করেন নি তাই তো?

–তোমার ধারণাটাই ভুল গঙ্গারাম, ওল্ড পি. জে পাথরটা দেখে পাগল হয়ে গেছে।

এবার সরাসরি হ্যালস্টনের ডাক পড়লো। তিনি এসে বললেন, কি ম্যাডাম, আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?

–আমাকে ওই ধরনের আরেকটি পান্না দিতে হবে।

–দুঃখিত ম্যাডাম, ওটার জোড়া নেই।

–ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না, জোড়া থাকতে বাধ্য, সেটা আমার চাই-ই। দাম যা লাগে ওল্ড পি. জে. দেবে। আগামী শনিবার আমার জন্মদিন। ওইরকম পান্নার দুল পড়তে হবে। যদি সেটার জন্য দুলাখ তিন লাখ ডলার লাগে তাও দিতে আপত্তি নেই।

যুবতীয় কথায় হ্যালস্টনের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। দু-লাখে বিক্রি করতে পরলে কোম্পানীকে একলাখ দিয়ে তিনি একলাখ পকেটে পুরবেন।

হ্যালস্টনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে যুবতী বলল–কাগজে বিজ্ঞপন দিন, আমরা সাড়ে তিন লাখ ডলার পর্যন্ত উঠবো।

মিসেস বেনেক চলে গেলেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত হ্যালস্টন চেয়ার থেকে উঠতে পারছিলেন। রাতারাতি বড়োলোক হবার সুযোগ আজ তার হাতে এসেছে। এক লাখ কোম্পানীর তহবিলে জমা দিলে তঞ্চকতাও করা হল না আবার আড়াই লাখ ডলার তার পকেটে চলে আসবে।

কিন্তু এই ধরনের পাথর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? শেষপর্যন্ত লন্ডন টাইমস আর ফাইন্যান্সিয়্যল টাইমস এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পেল শত শত। কিন্তু কোনোটাই আগের মতো নয়।

থেকে থেকে মিসেস বেনেক ফোন করে বিরক্ত করছে হ্যালস্টনকে। শুক্রবারে ফোন করে সে জানালো কাল আমার জন্মদিন। তার মধ্যে পাথরটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়। তা

হলে পান্নাটা ফেরৎ দেবো। একটাতে আমার কোনো কাজ হবে না। মিস্টার হ্যালস্টন ঘামতে শুরু করে দিলেন। বললেন–আমরা দেখছি।

–দেখা দেখির কিছু নেই। ওল্ড পি. জে. চার লাখ পর্যন্ত দেবে কিন্তু কালকের মধ্যে চাই।

চারলাখ? তার মানে তিন লক্ষ ডলার সরাসরি লাভ হবে। হ্যালস্টনের পাগল হবার জোগাড়। সকাল থেকেই ফোন বেজে চলেছে।–

–হ্যালো। মিষ্টি গলার এক মহিলা অভিবাদন জানালেন ফোনে। কথার টানে বোঝা গেল ইনি ইতালীয়ান।

–বিজ্ঞাপনে দেখলাম আপনি একটা পান্না খুঁজছেন?

–হ্যাঁ চাই।

–আমার কাছে পারিবারিক সূত্রে পাওয়া একটা দামী পান্না আছে। সিনর আপনি তো দশ ক্যারেটের পান্না খুঁজছেন?

–হ্যাঁ।

–আমার কাছে যেটা আছে সেটা ঘাস-সবুজ রঙের কোলাম্বিয়ান পান্না।

হ্যালস্টন নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করা চলবে না।

মহিলা একজন ইতালীয় কাউন্টেস। শেষপর্যন্ত হ্যালস্টন নিজেই ছুটলেন কাউন্টেসের হোটেলে।

ট্যাক্সিতে বসে আকাশকুসুম কল্পনা করতে লাগলেন তিনি। পাথরটা যদি ঠিক হয় তাহলে তিন লাখ ডলারের মুনাফা কে আটকাবে? ভালো জায়গাতে বাড়ি কিনবেন অথচ কেউ ধরতে পারবে না, একটা পালতোলা নৌকো তার চাই। হ্যালস্টন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, অথচ এই মুহূর্তে ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেন।

নম্বর মিলিয়ে দরজায় টোকা দিলেন, কিছুক্ষণ বাদে জমকালো চেহারার এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়েস ৫০-এর কোঠায়, কালো চুলে সোনালী ফিতে, মুখে বয়েসের চিহ্ন।

ভারী মিষ্টি গলা মহিলার। তিনি বললেন–বসুন।

–আমি গ্রেরী হ্যালস্টন। আপনি আমাকে টেলিফোন করেছিলেন।

–হ্যাঁ, আমি কাউন্টেস মারিয়া। আপনি ভিতরে আসুন সিনর।

হ্যালস্টনের আর তর সইছে না, বসতে বসতেই বললেন, পান্নাটা কোথায়?

–বসুন দয়া করে। আমি আবার ভালোভাবে ইংরেজী বলতে পারি না।

–না না আপনি সুন্দর ইংরাজী বলেন, এবার অবান্তর কথা থামাতে চাইছেন হ্যালস্টন। বৃদ্ধা বলেই চলেছেন; কোথা থেকে পান্নাটা পেয়েছেন, স্বামীর অত্যন্ত আপত্তি কিন্তু তিনি এটাকে বিক্রি করবেন। স্বামীর বিপদের দিনে স্ত্রী-তে সাহায্য করবেই।

–পান্নাটা আছে কোথায়?

–এই যে, পকেট থেকে টিসু কাগজে মোড়া পান্নাটা বের করলেন কাউন্টেস। চোখ ঠিকরে গেল হ্যালস্টনের। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা ওই পান্নাটার জোড়া, দারুণ চোখ

আছে তার, অন্য কেউ হলে হয়তো ভাবতো ওই পাথরটাই এখানে এসে গেছে।

–আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর কাছে এই রকম একটি পাথর আছে। তাই তার জোড়াটা কেনবার জন্য তারা পাগল। এর জন্য যাট হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজী।

কাউন্টেস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–৬০ হাজারে বিক্রি করলে আমার দিদিমা কবর থেকে উঠে এসে আমাকে ভয় দেখাবেন।

হ্যালস্টন ধীরে ধীরে বাড়তে চান, বেশি লোভ দেখিয়ে ফেললে মুশকিল।

–দরকার পড়লে এক লাখ পর্যন্ত উঠবে।

–কিন্তু তাতেও আমার সমস্যা মিটবে না, আমার স্বামী একটা ব্যবসা করতে যাচ্ছেন, কমপক্ষে আড়াই লাখ ডলার লাগবে।

হ্যালস্টন উঠে পড়লেন, না, অতো দিতে পারবো না।

–দুঃখিত, আপনি এত কষ্ট করে এলেন।

শেষ অবধি বাধ্য হয়েই আড়াই লাখে কিনলেন। তাতেও দেড়লাখ লাভ থাকবে।

চেক লেখা হয়ে গেলে পাথরটা নিয়ে বিজয়ীর গর্বে হোটেল থেকে বেরিয়ে দোকানে এলেন হ্যালস্টন। মিসেস বেনেককে ফোন করতে হবে।

মিসেস বেনেকের হোটেলে ফোন করে জানতে পারলেন তারা সকলেই চলে গেছেন এবং কোথায় গেছেন তার ঠিকানা জানিয়ে যাননি। তখন হ্যালস্টনের মাথাটা ঘুরে গেল।

তাড়াতাড়ি কাউন্টেস মারিয়াকে ফোন করলেন। পান্না ফেরৎ দিতে হতে পারে। হোটেলের ক্লার্ক জানালো একটু আগে বিল মিটিয়ে উনি চলে গেছেন।

এবার ব্যাঙ্কে ফোন করে আড়াই লাখের চেকটাকে আটকাতে হবে, কিন্তু ফোন করে । জানতে পারলেন একটু আগে চেকের পেমেন্টটাও হয়ে গেছে।

এবার হ্যালস্টন বুঝতে পারলেন যে পান্নাটা উনি এক লাখে বিক্রি করেছিলেন, সেটাকেই আবার আড়াই লাখে কিনেছেন। পার্কার ব্রাদার্সকে কি বলবেন সেটা ঠিক করতে না পেরে ঘামতে শুরু করলেন মিঃ হ্যালস্টন।

.

২২.

এবার নতুন জীবন শুরু হয়েছে ট্রেসির। ৪৫ নং ইটন স্কোয়ারে পুরনো দিনের একটি জর্জিয়ান বাড়ি কিনেছে সে। সামনে পেছনে বাগান, গান্থার হারটগের সাহায্য নিয়ে বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে।

হারটগ ট্রেসির পরিচয় দিয়েছে একজন ধনী বিধবা হিসাবে, যার স্বামী ছিল বড়ো ব্যবসাদার। ট্রেসি ধীরে ধীরে সকলের মন জয় করে ফেলল। নানা আসরে তার নিমন্ত্রণ আসছে।

অবসর সময়ে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইটালী ঘুরে এল। প্রত্যেকটি সফর শেষে ট্রেসি আর হারটগ লাভবান হতে লাগলো।

হারটগ ট্রেসিকে নানা জিনিস শেখাতে শুরু করল। নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করা শিখলো সে, তার ইতিমধ্যে আধ ডজন পাসপোর্ট করানো হয়েছে। আয়ের অংক বাড়তে সিডনি সেলর্ডন রচনাসমগ্র লাগলো হু হু করে, একটা তহবিল গড়ে তুলে বিভিন্ন মহিলা কয়েদীদের সাহায্য করছে সে।

অটো স্মিটকে মাসোহারা পাঠানোও ছিল তার অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান লোকদের বার বার বোকা বানাতে সে খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু নিরপরাধ লোকদের সে কোনো ক্ষতি করতো না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সমস্ত ইউরোপের খবরের কাগজে তখন ট্রেসি হয়ে উঠেছে মূল আকর্ষণ। কেউ তার আসল পরিচয় জানে না। কিন্তু কীভাবে একটির পর একটি অবিশ্বাস্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, কোনো কিনারা হচ্ছে না। ট্রেসি বিভিন্ন ছদ্মবেশে কাজ করত বলে পুলিশের ধারণা হয়েছিল, নানা অপরাধী কাজগুলো করছে। অবশেষে ইন্টারপোলকে নাক গলাতে হল।

–দারুণ সমস্যায় পড়েছি আমরা। ইউরোপের বহু মক্কেল আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে মেয়েদের একটা দল ও দেশে দারুণ ঝামেলা পাকাচ্ছে। দলটাকে ধরতে হবে। ইন্টারপোল আমাদের সাহায্য করবে। তোমার ওপর দায়িত্ব দিলাম। কাল সকালে তোমাকে প্যারিস ছুটতে হবে।

লন্ডনের একটা ছোটো হোটেলে বসে হারটগ আর ট্রেসি ডিনার খাচ্ছিল।

–ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়ের পন্তের নাম শুনেছে ট্রেসি?

নামটা শোনা শোনা লাগলো। হ্যাঁ মনে পড়েছে জেফ স্টিভেন্স, কুইন এলিজাবেথ। জাহাজের খুব ধনী লোক তাই না?

–ভীষণ নিষ্ঠুর, ওর কাজই হল বড়ো বড়ো কোম্পানী কেনা এবং সেগুলোকে চুষে • নিয়ে ফিরয়ে দেওয়া।

জো রোমানো ব্যবসাটা নিয়েছিল, পুরনো লোকদের ছাঁটাই করে দিয়ে নিজের লোকদের নিয়ে এল। তারপর কোম্পানীটাকে আঁঝরা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষে সব নিয়েছে, ব্যবসা, বাড়ী, তোমার মার গাড়ীটাও।

অটো স্মিটের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ট্রেসির।

–ট্রেসি, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?

–না, ঠিক আছে। এই ম্যাক্সিমিলিয়ানের কথা আরও খুঁটিয়ে বলল, আমাকে।

–তৃতীয় স্ত্রীকে ডিভোর্স করেছে। এখনও বিয়ে করেনি। এর সঙ্গে আলাপ জমালে কিছু একটা হবে বলে আমরা বিশ্বাস। ম্যাক্সিমিলিয়ান আগামী শুক্রবার ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের মতো বিখ্যাত ট্রেনে চেপে লন্ডন থেকে ইস্তামবুল যাবে।

–ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস? আমি সেটাতে কখনও চড়িনি। একবার যাব।

–বেশ বেশ, ম্যাক্সিমিলিয়ানের দামী রত্নের কালেকশন একমাত্র লেনিনগ্রাডের হারমিটেজ যাদুঘরের পরেই। কুড়ি কোটি ডলার দাম আছে তার। তার থেকে কয়েকটা যদি আনতে পারো।

ট্রেসি হাসি মুখে বলল–দেখি।

ম্যাক্সিমিলিয়ান যদি সুবিধার না হয় তাহলে আরও দুজন যাচ্ছে, ইতালীর বিখ্যাত চিত্র-তারকা অভিনেত্রী সিলভানা লুয়াডি। তাকে চেনো তো?

–সকলেই চেনে তাকে।

–অভিনেত্রী সিলভানা আলবের্তো ফোরনাতিকে বিয়ে করেছে। ফোরনাতি বিখ্যাত ছবির প্রযোজক। সে টাকার লোভ দেখিয়ে পরিচালকদের কজা করে। লাভের টাকা নিজের পকেটে ঢালে। আর সব টাকা দিয়ে বৌকে গয়না গড়িয়ে দেয়।

আশা করি এদের তোমার ভালো লাগবে।

ট্রেসি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেখা যাক কি হয়?

শুক্রবার, সকাল ১১টা বেজে ৪০ মিনিট। লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে। যায় ইস্তামবুল। মাঝে মাত্র ৫টা স্টেশন–বুলো, প্যারিস, লাউসানে, মিলান এবং ভেনিস।

দুজন লম্বা চওড়া চেহারার উর্দি পরা লোক প্ল্যাটফর্মে একটা লাল কর্পেট বিছিয়ে দিল। দীর্ঘদিন বাদে আবার ওই ঐতিহ্যবাহী ট্রেনটি নতুন করে চালু হয়েছে। ১৯২০ দশকের মতো করেই একে সাজানো হয়েছে, খাঁটি ব্রিটিশ প্রথায় রেস্টুরেন্ট, বার-সেলুন সবই আছে। সমুদ্রনীল উর্দি পরা দুজন কুলী ট্রেসির সামনে ছোট্ট সুটকেসটা নিয়ে হাঁটছিল। ট্রেসির ছোট্টা কামরায় পৌঁছে দিয়ে তারা চলে গেল।

ঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়ল। দুপুর ১টা বেজে ১৫ মিনিটে কোকস্টোন বন্দরের যাত্রীরা ওই ট্রেন ছেড়ে স্টীমারে উঠল। তারা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বুলো পৌঁছালো। আরেকটা ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চাপলো।

ট্রেসি একজন অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলো–শুনেছি এই-ট্রেনে ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়ের পন্ত যাচ্ছেন? তার সঙ্গে আমার একটু দেখা করতে হবে।

মাথা নেড়ে ছেলেটি বলল–কেবিন বুক করাই ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি আসেন নি।

ট্রেসি হতাশ হল, তাহলে বাকি রইল সিলভানা লুয়াডি আর তার স্বামী ফোরনাতি।

বুলোতে নতুন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে একই রকম কামরা পেল ট্রেসি। সারাদিন ধরে পরিকল্পনা ভাবতে লাগল। অত্যন্ত দামী গাউনের সঙ্গে ম্যাচ করা মুক্তোর নেকলেস পড়েছে। শেষ বারের মতো আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। চোখে মুখে কিশোরীর সারল্য। এবার চারপাশটা দেখলো। তালাগুলো দেখে নিল ভালোভাবে। একটা ইয়েন তালা অন্যটা ইউনিভার্সাল।

ট্রেনে তিনটা ডাইনিং কার, তিনটিই সাজানো। প্রথমটিতে কয়েকটা সিট খালি ছিল। ট্রেসির চোখ কাউকে বোধহয় খুঁজছে। তৃতীয় ডাইনিং কারটাতে সে এল। একটা টেবিলের কাছে এসে বলল মাফ করবেন, এখানে কি একটু বসতে পারি?

পুরুষটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বলল–বসুন, আমি হলাম আলবের্তো ফোরনাতি আর এই আমার স্ত্রী সিলভানা লুয়াডি।

বসতে বসতে ট্রেসি নিজের নাম জানালো।

–আহ...আমেরিকান, আই স্পিক দি একসেলেন্ট ইংলিশ।

আলবের্তো ফোরনাতি বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক আছে। সিলভানা লুয়াডি যে কেন একে বিয়ে করলেন, বারো বছর ধরে দাম্পত্য জীবন কাটচ্ছেন কী করে তা সব সাংবাদিকদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। ওই অভিনেত্রী অপরূপা সুন্দরী। হাজার হাজার শব্দ খরচ করেও তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। একবার অস্কার এবং একবার রুপোর। পাত্র পুরস্কার পেয়েছেন। গায়ে দামী গয়না, হারটনের কথা মনে পড়ে গেল ট্রেসির।

ফোরনাতি অনেক মজার গল্প শুরু করে দিলেন। জানতে চাইলেন ট্রেসির পরিচয়। ট্রেসি নিজেকে ট্যুরিস্ট হিসাবে পরিচয় করালো। সিলভানার এসব কথাবার্তা ভালো লাগছিল না। কথা বলতে বলতে ফোরনাতি এমনভাবে হাত নাড়ালেন যে সসের পাত্রটা তার স্ত্রীর কোলে গিয়ে পড়ল। এত দামী গাউনটা বিশ্রীভাবে নোংরা হয়ে গেল। সিলভানা খুবই রেগে গেলেন, ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে গেলেন। ট্রেসির বুঝতে বাকি রইল না এ হল ফোরনাতির ইচ্ছাকৃত ব্যাপার।

–ছিঃ ছিঃ, এটা কি হল বলুন তো?

–ছেড়ে দিন, ফোরনাতি আবার তার বউকে দামী গাউন কিনে দেবে, বলতে বলতে টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে ট্রেসির উরুতে হাত বোলাতে লাগেন ফোরনাতি।

–মেয়েরা ফোরনাতিকে ভীষণ পছন্দ করে, আর যারা ফোরনাতিকে পছন্দ করে, ফোরতিও তাদেরকে পছন্দ করেন-বার বার নিজের নামটা এই তালিকাতে ঢোকানোর

জন্য ট্রেসি অধীর হয়ে উঠলো, আপনি খুব ভালো, ট্রেসির কথা শেষ হবার আগেই উচ্ছ্বসিত। হয়ে উঠলো ফোরনাতি।

–আজ রাতের বেলায় যাব, তোমার কেবিনে আলোচনা করতে, ইতিমধ্যে আপনি থেকে সম্বোধন তুমিতে নেমে এসেছে। কথায় কথায় ট্রেসি জেনে নিল যে ৭০ নম্বর কেবিনে ফোরনাতি আছে।

অন্ধকারের বুক চিরে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে। কখন প্যারিস ছেড়ে গেছে কেউ জানে না। সবাই নিজস্ব পাসপোর্ট জমা দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ।

রাত তখন প্রায় সাড়ে তিনটে, ট্রেন এবার সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত অতিক্রম করবে, ভোর ৫টা বেজে ২১ মিনিটে লাউসানে পৌঁছাবে, সওয়া-নটার সময় পৌঁছাবে ইতালীর মিলান শহরে।

ট্রেসির হাতে একটা স্পঞ্জ ব্যাগ, মনের ভেতর যে উত্তেজনার পারদ মাত্রা চড়চড় করে চড়ছে সেটাকে দমন করে সে এগিয়ে চলেছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাথরুমে যাচ্ছে। ভোর রাত, পাহারাদাররা সবাই নিদ্রামগ্ন।

৭০ নম্বর কেবিনে পৌঁছে ট্রেসি স্পঞ্জের ব্যাগ থেকে শিশি আর সিরিঞ্জ বের করল। ঠিক দশ মিনিট বাদে নিজের কেবিনে ফিরে এল সে, ঠোঁটে হাসি, তারপর সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সূচিপত্র

সকাল সাতটা, মিলানে পৌঁছবার দুঘন্টা আগে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ভীষণ চীৎকার শোনা গেল। সবাই ছুটে গেল ৭০ নম্বর কেবিনে। কনডাকটর গার্ডকে দেখে সিলভানা লুয়াডি পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার সব গয়না চুরি হয়ে গেছে। এই হতভাগ্য ট্রেনটা চোরে ভরতি।

অনেক সাধ্য সাধনা করে তাকে শান্ত করার পর জানা গেল যে তার দশলাখ ডলারের গয়না লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

ফোরনাতি কিছুতেই মানতে রাজী হলেন না। তার ঘুম খুব পাতলা, কেউ ঢুকলে তিনি নিশ্চয় জানতে পারবেন।

কন্ডাক্টর এর মধ্যে সব কিছু বুঝে ফেলেছেন। সিরিঞ্জ করে তালার ফুটোর মধ্যে অজ্ঞান করার ইথার ঢুকিয়ে দিয়ে চুরি করা হয়েছে। এই পদ্ধতি নতুন নয়, আগেও এই ধরনের চুরি হয়েছে। তবে এবারের কেসটা আলাদা, ট্রেন থামার আগে চুরি হয়েছে অর্থাৎ চোর এই ট্রেনের মধ্যেই আছে। তাড়াতাড়ি মিলান পুলিশের কাছে খবর গেল।

কুড়িজন পোশাক পরা পুলিশ মিলান প্ল্যাটফর্ম পাহারা দিচ্ছিল। ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টারের নাম লুইগ রিক্কি। ট্রেন থামতেই সে চলে এল ফোরনাতির কেবিনে। জুয়েল বক্সটা নেড়েচেড়ে দেখলো। চাবির গর্তে নাক লাগিয়ে শুঁকতেই ইথারের গন্ধ পাওয়া গেল। যদিও খুব ক্ষীণ, তবু বুঝতে পারলো চোরকে ধরা সম্ভব।

প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকে স্টেশনের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তল্লাসী করা শুরু করা হল। তাদের কেবিন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল পুলিশরা। রিকি স্বপ্ন দেখল এই চুরি কিনারা সে করবেই, তার ফলে একটা বড়ো প্রমোশন তার বাঁধা।

ট্রেসির কেবিনেও তল্লাসী করা হল। পুরো চারঘন্টা ধরে তল্লাসীর পর কয়েক প্যাকেট ম্যারিজুয়ানা, পাঁচ ভোলা কোকেন, একটা বড়ো ছুরি আর বিনা লাইসেন্সের একটা পিস্তল পাওয়া গেল।

আবার তল্লাসী শুরু হল, যাত্রীরা সবাই ক্ষেপে গেলেন। ট্রেন আর কতক্ষণ আটকে থাকবে? শেষপর্যন্ত বোঝালেন চোর গয়নাগুলো কোনো স্টেশনের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। সেখানে হয়তো তার সাকরেদ আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। সে লুফে নিয়েছে। ব্যস, এভাবেই চুরির কেসটা সমাধান করা হল।

করিডরে ট্রেসির সঙ্গে আবার ফোরনাতির দেখা হল।

–না না এতে দুঃখের কি আছে, ফোরনাতির কাছে এটা এমন কোনো ক্ষতি নয়, ভেনিসের কথাটা মনে আছে তো? আমি তোমাকে ভেনিস ঘুরিয়ে দেখাবো।

সলজ্জ ভঙ্গিতে ট্রেসি বলল–সে কথা ভুলি কেমন করে? আমি তো ভীষণভাবে উদগ্রীব হয়ে আছি।

ভেনিসে সবাই গাড়ি থেকে নামলো। ট্রেসি তার সামান্য সুটকেসটা নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেল। তারপর লন্ডনে, সঙ্গে আছে সিলভানার সমস্ত গয়না। এ খবর শুনে গান্থার হারটগ নিশ্চয়ই খুশি হবে।

.

২৩.

প্যারিস থেকে ছমাইল দূরে একটা পাহাড় ঘেরা জায়গাতে আমরা চলে এসেছি। এখানেই ইন্টারপোলের সাততলায় হেড অফিসটা অবস্থিত। দারুণ সুরক্ষিত, সর্বত্র ক্লোজ-সার্কিট টিভি ফিট করা আছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে কড়া পাহারা চলে।

এখানে পৃথিবীর আড়াই কোটি অপরাধীর খুঁটিনাটি বিবরণ সমেত ফাইল সংরক্ষিত আছে। মে মাসের সকালের দিকে এখানকার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আঁদ্রে ট্রিগনান্টের ব্রিফিং হচ্ছিল। বয়েস ৪০-৪৫ এর মধ্যে, সুন্দর চেহারা, নির্মেঘ ছবি, চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তার সামনে বসেছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলিজিয়াম আর ইতালীর ডিটেকটিভরা।

ট্রিগনান্ট বলতে শুরু করলেন–ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের অপরাধ ঘটে চলেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে এবং চুরি হচ্ছে। খবরে প্রকাশ কয়েকজন নারী এর পেছনে আছে।

এবার ট্রিগনান্ট সুইচটিপে স্লাইডের মাধ্যমে ছবি দেখতে লাগলেন। প্রথমেই সোনালী চুলের এক মহিলার মুখ ভেসে উঠলো। কারোর বা লাল চুল, কারুর চুল কালো, কেউ

যুবতী, কেউ বৃদ্ধা, কেউ ইংরেজ অথবা কেউ ফরাসী। কেউ টেক্সাসের লোক। এরা কিন্তু কোথাও খুন জখম করেনি অথচ নিখুঁতভাবে কাজ করে চলেছে। ওইসব অপরাধীদের সম্পর্কে সামান্যতম সূত্র ইন্টারপোলের হাতে আসছে না।

ঠিক তখন দ্য গল এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামল ড্যানিয়েল কুপার। ট্রিগনান্টের লোক ছিল, সেখান থেকে ড্যানিয়েল কুপারকে জর্জ ফিফথ হোটেলে নিয়ে আসা হল।

ড্যানিয়েল কুপার কিন্তু ফ্রান্সে আসতে চায়নি, প্রায় জোর করেই তাকে এখানে পাঠানো, হয়েছে।

হোটেলের ঘরে ঢুকে সে প্রথমে বাথরুমে গেল। তারপর সুটকেসের তলায় সুটের মাঝখানে রাখা একটা সরু বাক্স ছিল, সেটাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। বাক্সটা থেকে বের করল, হলদে হয়ে যাওয়া বিবর্ণ এক টুকরো খবরের কাগজের অংশ।

সেখানে কি লেখা আছে? লেখা আছে খুনের বিচারে বালকের সাক্ষ্য। ফ্রেড জিমারের বিচারে সাক্ষ্য দিয়েছে। জিমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ড্যানিয়েল কুপারের মাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে। বালকটির সাক্ষ্য অনুসারে সে স্কুল থেকে ফেরার সময়ে দেখে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ফ্রেড জিমার হাতে ও মুখে রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে ড্যানিয়েল দেখতে পায় তার মা বাথরুমে পড়ে আছেন। দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন এবং সেখান থেকে হু হু করে রক্ত বের হচ্ছে।

জিমার ড্যানিয়েল কুপারের মায়ের সঙ্গে অবৈধ প্রেমের কথা স্বীকার করেছে কিন্তু তার বক্তব্য সে খুন করেনি। ছেলেটিকে তার পিসীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটাকে ভাজ করে আবার বাক্সের মধ্যে পুরে রাখলো ড্যানিয়েল কুপার, চোখ বন্ধ করলো, আবার চোখ খুলল। বাথটবের রক্তলাল জলে তার মায়ের নগ্ন মৃতদেহ ভাসছে, মাথা ঘুরে যেতেই কোনোরকমে মেঝেতে বসে পড়লো ড্যানিয়েল। তারপর? নেমে পড়লো রক্তের উষ্ণতায় ভরা সেই বাথটবের মধ্যে।

ইন্সপেক্টর ট্রিগনা বলছিলেন–আমি আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখতে চাই মিঃ কুপার, আপনার এইভাবে আসাটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আপনি পুলিশ দপ্তরের লোক নন।

বীমা কোম্পানীর নিযুক্ত একজন ডিটেকটিভ মাত্র। তবুও সকলের বিশেষ অনুরোধে এই ব্যাপারে আপনাকে আমি সহযোগিতা করব।

ড্যানিয়েল কুপার উত্তর দিল না। বলল–বেশ কিছু মক্কেল আমাদের সমিতির কাছে নালিশ জানিয়েছেন কিন্তু আপনারা এখনও পর্যন্ত কোনো সূত্র পাননি।

মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর ট্রিগনান্ট।

ইন্সপেক্টর ট্রিগনান্টকে একধিক প্রশ্ন করলেন ড্যনিয়েল কুপার। ট্রিগনান্ট বুঝতে পারলেন, লেকাটাকে দেখে বোকাসোকা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার মাথায় বুদ্ধির কারখানা।

শেষ পর্যন্ত ট্রিগনান্ট ড্যানিয়েলের কাছে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের গয়না চুরির কথাটা বললেন। চুরিটা কীভাবে হয়েছে, সেটা কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি।

ড্যানিয়েল বার বার বলল আসল লোকের মালপত্র তল্লাসী করা হয়নি। চোর ভালোভাবেই জানতো সবার মালপত্র তল্লাসী হবে, হবে না শুধু তারই যার জিনিস চুরি গেছে। আমার মনে হয় চোরের কাছে সিলভানা লুয়াডির সুটকেসের মতো কোনো সুটকেস ছিল। ভেনিসের প্ল্যাটফর্মে নিজের সুটকেসের সাথে ওই সুটকেসটা সে পাল্টে নিয়েছে।

ইন্সপেক্টর ট্রিগনান্ট ফোরনাতিকে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন–ওইদিন আপনাদের মালপত্রে কিছু অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিয়েছে কি?

–হ্যাঁ, কেন বলুন তো? বাড়িতে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর একটা সুটকেসে খালি বাজে কাগজপত্র পোরা। আসল সুটকেসটা আপনারা পেয়েছেন নাকি?

–না, স্যার, পেলে জানাবো। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে গুম হয়ে গেলেন ট্রিগনান্ট, এই ড্যানিয়েল কুপার লোকটা দেখতে কুৎসিত, কিন্তু এর মাথাটা এত পরিষ্কার হল কি করে?

.

২৪.

ইটন স্কোয়ারের ট্রেসির বাড়িটা দেখলে একটা স্বর্গ বলে ভুল হতে পারে। লন্ডনের কাছেই অভিজাত এলাকার বাসিন্দা হতে পেরে সে মনে মনে ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। এখানে সবই ভালো, মানুষজন পরিবেশ সবকিছু। ব্যাঙ্কে মোটা অর্থ জমিয়েছে

ট্রেসি। ইউরোপের বেশির ভাগ শহরের ব্যাঙ্কে টাকাটা ছড়িয়ে দিয়েছে। সবই আছে তার, নেই ভালোবাসার মানুষ, সুখের সংসার, নরম চেহারার শিশু। তার অতীত এবং বর্তমান নিশ্চয় তাকে এই ধরনের নিরাপত্তার পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দেবে না। ঠিক আছে এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবে সে।

ভেনিস থেকে ফেরার পর সে আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা একটা ককটেল পার্টি দেবে।

হারটগ বেশ হাসিমুখে বলল–তুমি ঠিক পথেই এগোচ্ছ ট্রেসি, কাল কারা কারা আসছে?

–অনেকেই।

এই অনেকের মধ্যে একজন হলেন অল্প বয়সী, সুন্দরী, ধনী ব্যারনেস হাওয়ার্থ। ট্রেসি মুখে হাসি ফুটিয়ে তকে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু ব্যারনেসের সঙ্গীটিকে দেখে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে হচ্ছে জেফ স্টিভেন্স।

–ট্রেসি তোমার সঙ্গে স্টিভেন্সের পরিচয় নেই বলে মনে হচ্ছে, আর ইনি হলেন মিসেস ট্রেসি হুইটনি, আমরা এরই অতিথি।

জেফ এগিয়ে এসে ট্রেসির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল–মিসেস হুইটনি, আমি আপনার স্বামীর বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ভারতে ছিলাম।

–তাই নাকি, ভারী মজার ব্যাপার, ব্যারনেস খুশি হয়ে উঠলেন।

–কি আশ্চর্য, ওর মুখে কখনও আপনার নাম শুনিনি? ট্রেসি নিস্পৃহ গলায় বলল।

–তাই নাকি? ভারী ভালো মানুষ ছিল, অবশ্য পরিণতিটা...

–কেন কি হয়েছিল? ব্যারনেস জানতে চাইলেন।

ট্রেসি উদাসীন হয়ে বলল–তেমন কিছু না।

–তেমন কিছু না মানে, বেচারাকে ভারতে ফাঁসী দিয়েছিল, জেফ অনুযোগের ঘুরে বলল।

ট্রেসি সঙ্গে সঙ্গে গলার সুর কঠিন করে বলল, ভারত নয় পাকিস্তানে, এবার মনে পড়েছে, আমার স্বামী আপনার নাম করতেন মাঝেমধ্যে।

এই খবর শুনে ব্যারনেসের মুখে লাল ঝলক। ব্যারনেস তাকালেন জেফের দিকে।

–তুমি তো কখনও বলনি যে তুমি বিবাহিত।

–সিসিলির সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে।

ট্রেসি মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলল–আমি কিন্তু রোজ-এর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। ব্যারনেসের মুখ এবার গম্ভীর হয়ে গেল–তুমি দু-দুবার বিয়ে করেছিলে।

–ওটা ছোটোবেলার ব্যাপার। বিয়েটা এমনিতেই নাকচ হয়ে গেছে।

জেফ আর সেখানে দাঁড়াতে চাইছে না, আবার ট্রেসি কোন্ দুষ্টুমি ভরা খেলায় মেতে উঠবে কে জানে?

–আর যমজ বাচ্চা দুটো।

ট্রেসি চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

–যমজ? ব্যারনেস দিশেহারা।

–ওরা ওদের মায়ের সঙ্গে থাকে, বলেই জেফ ব্যারনেসকে নিয়ে এগোতে এগোতে বলল–আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত।

পরদিন একটা দোকানে লিফটের দরজা যখন বন্ধ করছে তখন ট্রেসি দেখল ভেতরের জেফ, ট্রেসি জিজ্ঞাসা করল–কালকে এরপর কি ঘটেছিল?

জেফ দাঁতে দাঁত পিষল–

সে রাতে ট্রেসির ঘুম আসছিল না। জেফের সঙ্গে ব্যারনেসের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? পরমুহূর্তেই সে ভাবলো, সে জেফকে ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছে, তারা কোনো দিন বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না।

হারটগ ফ্রান্সে একটা কাজ নিয়েছে, সেই কথা চিন্তা করতে করতে ট্রেসি ঘুমিয়ে পড়ল।

প্যারিসে নিজের হোটেলে বসে ট্রিগনান্টের দেওয়া রিপোর্ট পড়ছিলো ড্যানিয়েল কুপার। রাত তখন প্রায় চারটে, কাদের কাজ এগুলো কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে।

এখনও তিনটে ফাইল বাকী। ব্রাসেলসে লেখা ফাইলটা নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল। কুড়িলাখ ডলারের গয়না চুরি গেছে জনৈক মিঃ ভ্যান রুইসেনের ভিলার আয়রন সেফ থেকে। ভদ্রলোক বেলজিয়ামের বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার, আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে একাধিক বার অভিযুক্ত হয়েছিয়েছিলেন।

তিনি ছুটি কাটাতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। এমন সময় চুরিটা হয়। হঠাৎ অ্যালার্ম ঘন্টা বেজে ওঠাতে পুলিশ ছুটে আসে। সদর দরজাতে দেখা হয়ে যায় জালের মতো পাতলা নাইটি পরা এক যৌবনবতী নারীর সঙ্গে। তার মুখে পুরু করে ক্রীম মাখানো। উনি নাকি মিঃ রুইসেনের অতিথি, পুলিশ বিশ্বাস করে চলে যায়, পরে বাড়ীর মালিকের কাছ থেকে খবর এসেছে ওই ধরনের অতিথি তার থাকার কথা নয়।

ড্যানিয়েল কুপার ফাইলটা নামিয়ে রাখল, যুক্তি আর যুক্তির সরণীতে সে এখন হাঁটবে। ইন্সপেক্টর ট্রিগনান্টের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, ভুল করছেন আপনি। আমি বলছি একজন মহিলার পক্ষে এতগুলো অপরাধ করা কখনই সম্ভব নয়।

–পরীক্ষা করে দেখা দরকার, ড্যানিয়েল কুপার বলল।

–কী ভাবে?

–প্রথমতঃ কোথায় কবে চুরি হয়েছে সেগুলোর তারিখ ঠিক করুন। ওইসব তারিখ মিলিয়ে বিদেশীদের আসার লিস্টে দেখুন মার্কিন মহিলা কজন আছে। জাল পাশপোর্ট থাকা অসম্ভব নয়। তবে মাঝেমধ্যে স্বনামে সে আসতে বাধ্য।

এবার ট্রিগনান্ট পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল। শেষপর্যন্ত সবার ওপরে নাম পাওয়া গেল ট্রেসি হুইটনি।

এই প্রথম একটা সঠিক সূত্র পাওয়া গেছে, ইন্টারপোল উঠে পড়ে লাগল। ট্রেসি হুইটনি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এমন কি জেলখানা থেকে ফটো পর্যন্ত চলে এল প্যারিসে। ড্যানিয়েল কুপারের এই আচরণে রেনল্ডস পর্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, অথচ কিছুই করার নেই, লোকটা অসম্ভব ধূর্ত এবং নিজের কাজ ভালোভাবে করতে জানে।

.

২৫.

পঁচিশ প্রত্যেক বছর জুন মাসের প্রথম শনিবার কাউন্ট দ্য মাতিগনি প্যারিসের শিশু হাসপাতালের জন্য একটা চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজন করে থাকেন। এখানে প্রবেশ করতে গেলে এক হাজার ডলার মূল্য দিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বড়ো লোকেরা ওইদিন পাগলের মতো প্যারিসে ছুটে আসেন।

মাতিগনির প্রাসাদের মতো বাড়িটি ফ্রান্সের এক দর্শনীয় স্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাড়ি। সমানের সুন্দর বাগান। নাচের দিন বিশাল নাচঘর খুলে দেওয়া হয়। প্রাসাদ সংলগ্ন ছোট

নাচঘরে দামী দামী পোশাক আর গয়না পরা ধনী নরনারীর ভিড় দেখা যায়। উর্দিপরা বেয়ারারা ঘুরে ঘুরে পানীয় পরিবেশন করছে। খাওয়া দাওয়ারও এলাহী ব্যবস্থা করা হয়।

সেদিন সাদা লেসের অত্যন্ত দামী গাউন পরেছে ট্রেসি, চুলটা উঁচু করে বেঁধেছে, সেখানে একটা হীরের টায়রা, সে নাচছিল গৃহকর্তা কাউন্ট মাতিগানের সঙ্গে। কাউন্টের বয়স ছেষট্টি বছর, স্ত্রী মারা গেছে, বেঁটে খাটো, স্বাস্থ্য ভালো। হারটগের কথা মনে পড়ে গেল ট্রেসির–শিশু হাসপাতালের জন্য কাউন্ট যে নাচের পার্টি দেন সেটা একধরনের জালিয়াতি। চাঁদার টাকার মাত্র দশভাগ দেন হাসপাতালে, বাকিটা কাউন্টের পকেটেই চলে যায়।

কাউন্ট নাচতে নাচতে বললেন–আপনি অসাধারণ নাচছেন তো?

ট্রেসি হাসতে হাসতে উত্তর দিল–আপনার মতো পার্টনার পেয়েছি বলে।

–আচ্ছা আমাদের আগে দেখা হয়নি কেন?

–দক্ষিণ আমেরিকাতে ছিলাম। আমার স্বামীর কয়েকটা খনি আছে ব্রাজিলে।

স্বামী আসতে পারেনি শুনে কাউন্ট আরও একটু জোরে ট্রেসির কোমর জড়িয়ে ধরলো। ঠিক সেই সময় মাথা তুলতেই ট্রেসি দেখলো জেফ একটা দারুণ সাজগোজ করা মেয়ের সঙ্গে নাচছে। মেয়েটা ওকে খিমচে ধরেছে। দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই দুজনেই হেসে ফেলল।

ট্রেসি ভাবলো ও ব্যাটার হাসার অধিকার আছে, গত দুটো কেসে জেফ ওর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার এখানে এসেছি, বেজন্মার বাচ্চাটা এখানেও পৌঁছে গেছে।

নাচতে নাচতে জেফ আর তার সঙ্গীনি কাউন্টের কাছে এল। পরিচয়ের পালা সারা হতেই খাওয়ার ঘন্টা পড়লো। কাউন্ট ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন অতিথিদের সামলাতে। জেফ তার সঙ্গিনীকে বলল–মাথা ধরেছে একটা অ্যাসপিরিন দাও তো।

মেয়েটা আড়াল হতেই জেফ তাড়াতাড়ি ট্রেসির খুব কছে এসে বলল–এখানে চুরির চেষ্টা কোরো না, আমার মনেও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা দেখে পিছিয়ে এসেছি। রাতের বেলায় খুনী কুকুর পাহারা দেয়। প্রত্যেকটি দরজা জানলায় ইলেকট্রিক কানেকশান করা আছে। তাছাড়া যেখানে দামী জিনিসগুলো আছে, সেখানে অদৃশ্য ইনফ্রারেড রশ্মির ছড়াছড়ি।

মুখ টিপে হেসে ট্রেসি বলল–আমি সবকিছুই জানি।

–তাহলে নিশ্চয় এটা জানো রশ্মির মধ্যে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিছু হবে না, বেরিয়ে এলেই ঘন্টা বেজে উঠবে। শরীরের তাপের সঙ্গে কী একটা সম্পর্ক আছে।

এটা ট্রেসি জানতো না তুমি এসব কথা আমায় জানাচ্ছো কেন?

–আমি চাই না তুমি ধরা পড়ো।

জেফের সঙ্গিনী অ্যাসপিরিন নিয়ে আসছে দেখা গেল।

দারুণ ভোজ হল। সবই বাছা-বাছা খাবার। ডিনারের পর কাউন্ট মাতিগান ট্রেসিকে বললেন–তুমি আমার ছবির গ্যালারী দেখবে বলছিলে না?

বিশাল হলঘরে পৃথিবী সমস্ত সেরা শিল্পীদের ছবি সাজানো আছে। ছবিগুলোর মূল্য হিসাব করা যায় না।

কাউন্টকে প্রশ্ন করলো ট্রেসি–পাহারার ভালল বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই রেখেছেন।

–হ্যাঁ, তিনবার চুরির চেষ্টা হয়েছিল, প্রথমজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে আমার ডোবারম্যান কুকুরের হাতে। দ্বিতীয়জন সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। তৃতীয়জন জেল খাটছে। এটা একটা দুর্গ বলতে পারো।

ট্রেসি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভান করে বলল–যাক আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

বাইরে তখন আতসবাজীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে। সেই সুযোগে বাড়ির চারপাশটা ট্রেসি ঘুরে ঘুরে দেখে নিলো। দোতলায় কাউন্টের শোবার ঘরে কুড়ি লাখ ডলারের গয়না আর দুটো অত্যন্ত দামী ছবি আছে, তার মধ্যে একটি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির।

পরদিন প্রায় নিঃশব্দে একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে দাঁড়াল কাউন্টের বাড়ির পিছনের উঁচু দেয়াল ঘেঁষে। আকাশে কালো মেঘ জমেছে, কনকনে ঠান্ডা। কালো রঙের পোশাক পরেছে ট্রেসি, হাতে দস্তানা। দেওয়ালে হাত রাখতেই ভেতর থেকে চাপা আর ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল।

ট্রেসি পিছন ফিরে শিস দিতেই গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল একটি মাঝবয়সী পুরুষ। সঙ্গে একটা মাদী ডোবারম্যান, সেই কুকুরটি ঋতুমতী।

দেওয়াল টপকে মাদীটিকে ভিতরে ফেলে দিতেই গর্জন, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর সব চুপচাপ।

ট্রেসি তার সঙ্গীকে বলল–চলো ঢোকা যাক।

সঙ্গীটির নাম জাঁ লুই। জীবনের বেশির ভাগটাই সে জেলে কাটিয়েছে। খুব একটা চালাক চতুর নয়। কিন্তু তালা খোলা আর অ্যালার্ম কাটার ব্যাপারে সে সিদ্ধহস্ত।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে দুজনে ঢুকলো। আই ভি লতা বেয়ে। তারা ছাদে পৌঁছলো। জাঁ লুই খুব সহজেই স্কাই লাইটের কঁচটা কেটে ফেলল। অ্যালার্ম ঘন্টার বৈদ্যুতিক তারগুলো সঙ্গে আনা হুক লাগানো তারের সঙ্গে জুড়ে দিল।

হলঘরে ঢুকে ট্রেসি ব্যাগ থেকে দুটো ইনফ্রায়েড লেন্স লাগানো চশমা বের করলো। চশমা পড়তেই দেখতে পেল কীভাবে রশ্মিগুলি এক প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়ানো আছে। দুজনে সেটা এড়িয়ে ধীরে ধীরে কাউন্টের বেডরুমের কাছে পৌঁছলো। কাউন্ট এখানে নেই, গতকাল তিনি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটা নির্জন দ্বীপে বেড়াতে চলে গেছেন। ট্রেসি টর্চ মেরে দেখলো দেওয়ালে ঝোলানো লিওনার্দোর ছবি, কিন্তু এখানেও ইনফ্রা-রেড রশ্মি। ট্রেসি আর লুই একসঙ্গে রশ্মির মধ্যে ঢুকলো। তারপর লুই একা বেরিয়ে গেল, ট্রেসি নড়লো না। ফলে অ্যালার্ম বাজলো না। মিনিট দশেকের মধ্যে তারা তালা খুলে

বিশলাখের জড়োয়া গয়না আর লিওনার্দোর ছবি নিয়ে নিচে নেমে এল। এবার রশ্মি ছেড়ে পালাতে হবে।

রশ্মি থেকে যতটা সম্ভব পিছিয়ে এসে দুজনে দৌড়ল। তারা স্কাই লাইটের দিকে ছুটছে। রশ্মি থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে তীব্র শব্দ হতে শুরু করল।

কোনো রকমে দড়ির মই বেয়ে বাইরে এসে ভ্যানে বসে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গাড়ি ছুটছে রাস্তা দিয়ে, হেড লাইটের আলো পড়ল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটা গাড়ির ওপর। ড্রাইভারের আসনে জেফ, পাশে একটা ডোবারম্যান।

ট্রেসি মনে মনে উল্লাসে ফেটে পড়ল। যাক, আরও একটা অভিযানে সে সফল হয়েছে। দূর থেকে শোনা গেল পুলিশের গাড়ির সাইরেন!

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল

২৬.

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ইউরোপের প্রমোদ বিলাসীদের অন্যতম গন্তব্য স্থান। এখানে জুয়া খেলার জন্য অনেকে আসেন, একদা বিখ্যাত বেলভিউ ক্যাসিনো মেরামতির জন্য দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ। এখন নতুন ক্যাসিনো চালু হয়েছে। বেশির ভাগ ধন কুবেরের নিজস্ব বাড়ি আছে এই অঞ্চলে। যাদের নেই তারা ওঠেন হোটেল দ্যু-প্যালেতে, এটি ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ানের প্রাসাদ।

একদিন ওই হোটেলে ঢুকলেন মার্গারিয়েট দ্য স্যান্তিনি। যেমন দামী পোশাক তার তেমনই সুন্দর তার রূপ যৌবনের বাহার। সকলে হাঁ করে তাকে গিলতে থাকলো। কাউন্টারে গিয়ে নিজের সুইটের চাবি চাইলেন ব্যারনেস, সুইটের কাছে পৌঁছেছেন এমন সময় চশমা পরা এক বিধস্ত চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল ভ্যানিটি ব্যাগ। বার বার ক্ষমা চেয়ে চলে গেলেন ওই ভদ্রলোক।

ব্যারনেসের সুইটের নম্বর ৩১২, এটাই ওই হোটেলের সেরা সুইট। বেডরুমে ঢুকে ব্যারনেস তার পরচুল আর পোশাক খুলে ফেললেন। এবার বেরিয়ে এল ট্রেসির আসল রূপ।

যার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম লোকটা কে? ট্রেসি কিছুক্ষণ চিন্তা করল।

সন্ধ্যে আটটার সময় হোটেলের বারে বসে ব্যারনেস শ্যাম্পেন খাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই ধাক্কা খাওয়া পুরুষটি এগিয়ে এলেন। সকালের ঘটনাটার জন্য ভীষণভাবে লজ্জিত ঠিক আছে।

–আপনি খুব ক্ষমাশীল দেখছি, যদি কিছু মনে না করেন আমি কিছু খাওয়াই আপনাকে।

–ঠিক আছে।

ভদ্রলোক বসলেন ট্রেসির সামনে। আমি অধ্যাপক অ্যাডিলফ জুফারম্যান।

–আমি মার্গারিয়েট দ্য স্যান্তিনি।

–কি খাবেন? না না খুব দামী কিছু খাওয়াবার মতো অবস্থায় আসতে পারিনি।

–তার মানে?

–কিছুই না, একজন দরিদ্র অধ্যাপক ছিলাম আমি, ইতিহাস পড়াতাম, স্প্যানিশ আর্মাডা নিয়ে গবেষণা করতে করতে জানতে পারলাম ১৫৮৮ সালে প্রিন্স ফিলিপের সোনা ভর্তি একটা জাহাজ ডুবে যায়। আমি তার ম্যাপটা খুঁজে পেয়েছি, অর্থাৎ জাহাজটা কোথায় ডুবেছে।

জুফারম্যান শেষের কথাগুলো বললেন একটু গলা নামিয়ে।

–কী অসাধারণ আবিষ্কার আপনার, ট্রেসির গলায় প্রশংসার সুর।

–ওখানে যা সোনা আছে তার বাজার দর পাঁচকোটি ডলার। জুফারম্যান বলছিলেন– আমার কাজ শুধু সেগুলো উদ্ধার করা।

–বাধাটা কোথায়?

–টাকা পয়সা। অভিযানে যেতে গেলে অনেক খরচ হবে।

–কত টাকা দরকার?

–এক লাখ ডলার। আমি আমার শেষ পুঁজি কুড়ি হাজার ডলার নিয়ে এখানে এসেছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম জুয়ায় জিতে এক লাখ ডলার নেবো। কিন্তু...

–কিন্তু সব হেরে বসে আছেন?

শ্যাম্পনে চুমুক দিতে দিতে ট্রেসি বলল–কিন্তু ওখানে যে সোনা আছে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

–একশো পার্সেন্ট, পুরনো ম্যাপটি আমি পেয়েছি।

–এক লাখ ডলারে কার্যোদ্ধার হবে? ট্রেসি জানতে চাইলো।

–নিশ্চয়ই।

সূচিপত্র

–পার্টনার নিলে হয় না?

–না না, অধ্যাপক মাথা নাড়লেন। এটা আমার সারজীবনের সাধনার ধন, আমি কাউকে বখরা দেব না।

–আপনার সব সঞ্চয় তো শেষ হয়ে গেছে। ধরুন আমি যদি একলাখ ডলার দিই।

–না, ব্যারনেস তা হয় না, আপনার মতো এক মহিলাকে এর মধ্যে জড়াতে পারবো না।

অনেক সাধ্য সাধনার পর ট্রেসি প্রফেসরকে রাজী করলো, যা সোনা উদ্ধার হবে তা আধাআধি বখরা। দুজনে মদের গ্লাস ঠেকিয়ে ব্যবসা পাকা করলেন। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ ট্রেসি দেখল দারুণ গয়না পরা এক সুন্দরী মহিলার সাথে এক কোণে টেবিলে বসে আছে জেফ। তার দিকে তাকিয়ে সে হাসছে।

অধ্যাপক খুশি হয়ে চলে গেলেন বন্দোবস্ত করতে। ট্রেসি দুদিন বাদে টাকাটা দেবে। কয়েক মিনিটের জন্য জেফ চলে এল ট্রেসির টেবিলে।

-কী চমৎকার লাগছে তোমাকে, প্রফেসরের চেয়ারটায় বসতে বসতে জেফ বলল– মাতিগনির বাড়ির কাজটা নিখুঁত হয়েছে একথা বলতেই হবে।

–তোমার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা-ট্রেসি হাসতে হাসতে বলল।

–তা প্রফেসার জুফারম্যান কি বলছিলেন?

–তুমি চেনো ওকে, ট্রেসি অবাক হয়েছে।

–হ্যাঁ, ডুবো জাহাজের সোনার কথা নিশ্চয়ই বলেছেন তোমাকে।

–তুমি কী করে জানলে?

–আরে এই ধরনের জোচ্চুরির খেলা বহুদিন ধরে চলে আসছে।

–এটা কিন্তু মিথ্যে নয়।

–বলো কি ট্রেসি? তুমি জুফারম্যানের কথা বিশ্বাস করেছে? এরপর হয়তো বলবে মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছো?

–আমার ব্যাপারে তুমি নাক গলাবে না জেফ। টাকাটা আমার তাই আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

–নিশ্চয়ই, কিন্তু পরে বোলো না জেফ তোমাকে সাবধান করে দেয়নি।

–ওই সোনার ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ নেই?

–আচ্ছা ট্রেসি তুমি সব ব্যাপারে সন্দেহ করো কেন বলোত?

–সোজা কথা আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, তোমার সঙ্গে ওই মেয়েমানুষটা কে?

–সুসান।

–ধনী নিশ্চয়ই...

–তা বলতে পারো। বাদ দাও ওসব কথা। এখানকার বিখ্যাত গেলোটা খেলা দেখতে যাবে?

–যাবো, ট্রেসি না বলতে পারলো না।

সিমেন্ট কংক্রিটের দেওয়ালে বল ছুঁড়ে মারতে হয়, বলটা যখন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে তখন হাতের সঙ্গে বাঁধা লম্বা সরু ঝুড়িতে সেটাকে ধরে দিতে হবে। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এক সময় দুদল সমর্থকদের মারামারি লেগে গেল। ভীড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ট্রেসিকে বুকের মধ্যে আড়াল করার চেষ্টা করতে গিয়ে দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। ভীড় কমলো, ট্রেসিকে টেনে তুলল জেফ। ট্রেসি তাড়াতাড়ি নিজেকে জেফের বাহু বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু তার মনের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ জেগেছে।–তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরলো ট্রেসি। যাবার আগে জেফ শেষবারের মতো বলে গেল ডোরা জাহাজের সোনা সম্বন্ধে যেন আরেকবার চিন্তা করে।

ঘরে আসতেই দেখে প্রফেসর জুফারম্যানের চিঠি।

প্রফেসর জুফারম্যান বিরাট সংকটের মুখে পড়েছেন। আমান্দ গ্র্যাঞ্জিয়ারের দপ্তরে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমান্দ-এর একটা ব্যক্তিগত ক্যাসিনো আছে। সেখানে নির্দিষ্ট

অংকের জুয়া চলে। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে আমার ক্যাসিনোয় লক্ষ লক্ষ ডলারের খেলা হয়। জুয়ার যন্ত্রগুলোর মধ্যে কারচুপি থাকে।

এই বিয়ারিজে সামান্য অবস্থায় এসেছিল আর্মা। ধীরে ধীরে অসৎ পথে প্রচুর পয়সার মালিক হয়েছে। পুলিশ মহল থেকে সকলেকে হাত করেছে। বেঁটে-খাটো চেহারার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ, আর ঠোঁটে সবসময় লেগে থাকে রমণী-মোহন হাসি।

–এই ব্যারনেস সম্বন্ধে তুমি কী জানো? আমার কণ্ঠস্বরে এমন একটা হিংস্রতা ফুটে উঠেছিল যে প্রফেসর কাঁপতে শুরু করে দিলেন।

–বলছিল সে ধনী বিধবা, অনেক টাকা আছে... প্রফেসরের কথা শেষ হবার আগেই আমান্দ বলল–মিথ্যা কথা বলেছে, একটু আগে আমাদের প্যারিসের এজেন্ট খবর দিয়েছে। ব্যারনেসের পাশপোর্টটা তারই জাল করা। ওর আসল নাম ট্রেসি হুইটনি।

–কিন্তু সর্দার, ব্যারনেস সত্যিই টাকাটা দিতে চায়।

–ঠিক আছে। দেখছি ও কত বড়ো জোচ্চোর। তুমি এখুনি মেয়েটাকে ফোন করে জানাও অন্য একজন অর্ধেক টাকা দিতে রাজী হয়েছে। সে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে সমুদ্রের তীরে। ওকে নিয়ে এসো ওখানে, তারপর দেখাচ্ছি মজা।

আর্মান্দ গ্র্যাঞ্জিয়ার বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। মাঝেমধ্যে যারা সোনার, ফাঁদে পা দেয় তারা বোকা কিন্তু এই মেয়েটা একজন সেরা জোচ্চোর, তবে কেন ওই ফাঁদে পা দিচ্ছে?

কী ভেবে আমান্দ চলে এল ট্রেসির হোটেলে। ডেস্ক ক্লার্ক তার অনুগত লোক। ব্যারনেসের সব খবর এবং সুইটে ঢোকার চাবি নিয়ে চুপি চুপি চলে এল ট্রেসির ঘরে। দরজার সামনে পৌঁছে দেখলো সেটা আধ ভেজানো।

–হ্যালো কে এলেন; আমি বাথরুমে আছি, এখুনি আসছি, ট্রেসির গলা শোনা গেল।

ধীর পায়ে আমান্দ চলে এল শোবার ঘরে। খাটের ওপর পোশাক আর দামী গয়না, ছড়ানো। বাথরুম থেকে আবার ট্রেসির গলা শোনা গেল। প্রফেসর একটু বসুন। এক মিনিটে আসছি। ফ্রিজে মদ আছে নিয়ে ততক্ষণ খান।

–তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই ব্যারনেস।

ব্যারনেস? তোমার শয়তানি আমি শিগগীরই ঘোচাবো।

তালা দেওয়া পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল আর্মা। চাবি দিয়ে খুলতেই দেখলো যে ঘরটা প্রায় ফাঁকা। এমন ঘর কেউ কি টাকা দিয়ে ভাড়া নেয়? হঠাৎ তার নজরে পড়ল প্লাগ থেকে একটা মোটা তার পাশের কাঠের আলমারির মধ্যে ঢুকে গেছে।

খুলতেই দেখা গেল আলমারির মধ্যে সুতোতে ক্লিপ দিয়ে ঝোলানো আছে কয়েকটা একশো ডলারের ভিজে নোট। টাইপ রাইটারের মতো ছোট্ট একটা মেসিন কাপড়ে ঢাকা।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন গর্জন করলো, এখানে আপনি কি করছেন? আর্মাল চমকে ফিরে তাকালো, ট্রেসি হুইটনি তোয়ালে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমান্দ খুব আস্তে আস্তে বলল–জাল নোট? এই জাল তুমি আমাদের দিতে চেয়েছিলে?

ট্রেসির মুখে অস্বীকৃতি, অপমান এবং প্রতিবাদের ছাপ।

–তাই যদি হয়, ট্রেসি বলল, তাহলে অন্যায়ের কিছু নেই। এগুলোর সঙ্গে আসল নোটের কোনো পার্থক্য নেই।

আমান্দ একটা নোট আলোতে তুলে পরীক্ষা করে দেখলো হ্যাঁ, প্রায় নিখুঁত।

–আগামী শুক্রবারের মধ্যে আমার একলাখ ডলার দরকার, তাই ছাপছি। আমান্দ হেসে ফেলল, সেই সঙ্গে চমকেও উঠলো, মাই গড, তুমি কি সত্যিই ডোবা জাহাজের সোনার কথা বিশ্বাস করেছো?

–কেন? প্রফেসর জুফারম্যানের মতো পন্ডিত লোক?

–নির্বোধ, ওটা ভাওতা, শোনো ব্যারনেস, আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত হোটেল ছাড়া যাবে না।

আমান্দ গ্রাঞ্জিয়ার ট্রেসিকে ব্রুনোর হাতে তুলে দেয়ার আগে নোটগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো। জুফারম্যানকে একটা নোট দিয়ে পাঠালো ব্যাঙ্কে। যদি নোটটা জাল হয় তাহলে জুফারম্যান জেলে যাবে। তাই যাক বোকা হাঁদাটা।

কিন্তু কি আশ্চর্য নোট ভাঙানো হয়ে গেল। এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্য ট্রেসির ছাপা আরও দুটো নোট দিয়ে জুফারম্যানকে পাঠালো ব্যাঙ্কে।

–দেখুন ম্যানেজার, কাল জুয়াখেলায় বেশ কিছু মার্কিন ডলার আমি জিতেছি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমাকে জাল নোট গছিয়েছে। দেখুন তো দয়া করে, প্রফেসর জুফারম্যান নিরীহভাবে কথাটা পাড়লেন ব্যাঙ্কে, মেশিন পরীক্ষা করে জানালো দুটো নোটই খাঁটি।

খবরটা পেয়ে আমান্দ তখন দ্রুত চিন্তা করে নিল। এবার ট্রেসিকে অন্য ব্যাপারে দরকার।

আর্মান্দ বলল–আমার দুজনে পার্টনার হয়ে কাজ করবো।

ট্রেসি বলল, না, এসব কাজে পার্টনারশিপ আমি পছন্দ করি না।

–এই শহরটা আমার। ওই নোটটা চালাবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বিপদে পড়বে। তুমি নিশ্চয়ই জানো জেলখানায় তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদের কি হাল হয়? প্রাণের মায়া থাকে তো আমার কথা মেনে চল।

ট্রেসি বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

আর্মা জানতে চাইলো, এবার বলল, ছাপাখানাটা কোথা থেকে পেয়েছো?

ট্রেসি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল–এক মার্কিন ভদ্রলোক আমেরিকার টাকশালে খোদাইয়ের কাজ করতেন, পঁচিশ বছর চাকরি করার পর অবসর নিয়েছিলেন। সামান্য কারণ দেখিয়ে তার পেনশন আটকে দেওয়া হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্য কয়েকটা ছাঁচ চুরি করে নিয়ে চলে আসেন। উনি সুইজারল্যান্ডে থাকেন। ওঁর কাছ থেকে আমি কিনেছি ওগুলো। ট্রেজারী ডিপার্টমেন্টের লোক জানাশোনা আছে, সেখান থেকে নোটের কাগজ জোগাড় করি।

আর্মান্দ এবার নিশ্চিন্ত হল, তাই নোটগুলো একেবারে আসলের মতো।

–একদিনে কটা নোট ছাপা যায় ওই মেশিনে?

–ঘন্টায় একটা।

–আরও বড়ো মেশিন আছে?

–আছে, আট ঘন্টায় পঞ্চাশটা ছাপা যায়। কিন্তু সেটার দাম চেয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ ডলার।

–ওটা কিনে ফেলল।

–আমার অত টাকা নেই।

–আমার আছে, এই বলে আর্মান্দ চোখ তুলে কাকে যেন ডাকলো। ওক্যাসিনোর ব্যাঙ্ক-এর ভল্ট থেকে এখুনি পাঁচ লক্ষ ডলারের সমান ট্র্যা নিয়ে এসো।

–মানে আপনি কি এখুনি।

–হ্যাঁ, এখুনি চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তারপর মনে মনে ভাবলো মেশিনটা পেয়ে নোট ছেপে ক্যাসিনোর ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবে আর প্রয়োজন হলে পার্টনারদের জানাবে। আর মেশিনটা হাতে আসার পর ব্রুনো এই মেয়েটার ভার নেবে।

দুঘন্টার মধ্যে বড়ো ব্যাগে ভর্তি টাকা এসে গেল।

–নাও ফোন করো সুইজারল্যান্ডে।

–ফোন নম্বরটা হোটেলে আছে।

–চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। টাকা নিয়ে যাও।

মেশিন এয়ারপোর্টে নামলেই আমরা ডেলিভারী নিয়ে নেবো। সঙ্গে জুফারম্যান যাচ্ছে সে নজরে রাখবে। রাত আটটার সময় দেখা হবে, তার মধ্যে সব কাজ শেষ করতেই হবে।

আমান্দ গ্র্যাঞ্জিয়ার সারা দিন সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলো। আধ ঘন্টায় ৫০টা সারাদিনে দেড়শো, মানে পনেরো হাজার ডলার, সপ্তাহে এক লাখ। দশ সপ্তাহে দশ লাখ–আর্মান্দ আর ভাবতে পারছে না।

ঠিক রাত আটটার সময় সে পৌঁছলো হোটেল দ্যু পালেতে। লবিতে একভাবে বসে আছে জুফারম্যান। ওপর থেকে নামার দরজাতে কড়া নজর তার।

আহা বেচারী, মনে মনে ভাবলো আর্মান্দ।

ডেস্কের কাছে গিয়ে ব্যারনেসের খবর নিলো, শুনলো উনি চলে গেছেন। তবে জিনিসপত্র নিয়ে যাননি শুনে আমান্দ নিশ্চিন্ত হল। তার মানে মেয়েটা বোধহয় সুইজারল্যান্ডে গেছে মেশিনটা আনতে।

ট্রেসির সুইট যেমন ছিল তেমনই আছে। পাশের ঘরটা খুলে দেখলো মেশিনটা এখনও আছে। তার মানে পাঁচ লাখ ডলার নিয়ে পালালেও আসল মালটা নিতে পারেনি। এরপর ওকে জেলের ঘানি টানতেই হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে আমান্দ পুলিশে ফোন করলো, মিনিট পনেরো বাদে ইন্সপেক্টর দুমোন্ত উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একজন কুৎসিত দর্শন মানুষ। এই ইন্সপেক্টর আমান্দর বিশেষ পরিচিত।

–ইনি হলেন মিঃ ড্যানিয়েল কুপার, ইনিও ওই ট্রেসি মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কুপার বলল–আপনি জানিয়েছেন ওই মেয়েটা নোট জাল করে?

–হ্যাঁ প্রমাণ আছে, বলে কাঠের আলমারিটা খুলে মেশিনটা দেখিয়ে আমান্দ জানালো এই মেশিনে নোট ছাপানো হয়। এই দেখুন ছাপানো নোট।

কুপার নোটটা আর মেশিনটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল–নোটটা আসল আর এটা চিঠির কাগজ ছাপার মেশিন।

চিঠির কাগজ ছাপার মেশিন, আর্তনাদ করে উঠল আর্মা–তার মানে? মনে মনে। ভাবলো, মেয়েটা ডোবাজাহাজের সোনার ফাঁদে পা দেয়নি, উল্টে তাদের বুদ্ধ বানিয়ে পাঁচলাখ ডলার নিয়ে চলে গেছে।

–মেয়েটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় কি?

ইন্সপেক্টর দুমোন্তের প্রশ্ন শুনে আমান্দ রেগে গিয়ে বলল, না, সেসব কিছুই করা চলবে না। মনে মনে ভাবতে লাগলো সে পার্টনারদের কি বলবে। তার থেকে আফ্রিকায় পালিয়ে যাওয়া ভালো।

ড্যানিয়েল কুপার ভাবছিলো আরও একবার ফসকে চলে গেছে, কিন্তু পরের বার ওকে ধরতেই হবে।

.

২৭.

হারটগকে বলা ছিল সে যেন মাজোবকায় এসে দেখা করে। ছবির মতো সুন্দর এই মাজোবকা দ্বীপ। একসময় এটি ছিল জলদস্যুদের প্রিয় আস্তানা। হারটগ লন্ডন থেকে ফোন করে একটা নতুন কাজের কথা জানিয়েছিল, তাই দেখা করা দরকার।

বিয়ারিৎজ ছাড়ার পর ইন্টারপোল ট্রেসিকে অনুসরণ করে মাজোবকায় হাজির হয়েছে। সমভিদা হোটেলে ট্রেসির সুইটের ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখছে পুলিশ।

ড্যানিয়েল কুপার চলে এসেছে স্থানীয় কমান্ডান্ট এরনেস্টো মায়জেকে সাহায্য করার জন্য।

ট্রেসির চলাফেরা দেখে তাকে নিছক ট্যুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ড্যানিয়েল কুপার বিশ্বাস করেন এখানে ট্রেসি কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মাজোবকায় প্রচুর গুহা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুহাটির নাম ড্রাগনের গুহা। গুহার ভেতরটা গোলক ধাঁধার মতো, সেখানে নানা রঙের পাথর ছড়ানো আছে, মাঝে মাঝে আছে বিচিত্র জলধারা। ড্যানিয়েল কুপার দুজন গোয়েন্দাকে নিয়ে ট্রেসিকে অনুসরণ করছে। এক সময়ে প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে ট্রেসি হারিয়ে গেল।

গুহার শেষ প্রান্তে একটা হ্রদের মতো জায়গা, সেখানে এক কালে রোমান থিয়েটার ছিল। তার একপাশে ট্রেসি হারটগের সঙ্গে দেখা করল। চারপাশে তাকিয়ে হারটগ বলল–আমার এক ধনী মক্কেল মাদ্রিদ শহরের প্রাদো মিউজিয়ামে সুরক্ষিতভাবে রাখা গোইয়ার আঁকা বিখ্যাত পুয়ের্তো ছবিটা কিনতে চাইছে। যদি তুমি ওটা আনতে পারো তাহলে তোমাকে পাঁচ লাখ ডলার দেওয়া হবে।

একটু ভেবে ট্রেসি বলল–আর কেউ ওটা চুরি করার চেষ্টা করেনি?

–নিশ্চয়ই করেছে। তবে ওদের কারো মাথায় তোমার মতো হলদে ঘিলু নেই। ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করেছে, ট্রেসি বেরিয়ে গেল। গুহার মুখে ড্যানিয়েল কুপার দাঁড়িয়েছিল, অবাক হয়ে সে দেখলো ট্রেসি একাই বেরিয়ে যাচ্ছে।

.

২৮.

স্পেনে যতো হোটেল আছে তার মধ্যে মাদ্রিদের রিজ হোটেল সব থেকে বিখ্যাত। ট্রেসি এরই একটা দামী সুইটে উঠেছে। তার ঘরের জানলা দিয়ে মিউজিয়ামটা পরিষ্কার দেখা যায়। আর এই কারণেই ঘরটা ভাড়া নিয়েছে সে।

মাদ্রিদের পুলিশ প্রধানের কাছে খবর এসেছে ট্রেসি ইতিমধ্যেই মাদ্রিদে পৌঁছেছে। প্যারিসের ইন্টারপোল ইন্সপেকটর ট্রিগনান্টের কাছে ওই খবর পৌঁছে গেছে।

ড্যানিয়েল কুপার পুলিশের প্রধানের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে মেয়েটার ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে। ও কিন্তু ভীষণ চালাক, দিনের পর দিন ধরে গোটা পুলিশবাহিনীকে ঠকাচ্ছে।

ট্রেসির ঘুম ভাঙলো বেশ দেরীতে। জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকালো, মিউজিয়ামে লাইন পড়ে গেছে বোধহয়। হঠাৎ ট্রেসিকে চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠলো।

কণ্ঠস্বর ট্রেসির পরিচিত–আমি মাদ্রিদ চেম্বার অফ কমার্স থেকে বলছি, আপনাকে দেখা শোনা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।

ওই কথা শুনে ট্রেসি খুবই অবাক হয়ে গেল, সে জানতে চাইলো–আমি যে এখানে এসেছি তুমি তা কি করে জানলে জেফ?

–সব জানতে হয় চেম্বার অব কমার্সকে। ভালো কথা, প্রথম এসেছো যখন সব ঘুরে ফিরে দেখো, আমি না হয় তোমার গাইড হব। আমার সঙ্গে তুমি ডিনার খাবে?

ট্রেসি জেফকে অপছন্দ করলেও মুখের ওপর না বলতে পারলো না। লিফট থেকে নেমে লবিতে পা রেখে ট্রেসি দেখলো জেফ দাঁড়িয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রেসির ভালো লাগল। হাজার হোক মাদ্রিদ দেশে এর আগে কখনও আসেনি সে। ড্যানিয়েল কুপার দেখলো দুজন হাত ধরাধরি করে চলেছে।

ড্যানিয়েল জানে একমাত্র সে ছাড়া ট্রেসিকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

ওরা দুজন ঢুকলো একটা রেস্টুরেন্টে, জেফ বলল–শুনেছো, গোয়েন্দা ড্যানিয়েল কুপার এখানে এসেছে। দারুণ বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। সাবধানে থেকে একটু।

–আমার ব্যাপারে তুমি কেন এত চিন্তা করো বলো তো?

–আমার কাছে তুমি বিশেষ কিছু একটা, তুমি কাছে থাকলে আমার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জেফ ট্রেসির হাতের ওপর হাত রাখলো। ট্রেসি ওর আন্তরিকতায় হয়তো বিশ্বাস করতো, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে জেফের অতীত সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে ফেলেছে। এই ধরনের মানুষকে সবসময় দূরে দূরে রাখতে হয়।

বেশ কয়েকটা দিন ট্রেসি আর জেফ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালো, ড্যানিয়েল কুপার আর দুজন স্থানীয় গোয়েন্দা আঠার মতো লেগে রইল তাদের সঙ্গে।

জেফের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তার অতীতটা খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু ড্যানিয়েল কুপারের মন কিছুতেই মানছে না ট্রেসি এখানে শুধু বেড়াতে এসেছে।

ট্রেসি একদিন নিজেকেই প্রশ্ন করলো-জেফ সম্পর্কে আমার কি ধারণা?

চার্লসের সঙ্গে ওই ঘটনা ঘটে যাবার পর এই প্রথম একজন পুরুষ তার হৃদয়কে দোলা দিয়েছে এটা অস্বীকার করতে পারছে না সে। কিন্তু এটা কি তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয়?

একদিন জেফ ট্রেসিকে নিয়ে মাদ্রিলেনোতে গেল, এখানে দারুণ খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় জিপসী সুন্দরীদের নাচ, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে ফ্লাখেঙ্গে। বাজনা এবং নারী-পুরুষের উদ্ধত অঙ্গ-ভঙ্গীগুলি খুবই উত্তেজক, হঠাৎ ট্রেসি দেখলো তার সমস্ত অঙ্গ বাজনার তালে তালে নেচে উঠেছে।

.

২৯.

পরদিন সকাল ১০টায় ট্রেসি প্রাদো মিউজিয়ামের গেটে লাইন দিয়েছে।

এই মিউজিয়ামে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির এবং বিরলতম সংগ্রহ আছে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ড্যানিয়েল তার সঙ্গে ঘুরছে।

একটা ঘরে বই আর ছবি, ট্রেসির হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে থাকে, ওই তো সেই ছবি পুয়ের্তো, হঠাৎ ট্রেসির নজর পড়লো জেফের ওপর। সেও দূর থেকে ছবিটাকে এক দৃষ্টিতে দেখছে। তাহলে? আবার একটা লড়াই শুরু হয়ে গেল? ট্রেসির চোয়াল শক্ত হয়েছে, যে করেই হোক এই লড়াইতে জেফকে সে হারাবেই।

ড্যানিয়েল কুপার বলল–প্রাদো থেকে ও ছবি চুরি করতে এসেছে।

এই কথা শুনে গোয়েন্দা প্রধান রামিরো বললেন–আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি তা।

ড্যানিয়েল কুপার জানে যে করেই হোক ট্রেসি ছবিটা চুরি করবেই, পুলিশ ওর কিছু করতে পারবে না।

.

২৯.

হারটগের কথাটা মনে পড়ে গেল ট্রেসির সাফল্য লাভ করার চান্স কম তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। ছবিটা চুরি করলেও বাইরে আনা যাবে না। রাতের বেলায় ছাদ দিয়ে

ঢুকেও ফল হবে না, অ্যালার্ম ঘণ্টার তার চারপাশে ছড়ানো আছে। আছে অদৃশ্য–ইনফা রেড আলোক রশ্মি। বাইরে অনবরত ফ্লাড লাইট ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরদিন আবার ট্রেসি গিয়ে পুয়ের্তোর সামনে দাঁড়াল। আগের মতোই প্রহরার ব্যবস্থা। শখের শিল্পীরা ক্যানভ্যাস আর তুলি নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছে। ট্রেসির হঠাৎ মনে হল সে এই কাজটা করতে পারবে।

সে পাবলিক বুথে ঢুকলো। ফোন করল। ড্যানিয়েল কুপার সামনের কফি বারে বসে লক্ষ্য রাখলো তার ওপর। কাকে ফোন করছে জানবার জন্য সে সর্বস্ব পণ করতে পারে।

ফোন নামিয়ে রাখার আগে শেষবারের মতো ট্রেসি মনে করিয়ে দিচ্ছিলো গান্থার হারটগকে–এটা নিশ্চয় মনে রাখবে যে লোকটার হাত যেন খুব দ্রুত চলে। মাত্র দুমিনিট সময় পাবে সে, ইতিমধ্যে কাজটা সারতে হবে, আশা করি তুমি বুঝতে পারছো গতির ওপরেই কাজটার সাফল্য নির্ভর করছে।

ড্যানিয়েল কুপার রেনল্ডসকে চিঠি লিখে জানলো ট্রেসি প্রাদো মিউজিয়ামে কিছু একটা চুরি করার জন্য ঢুকেছে, ট্রেসির ওপর আমি কড়া নজর রেখে চলেছি।

দুদিন পর সকাল নটার সময় দেখা গেল মাদ্রিদ শহরের মাঝখানে রেটিনো পার্কে ছোট পুকুরের পাড়ে বসে ট্রেসি অলস ভঙ্গিতে হাঁসেদের পাউরুটির টুকরো খাওয়াচ্ছে।

একটু বাদে পাকাচুলের একজন বয়স্ক লোক সেখানে এসে হাজির হলেন, তার পিঠ সামান্য কুঁজো, তিনি বেঞ্চির অন্য ধারে বসে বসে কাগজ পড়তে লাগলেন। তার নাম সীজার পোরেটা।

তিনি বললেন–গুডমর্নিং ম্যাডাম।

–গুডমর্নিং, কোনো অসুবিধা আছে?

–না না, তারিখ আর সময়টা জানিয়ে দিন।

–এখনও ঠিক হয়নি।

–পুলিশ কিন্তু ক্ষেপে যাবে, আজ অবধি কেউ এ কাজ করতে পারেনি।

–তার জন্য সুবিধা অনেক, চলি পরে দেখা হবে। ট্রেসি যখন পার্কে তখন ড্যানিয়েল কুপার তার হোটেল ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। ট্রেসিকে খাবার না খেয়ে বেরোতে দেখে ও ধরে নিল ফিরতে অন্তত আধ ঘণ্টা লাগবে। ওর ঘরে কোনো ছবির নকল খুঁজছিল ড্যানিয়েল। কিন্তু ছবির কোনো চিহ্ন নেই।

পরেরদিন সকালে ট্রেসি হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা বড়ো দোকানে ঢুকলো। ড্যানিয়েল

তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। ট্রেসি বাথরুমে ঢুকে পড়ল, মেয়েদের বাথরুম, বাইরে। দাঁড়িয়ে কুপার ছটফট করছিল। ভেতরে গেলে ও দেখতে পেতো একটা মাঝবয়সী মোটাসোটা মহিলার সঙ্গে ট্রেসি কথা বলছে।

ট্রেসি বলল–কাল সকাল এগারোটার সময়।

–না, কাল হবে না। কাল সকালে লুক্সেমবার্গের রাজা আসছেন ওই মিউজিয়াম দেখতে দারুণ পাহারা থাকবে।

–যত বেশি পাহারা ততই ভালো, কাল সকাল এগারোটা।

পরদিন সকাল এগারোটায় রাজা আসবেন। প্রাদোতে সাজোসাজো রব পড়ে গেছে। প্রাদোর ডিরেক্টর প্রিস্টিয়াম মাচাদা প্রধান দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন। একটু ভয়ও আছে, সাধারণ দর্শকদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রাজার নিজস্ব দেহরক্ষীর পাশাপাশি মিউজিয়ামের স্পেশাল গার্ডরাও থাকবে।

ট্রেসি মনে মনে খুবই উত্তেজিত। পুয়ের্তো টাঙানো আছে যে ঘরে সে ঘরে এসে পৌঁছলো সে, আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে। পুয়ের্তো ছবির পাশে টাঙানো পোশাক পরা মাজা নামের বিখ্যাত ছবিটার সামনে ইজেল রঙ তুলি নিয়ে কে যেন বসে ছবি আঁকছে। সে হল সীজার। ওটা দেখে নিয়ে ট্রেসি পাশের ঘরে ঢুকলো।

ড্যানিয়েল কুপার নজর রাখছে, তাহলে ট্রেসি এই ঘরেই কিছু একটা করবে, রাজা দোতলার গ্যালারি শেষ করে নীচে ফিরে আসছেন, তিনি বই আর ছবি দেখবেন। ট্রেসি যে ঘরে ছবি দেখছিল সেখানেও সেই বাথরুমে দেখা মহিলাটি রং তুলি নিয়ে বসে ছবি আঁকছিলেন। ঠিক সেই সময় একদল জাপানী কিচির মিচির করতে করতে ঢুকে পড়ল। ট্রেসিও কায়দা করে পিছু হটতে গিয়ে জাপানীদের কনুই-এর গুতোয় ধাক্কা খেয়ে ওই

মহিলা শিল্পীর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। সব এদিক ওদিক ছিটকে গেল। ট্রেসি তাড়াতাড়ি মহিলাটিকে সাহায্য করতে গেল। জুতো দিয়ে রঙের টিউবগুলোকে মাড়িয়ে মেঝেটি নষ্ট করে দিল। ড্যানিয়েল কুপার বুঝতে পারলো এটা ট্রেসির প্রথম চাল, আসলে সে কাজ করতে শুরু করেছে।

পাহারাদার ছুটে এল কুয়ে পাশ বলতে বলতে। দর্শনার্থীরা ট্রেসিকে ঘিরে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। এখনি রাজা এখানে আসবেন। এর মধ্যে মেঝে নোংরা হয়েছে। পাহারাদার ঘাবড়ে গিয়ে পাশের ঘরের পাহারাদারকে ডেকে আনলো।

ট্রেসির একটা চোখ লক্ষ্য করল, পাশের ঘরের পাহারাদার ছুটে এসেছে। সীজার ও পুয়ের্তোর ছবিটা এখন ও ঘরে সম্পূর্ণ একা।

দুজন পাহারাদার দর্শনার্থীদের সরাবার চেষ্টা করছে। একজন বলল ডিরেক্টরকে ডাকতে।

মিনিট তিনেক বাদে ডিরেক্টর মাচাদা হন্তদন্ত হয়ে বললেন শীগগিরি ঘর মোছর লোক। ডাকো।

–যাচ্ছি স্যার বলে একজন ছুটে গেল।

ট্রেসি দেখল পাহারাদার পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও ভেতরে সীজার পোরেটা একমনে ছবি এঁকে চলেছেন।

সূচিপত্র

ড্যানিয়েল কুপার কিন্তু ট্রেসির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি। দ্বিতীয় চালটা ধরতেই হবে। কিন্তু ট্রেসি কোনো ছবির কাছে গেল না, কারোর সঙ্গে কথা বলল না, শুধু কেন ধাক্কা খেল? একটা ছবিও হারিয়ে যায়নি? কিন্তু কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ ড্যানিয়েল কুপার। ও ছুটলো ডিরেক্টরের কাছে স্যার, আমার মনে হয় এখান থেকে একটা ছবি চুরি গেছে।

–অসম্ভব যেতেই পারে না, মাচাদা ড্যানিয়েলকে বললেন।

–আমি বলছি আসল ছবির বদলে নকল ছবি বসানো হয়েছে।

–শুনুন মিঃ কুপার, প্রত্যেকটা ছবির পেছনে, যন্ত্র লাগানো থাকে। নামলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে।

মাচাদা নিজেই সব পরীক্ষা করলেন। ড্যানিয়েল কুপার বুঝলো–এবারও শিকার ফস্কেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোটেলে খেতে খেতে ট্রেসি জেফকে জানালো কয়েকদিনের মধ্যে সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে। জেফ বলল, তোমার জন্য আমার কষ্ট হবে।

.

ডিরেক্টর মাচাদা সকালে বেশ আরাম করে কফি খাচ্ছিলেন। একটা বেয়ারা একটা চিঠি আনল। জুরিখের কুনসুখ হাউস মিউজিয়ামের ডিরেক্টর লিখেছেন যে তিনি তার দপ্তরের

সব থেকে প্রবীণ শিল্পবিশেষজ্ঞকে পাঠাচ্ছেন। তিনি সারা পৃথিবীর সেরা ছবিগুলো দেখে একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন।

ওঁর নাম হেনরী রেন্ডেল। তিনি এলেন। ওঁর কথায় সুইশ টান। হ্যান্ডশেক করার সময় মাচাদা লক্ষ্য করলেন হেনরীর ডান হাতের তর্জনীটা নেই।

লুক্সেমবার্গের রাজার দর্শন লাভ করার পর একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ–মাচাদা নিজেই সব কিছু দেখাতে শুরু করলেন।

একের পর এক গ্যালারীতে যাচ্ছেন রেস্তেল, মুগ্ধ হয়ে তারিফ করছেন সব কিছুর।

শেষে একতলায় বই আর ছবির ঘরে ঢুকেও সেই ভাব রেন্ডেলের মুখে, সব ছবিগুলির প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ পুয়ের্তোর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন–অসাধারণ নকল।

–কি বললেন মিঃ রেভেল?

–সুন্দর নকল!

–হতেই পারে না, একেবারে আসল ছবি এটি।

হেনরী রেভেল আরেক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন–নাঃ, যা বলেছি তাই, এটা গোইয়ার শিষ্য ইউজেনিও লুকাস পডিলার আঁকা।

সূচিপত্র

মাচাদা বললেন–না না হতেই পারে না। আমরা অনেক খোঁজ খবর করে এটা কিনেছি।

–কেন হবে না, লুকাস আর গোইয়া তো সমসাময়িক। তাই প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ঝঞ্ঝাট থাকবে না। আমি বলছি লুকাস যে সব ছবি নকল করতো তাতে নিজের নাম লিখতো। তারপর অন্য রঙের কোটিং লিখে গোইয়ার নামটা লিখে বাজারে ছেড়ে দিতো। এইভাবে সে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

সব দেখে নিজের হোটেলের ঠিকানা জানিয়ে ধন্যবাদের বন্যা বইয়ে দিলেন। তারপর রেন্ডেল চলে গেলেন। মাচাদার মনে খটকা লাগল। তিনি ছবিটাকে ল্যাবরেটরিতে আনতে বললেন।

মাচাদার নির্দেশে অ্যাসিড দিয়ে, গোইয়ার সইয়ের অক্ষরগুলো মোছা হল। ধীরে ধীরে লুকাসের এল ভেসে উঠল। রেন্ডেলের কথাই ঠিক। গোইয়ার তলায় লুকাসের সই।

মাচাদার মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এখন বোধহয় তার চাকরী চলে যাবে। মাচাদা সঙ্গে সঙ্গে রেন্ডেলের হোটেলে ফোন করলেন।

মাচাদা বললেন–আপনি ঠিকই বলেছিলেন, ওটা লুকাসেরই।

–লুকাস অনেককে বোকা বানিয়েছিল, আপনিও ঠকে গেছেন।

মাচাদা ঘাড় নেড়ে বললেন–আমরা যে বিধবার কাছ থেকে কিনেছিলাম উনি বলেছিলেন এই ছবিটি ওঁর পরিবারে তিন পুরুষ ধরে ছিল। মামলা করলে আমারই বোকামি প্রকাশ পাবে।

রেন্ডেল বললেন–তা ঠিক, এক কাজ করুন, ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলে ওটা নীলাম দারদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

–তাতে জানাজানি হবে।

–তবে একটা কথা বলি, আপনার ভাগ্য ভালো হলে একজন খদ্দের পেতে পারেন। আমারই একজন পরিচিত পঞ্চাশ হাজার ডলারে ছবিটা কিনতে পারে।

মাচাদা বললেন–তাহলে সেই ব্যবস্থা করুন।

তাড়াতাড়ি মিটিং বসলো, ছবিটা সাধারণ কাগজে মুড়ে তুলে দেওয়া হল রেভেলের হাতে। তার আগে টাকা অবশ্য হাতে চলে এসেছে।

ছবিটা নিয়ে রেভেল ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এলেন মাদ্রিদের উত্তর প্রান্তে। চারতলার ফ্ল্যাটে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ট্রেসি, পিছনে সীজার পোরেটা।

–অসুবিধে হয়নি তো?

রেন্ডেল ছবিটা টেবিলে রেখে বললেন–না।

ট্রেসির নির্দেশে সীজার আবার অ্যাসিড নিয়ে বসলো, লুকাসের সইটা তুলে নিতেই বেরিয়ে পড়লো গোইয়ার আসল সই।

রেন্ডেল অবাক হয়ে বললেন–চমৎকার, অপূর্ব।

সীজার পোরেটা বলল–সবটাই মিস হুইটনির পরিকল্পনা। উনি আমাকে বলেছিলেন দুমিনিট সময়ের মধ্যে আসল সইয়ের ওপর রঙের আস্তরন দিয়ে তার ওপর লুকাসের সই করে আবার আস্তরণ দিয়ে গোইয়ার সহ্য করতে পারবো কিনা। আমি যে পেরেছি

এটা তারই প্রমাণ। ওরা যদি লুকাসের সইটা তুলতো তবে আসল, সইটা পেতো। কিন্তু–প্রথমে ভয় পেয়ে যাওয়াতে অতদূর এগোতে পারেনি।

ট্রেসি দুজনকে পাওনা মিটিয়ে দিল।
সীজার প্রশ্ন করল–কীভাবে এটাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাবেন?
–অন্য একজনকে পাঠাবো, সেইই কাজ করবে।

ট্রেসি হোটেলে ফিরলো, আহা বেচারা জেফ।

নির্ধারিত মানুষটি এল, ট্রেসি সীজার পোরেটাকে ফোন করল–লোক পাঠাচ্ছি ছবিটা দিয়ে দেবেন।

–কী বললেন? একটু আগেই তো আপনার লোক ছবিটা নিয়ে চলে গেছে।

এই কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না ট্রেসি!

রু মতিনের অফিস

৩১.

প্যারিস,

বুধবার, ৯ জুলাই, দুপুর।

রু মতিনের অফিস, হারটগ ট্রেসির সঙ্গে কথা বলছে–সব মানছি কিন্তু ছবিটা জেফ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। অতএব তাকে কৃতিত্ব দিতেই হবে।

জেফ পুরো ব্যাপারটার ওপর কড়া নজর রেখেছিল। ট্রেসিকে দিয়ে আসল কাজটা করিয়ে শেষ মুহূর্তে বাজীমাৎ করলো। এই প্রথম জেফের কাছে গো-হারান হেরে গেল ট্রেসি।

ওকে হাতের কাছে পেলে আমি খুন করবো–ট্রেসি বলল।

–না না রাগারাগি কোরো না, জেফ আসছে, তোমাদের দুজনের জন্য একটা কাজ রেখেছি।

ট্রেসি কিছুতেই রাজী না, আবার হারটগও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ট্রেসি রাজী হল। ব্যাপারটা খুবই জটিল, দ্য বীয়ার্স কোম্পানী চার কোটি ডলারের হীরে পাঠাচ্ছে প্যারিস থেকে আমস্টারডামে। আকাশেই হীরেগুলো চুরি করতে হবে।

ট্রেসি ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল–মালবাহী প্লেনে? ওড়বার সময় চুরি করতে হবে? কি সম্ভব?

–ছোট্ট খাট্টো লোক থাকবে, তাকে একটা প্যাকিং বাক্সে ভরে হীরের প্যাকিং বাক্সে তাকে পুরে দেবো। মাঝপথে সে হীরে চুরি করে আবার প্যাকিং বাক্সে লুকিয়ে পড়বে। তার আগে নকল হীরের বাক্সটা ওই প্যাকিং বাক্সে ভরে দিতে হবে। আমস্টারডামে তুমি সমেত ওই প্যাকিং বাক্সটা ডেলিভারী নিয়ে নেওয়া হবে। একলাখ ডলারের ৫০ হাজার তুমি পাবে।

–বাকিটা?

–বাকিটা পাবে জেফ, ও প্যারিস এয়ারপোর্টে বলোক রাখবে, তাই তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আবার আমস্টারডামে সেই-ই থাকবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে ট্রেসি রাজী হল। প্যারিসের একটা ভালো হোটেলে চলে এল সে। ড্যানিয়েল কুপারও সেখানে হাজির হয়েছে। কিছুতেই এই পরাজয় সে মেনে নেবে না। বার বার ট্রেসি ফসকে যাচ্ছে কি করে?

ইন্টারপোলের সদর দপ্তর তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে।

রামিরো ড্যানিয়েল কুপারের দুর্ব্যবহারের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। ইন্সপের্টের ট্রিগনান্টেরও ধারণা বৃথা ট্রেসির পেছনে ছোটা হচ্ছে।

জেফ এসে ট্রেসিকে ডিনারে যেতে বলেছিল। ট্রেসি রাজী হয়নি। ট্রেসি হুইটনি নামের আদ্যাক্ষর লেখা একটা ছোট্ট সিল্কের রুমাল জেফ তাকে উপহার দিয়েছিল। ৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে কি?

শেষ মুহূর্তে বুক ঢিপ ঢিপ করল ট্রেসির। মাত্র এক ঘণ্টার ফ্লাইট। তার মধ্যে কাজ সারতে হবে। প্যাকিং বাক্সের কাঠগুলো খুবই শক্ত, সে কি ঠিকমতো খুলতে পারবে?

নিজেকে তৈরি করে নিল সে, কালো পোশাক পরলো, রবার সোলের জুতো, মাথায় টুপি, বের হবার আগে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টি. ডবলিউ লেখা রুমালটা বুকের ভেতর খুঁজে নিল।

ড্যানিয়েল কুপারের জাগ্রত চোখকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেসি সোজা চলে এল গুদাম ঘরে। সেখানে একজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। বড়ো কাঠের খাঁচার মতো প্যাকিং বাক্সের মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে বলা হল। একটু ভেবে ট্রেসি ঢুকলো, সঙ্গে নিলো দুফলা ছুরি, লম্বা শক্ত দড়ি, টর্চ লাইট আর নকল হীরের বাক্স।

প্যাকিং বাক্সে কিছু ফার্নিচার যাচ্ছিলো, তার পাশে গুটিসুটি হয়ে ট্রেসি বসে পড়লো। ওপর থেকে ক্যানভাস চাপা দিয়ে দড়ি বাঁধা হল। সামান্য ফুটো আছে তাই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না।

ভ্যানে তোলার আগে হারটগ বলল–ভয় পাবার কিছু নেই ট্রেসি, সব ঠিকঠাক চলেছ। জেফ তোমার কাছ থেকে হীরের বাক্সটা নিয়ে নেবে। সুইজারল্যান্ড যাবার প্লেনের টিকিট

দেবে। যদি অঘটন ঘটে যায় তাহলে এই চাবি নাও, দিয়ে দিলাম, আমস্টারডামে একটা খালি বাড়ি আছে, তুমি সেখানে লুকিয়ে থেকো।

বিশাল ৭৪৭ বোয়িং মালবাহী উড়োজাহাজে ট্রেসি সমেত প্যাকিং বাক্স বোঝাই হয়ে গেল। পাশেই আসল হীরের প্যাকিং বাক্স।

ট্রেসির মনে হল যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, ট্রেসি জলে ডুবে যাচ্ছে, কেউ তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

ছুরি দিয়ে ক্যানভাস কেটে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ট্রেসি। মনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। কতটা সময় পাওয়া যাবে সে বুঝতে পারছে না।

ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীর ঘামতে শুরু করেছে। হাত তুলতে পর্যন্ত পারছে না। ঘোরের মধ্যে থেকে কিভাবে হীরেটা সরিয়ে আবার ঠিকঠাক করে নিজের প্যাকিং বাক্সে ঢুকেছে সে জানে না। খালি তার মনে হয়েছে এখন ঘুম ছাড়া আর কিছু সে চায় না।

কখন প্লেন আমস্টারডামে নেমেছে, ট্রেসি ভর্তি প্যাকিং বাক্স ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে। তাও সে জানে না।

আধো জাগরণের মধ্যে সে দেখলো জেফ সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে–তুমি পেরেছো কাজটা করতে, বাক্সটা দাও। তোমার সঙ্গে লিসবনে দেখা হবে।

গুদাম ঘরের মালিক ট্রেসির ফ্যাকাশে মুখ দেখে ডাক্তার ডাকার কথা বলল। ট্রেসি আপাততঃ আমস্টারডামের সেই খালি বাড়িটায় গিয়ে বিশ্রাম নেবে। প্রাণশক্তি কিছুই অবশিষ্ট নেই তার।

সেই বাড়িতে পৌঁছে বিছানাতে শুয়ে ট্রেসি জ্ঞান হারালো।

ইন্সপেক্টর ট্রিগনান্টের সামনে যখন টি, ডবলিউ লেখা রুমালটা মেলে ধরা হল, তখন তিনি হাঁ করে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। এবার বললেন ড্যানিয়েল কুপারকে খবর দাও।

.

৩২.

হল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম আলকামার। এখানে ডাচ এয়ারলাইন্সের এক বিমান সেবিকার সঙ্গে বেশ কিছুদিন জেফ কাটিয়েছিল। ভাষাটাও মোটামুটি রপ্ত করেছে। এখানে অনায়াসে লুকিয়ে থাকা যায়। তাই ওই নিরাপদ বাড়িটা থেকে ট্রেসির আধা-অচেতন দেহটা নিয়ে সে চলে এসেছে আলকামার গ্রামে। সেখানে এক হোটেলে উঠেছে। বলেছে আমরা হনিমুনে এসেছিলাম, হঠাৎ স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার ডাকা দরকার কিন্তু এখন নয় সময় হলেই জানাবো।

ঘরে এনে ট্রেসিকে খাটে শুইয়ে দিয়েছে। দেখলো তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। জামা কাপড় খুলে তোয়ালে দিয়ে ট্রেসির শরীর মুছিয়ে দিয়েছে। রাতে আবার ধুম জ্বর এল। পরদিন সকালে জেফ বেশ কিছু ওষুধ থার্মোমিটার কিনে আনলো।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে ট্রেসি অনেকটা স্বাভাবিক হল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা জেফ এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা বন্ধ করেনি। ট্রেসিকে সে কি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে?

সত্যিকারের জ্ঞান ফিরলো অনেকক্ষণ বাদে। সব ঘটনা মনে পড়ল। জানলার কাছে বড়ো কোচের ওপর গুটিসুটি মেরে জেফ শুয়ে আছে কেন?

ও ভাবতে ভাবতে জেফ উঠে বসলো, যাক সুস্থ হয়েছে তাহলে?

–জেফ আমি তো তোমাকে হীরেগুলো দিয়েছি, আবার এসেছো কেন?

–হীরেটা নেবার পর আমি এয়ারপোর্টে গেলাম দেখতে তুমি ঠিকমত পালাতে পারলে কিনা। প্লেন ছেড়ে দেবার পর যখন এলে না তখন বুঝতে পারলাম তুমি ওই নিরাপদ আস্তানায় চলে গেছো। তখন তুমি পুরো অজ্ঞান ছিলে, আমি তুলে না আনলে তুমি বোধহয় বাঁচতে না।

ধরা পড়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও জেফ তাকে একদিন ধরে সেবা করেছে ট্রেসির বিশ্বাস হয় না। এর অন্তরালে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।

–হারটগকে ফোন করেছিলাম তোমার ৫০ হাজার ডলার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিয়েছে।

সবটাই তুমি মেরে দিলে না কেন? ট্রেসির কথায় স্থূল ছিল।

জেফ বলল–আমাদের এইভাবে পরস্পরকে নিয়ে ইঁদুর খেলার অবসান হওয়া উচিত বুঝেছো?

–বুঝেছি, মুখে বললেও ট্রেসি মনে মনে জানে এই খেলা কোনদিন শেষ হবে না।

–তোমার জামা জুতোর সাইজ বলল, সব কিনে আনতে হবে। এই কথা শোনা মাত্র ট্রেসি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, সে বুঝতে পারলো এই কদিন সে বিনা পোশাকেই ছিল, জেফ তার গা মুছিয়েছে, তার জ্বর দেখেছে। নাহ, লোকটাকে বোঝা মুস্কিল।

বিকেলে সুটকেস ভর্তি জামাকাপড় আনলো দুজনের জন্য। সেই সঙ্গে খবরের কাগজ। হীরে চুরির খবর বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, সম্ভাব্য চোরের নাম জানা যায়নি বলা হয়েছে।

জেফ হেসে বলল, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ড্যানিয়েল কুপারের নির্দেশে ট্রেসি হুইটনির রুমালের কথাটা সাংবাদিকদের বলা হয়নি। তাছাড়া টি, ডবলিউ মানে হাজার হাজার মহিলা আছে ইউরোপে, সেই সূত্র থেকে ট্রেসিকে ধরা সহজ হবে না।

গির্জায় বসে ড্যানিয়েল কুপার প্রার্থনা করলো–প্রভু, ওকে আমার হাতে তুলে দাও। ও আমার হাতে শাস্তি পেলে আমি পাপমুক্ত হব। কিন্তু ট্রেসির নগ্ন শরীরের কথা চিন্তা করলেই তার মাথার ভেতর কেমন যেন কামনার ঝড় ওঠে। ড্যানিয়েল তাড়াতাড়ি গির্জা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

ট্রেসির ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেশ অন্ধকার। জেফকে দেখতে না পেয়ে নিজেকে কেমন অসহায় বলে মনে হল।

জ্বর ছাড়লো একেবারে রাতের বেলায়। গায়ে একটু জোর এল। রাতে শুয়ে শুয়ে জেফকে তার অতীত জীবনের সব কাহিনী বলল। জেফ নিজে অন্য একটি ছোটো খাটো বিছানায় শুতে। সেও তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানালো।

একদিন সকালে জেফ বলল–পুলিশ বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে, এবার এখান থেকে পালাতে হবে।

উৎসুক চিত্তে ট্রেসি জানতে চাইলো–কবে?

–কালই।

–ঠিক আছে, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

সে রাতে ট্রেসির ঘুম আসছে না, অনেকক্ষণ ছটফট করার পর সে বলল–তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো?

–না।

–কি চিন্তা করছিলে?

–কালকের কথা, এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।

–আমার কষ্ট হবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে।

–কতটা?

–ভীষণ–

জেফ উঠে এল ট্রেসির খাটের কাছে, ট্রেসি–।

এই মুহূর্তটির জন্য ট্রেসি বোধহয় অপেক্ষা করছিল। সে দুহাত বাড়িয়ে জেফকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল–কোনো কথা নয়, আমাকে ভীষণ ভীষণ আদর করো।

তারপর ঘণ্টাখানেক ওরা দুজন স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে গেল।

সকালে ট্রেসিকে আদর করতে করতে জেফ আবদার করেছিল, তুমি কি আমাকে বিয়ে–করবে?

জেফের বুকে মুখ লুকিয়ে ট্রেসি বলল, হ্যাঁ।

কীভাবে আগামী জীবন গড়ে উঠবে দুজনে তার পরিকল্পনা করতে থাকলো। দুজনেই প্রচুর টাকা জমিয়েছে। এখন ভদ্র জীবনে ফিরে যাবে।

তাহলে পুলিশকে জানিয়ে দিই সে কথা–জেফের কথায় হেসে উঠলো ট্রেসি।

পরদিন হারটগের ফোন এল। একটা কাজের ব্যাপার আছে, দুজনে করবে কি?

–না না আমরা এই লাইন ছেড়ে দিয়েছি, আরেকটা কথা আমরা বিয়ে করছি।

হারটগ অভিনন্দন জানিয়ে বলল–কালে আসছি, কথা হবে।

জেফ আর ট্রেসি ঠিক করল হারটগের প্রস্তাবে রাজী হবে না। শেষ পর্যন্ত হারটগ একটা দুঃসাহসী কাজের কথা পাড়ল। ট্রেসি শেষ পর্যন্ত রাজী হল। মনে মনে শপথ করল এটাই আমার শেষ কাজ। কাজটা প্রায় অসম্ভব, করতে পারলে বিশ লাখ ডলার পাওয়া যাবে।

ট্রেসিরা আমস্টারডামে ফিরতে না ফিরতেই পুলিশ তাদের অনুসরণ করতে শুরু করলো। হল্যান্ডের পুলিশ ট্রেসিকে উচিত শিক্ষা দেবে এমন আস্ফালন শোনা গেল।

ড্যানিয়েল কুপারকে সাহায্য করলেন ইন্সপেকটর দুরেন।

এখানেও ট্রেসি আর জেফ দর্শনীয় স্থানগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ড্যানিয়েল কুপার জানে এর অন্তরালে কোনো একটা গোপন কারণ আছে।

গোয়েন্দারা প্রত্যেকদিন ড্যানিয়েল ও দুরেনকে রিপোর্ট দিচ্ছে সন্দেহজনক কিছু নেই।

একদিন সকালে ওরা দুজনে গেল হল্যাণ্ডের বিখ্যাত হীরে কাটার কারখানা দেখতে।

সরকারী গাইড সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল। কাঁচের ডোমের তলায় রাখা একটা হীরে দেখিয়ে বলল–লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন–এটা হল পৃথিবীর বিখ্যাত লুকুলান হীরে, এর দাম এক কোটি ডলার।

জেফ চেঁচিয়ে বলল–তাহলে চুরির ভয় আছে নিশ্চয়ই।

ড্যানিয়েল কুপার পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এসেছে। সে বুঝতে পারছে এই হীরেটা চুরি করার চেষ্টা করা হবে।

ড্যানিয়েল কুপার আর গোয়েন্দার মধ্যে চোখাচোখি হয়ে গেল। পরদিন তারা দুজন গেল বিখ্যাত মিউজিয়ামে। রেমব্রার বিখ্যাত ছবি দি নাইট ওয়াচ-এর সামনে দাঁড়িয়ে জেফ গাইডকে জিজ্ঞাসা করল, পাহারার বন্দোবস্ত ঠিক মতো আছে তো?

–তা আর বলতে, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র লাগানো আছে, কেউ সাহস করবে না।

–আশা করি এরপর কেউ চুরি করবে না, কি বলো?

ড্যানিয়েল কুপার আর গোয়েন্দা তখন আরো একবার চোখে চোখ রাখলো।

তৃতীয় দিন ওরা গেল কনভেনশন সেন্টারে। ডাকটিকিটের প্রদর্শনী দেখতে। ব্রিটিশ গায়নার ছকোণা ডাকটিকিট, মরিশাসের একলাখ ডলারের এক পেনীর টিকিট দেখে আবার জেফ পাহারাদারকে শুনিয়ে একই কথা বলল।

তিনদিনের এই রিপোর্ট পেশ করে ড্যানিয়েল তার পুরনো অনুরোধ আবার পেশ করলো, জেফ ও ট্রেসির ঘরে ছোট ছোট মাইক্রোফোন ফিট করতে হবে। তারা কি কথা বলে সবকিছু টেপ করা দরকার। পুলিশ কমিশনার এবার আর না বলতে পারলেন না।

.

৩৩.

পরদিন সকাল থেকে টেপ রেকর্ডারের কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে থাকতে দেখা গেল ড্যানিয়েল কুপার, ইন্সপেকটর দুরেন আর সহকারী গোয়েন্দা উইটক্যাম্পকে।

কি কথা হচ্ছে দুজনের মধ্যে?

প্রথম জেফের গলা শোনা গেল–আরেকটু কফি দেবো।

–এই চীজটা খাও, দারুণ খেতে—

–রোটারডামে বেড়াতে যাবে?

–না, বিশ্রাম নেবো।

একটু বাদে জেফের গলা–জানো, এই হোটেলে কোটিপতি ম্যাক্সিমিনিয়াম পিয়ের পন্ত আছে। জাহাজে ওকে বধ করতে পারিনি, মনের ভেতর একটা কাঁটা খচখচ করছে।

–আমিও শুনেছিলাম ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে যাবে।

পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট দেওয়া হল, ওই হোটেলের ওপর কড়া নজর রাখতে।

সকাল নটাতে আবার খবর পাওয়া গেল–অ্যামরো ব্যাংক ৫৩ লক্ষ ডলার দামের সোনার বাট পাঠাচ্ছে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজে–

–কত ওজন হবে?

–কতো আর হবে, এক হাজার ছশো বাহাত্তর পাউণ্ড।

–প্রায় কুড়ি মণ, ও নিয়ে পালানো মুস্কিল।

–আমরা চাইলে সব মুস্কিল অবসান হবে।

পুলিশ ব্যাংকের ব্যাপারে সতর্ক হবে ঠিক করলো। ট্রেসিদের পেছনে আরও গোয়েন্দা লাগানো হল।

পরের পাঁচদিন অবিরাম অনুসরণ করে গোয়েন্দারা যে খবর জোগাড় করলো তা বিস্ময়কর। দেখা গেল জেফ একটা ছাপাখানায় ঢুকেছে। ও বেরিয়ে যাবার পর গোয়েন্দা গেল, নিজের কার্ড দেখিয়ে প্রশ্ন করলো, ওই লোকটা কোন্ কাজে এসেছিল?

–কার্ড ছাপাতে।

গোয়েন্দা দেখলো কার্ডে লেখা আছে—

আমস্টারডামের নিরাপত্তাবাহিনী

কর্নেলিয়াস উইলসন, মুখ্য তদন্তকারী।

পরের দিন গোয়েন্দা খবর আনলো ট্রেসি একটা পোষা পশুপাখি বিক্রির দোকানে ঢুকেছে। সেখানে একগাদা পাখির অর্ডার দিয়েছে। তার মধ্যে আছে কয়েকটা পায়রা, দুটো লাভবার্ড, একটা ক্যানারী, কিছু গোল্ড ফিস।

–পায়রা? ডাক পায়রা? যে পায়রার গলায় খবর বেঁধে দিলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায়? এ ধরনের পায়রাতো ওখানে বিক্রি হয় না।

ড্যানিয়েল কুপারের মাথা খারাপ হবে বোধ হয়।

আমরো ব্যাংক থেকে জেফ বেরিয়ে আসার পর সেই গোয়েন্দা গিয়ে প্রশ্ন করলো মিঃ উইলসন, উনি কি জানতে এসেছিলেন যে আপনার ব্যাংকের নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো ঠিক আছে কিনা?

–উনি যে সঠিক লোক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন কি করে?

–কেন? ওই কোম্পানী আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে দেখাশোনা করে, তাছাড়া কার্ডের ফোন নম্বর দেখে ফোনও করেছিলাম, সব ঠিক আছে।

বিকেল তিনটের সময় একটা সাঁজোয়া গাড়ি ব্যাংকের সামনে এসে দাঁড়ালো, জেফ আড়াল থেকে তার কয়েকটা ফটো তুলল। গোয়েন্দা আবার জেফের ফটো তুলল।

পুলিশ কমিশনার যখন শুনলেন বিপুল পরিমাণের সোনা চুরি হতে চলেছে, তিনি আঁতকে উঠলেন।

–কি করে তা সম্ভব? সত্যিকারের গাড়ি আসার আগে ওরা একটা গাড়ি নিয়ে আসবে, সোনা বোঝাই করে বেরিয়ে যাবে। ড্যানিয়েল কুপার বলল।

–বড্ড বেশি কল্পনা করা হচ্ছে না?

–না, ওরা কিছু একটা করবেই।

ট্রেসিকে দেখা গেল জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে। সে একটা মাঝারী স্টীমার ভাড়া, করবে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হারটগকে ফোন করলো।

ওর ওপর ভরসা করতে পারি, আরও দুসপ্তাহ সময় লাগবে।

হারটগ ফোনটা ছেড়ে দিল।

পরদিন ১১টার সময় গোয়েন্দা খবর দিল জেফ একটা কারখানা থেকে সাঁজোয়া গাড়ি কিনছে। সেটা যাতে ভারী লোহা বইতে পারে তার জন্য পাটাতনে লোহর পাত বসাতে হবে।

রঙের কারখানা থেকে খবর পাওয়া গেল সরকারী সাঁজোয়া গাড়ির মতো এই গাড়ির রঙ নীল করতে অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

পশুপাখির দোকানের মালিক জানালোপায়রাটা ডাক হরকরা নয়। মাঠ থেকে ধরে এনে ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে।

ড্যানিয়েল বুঝতে পারছে না পায়রার মাধ্যমে কিভাবে কুড়ি মণ সোনা পাচার হবে।

অ্যামরে ব্যাংক থেকে সোনা পাঠাবার পাঁচদিন আগে সব ফটো আর রিপোর্ট রাখা হল পুলিশ কমিশনারের সামনে। ট্রেসি সোনাটা ওই ভাবে ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর স্টীমারে করে একদেশ থেকে অন্য দেশে পাঠাবে।

জেফ আবার উর্দির অর্ডার দিয়েছে, এবার ট্রেসিকে নিয়ে সে গেল গ্যারেজে। জেফ ড্রাইভারের সিটে বসে একটা সুইচ টিপতেই সাঁজোয়া গাড়ীটার দুধারের কাপড় সরে গেল। গাড়ীটার গায়ে লেখা হিংকেন বিয়ার কোম্পানী। দূরে একটা বাড়ির ছাদ থেকে গোয়েন্দারা। ওই ছবিটিও তুলল।

আরও একটা খবর পাওয়া গেল। জেফ রটারডম বন্দর থেকে হংকংগামী জাহাজে কিছু মাল পাঠাবার কথা বলে এসেছে।

–তাহলে ওদের এখুনি ধরা হচ্ছে না কেন?

উত্তেজিত কমিশনার জানতে চাইলেন।

শান্ত হয়ে ড্যানিয়েল কুপার জবাব দিল হাতে নাতে ধরতে চাই, তা নাহলে কেস প্রমাণ করা যাবে না।

আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিস থেকে ট্রেসি বেরিয়ে এল। হাতে মাঝারি আকারের একটা বাণ্ডিল।

ট্রেসি সোজা হোটেলে এল। কিছুক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে গেল। তারপর পুলিশ গিয়ে দেখলো বাণ্ডিলটা নেই।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলায় ড্যানিয়েল কুপার ট্রেসির হোটেলের ওপর তলায় টেপ রেকর্ডারে মন দিল।

প্রথম জেফের গলা–পাহারাদাররা আসার ত্রিশ মিনিট আগেই আমরা যদি পৌঁছে যাই তাহলে সোনা বোঝাই করে পালাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আসল সাঁজোয়া গাড়ি আসার আগেই মাল স্টীমারে উঠে যাবে।

আবার ট্রেসির গলা পাওয়া গেল–আমি পেট্রল ভরে রাখছি।

এবার জেফের গলা–তাহলে কাল সকালে–।

ড্যানিয়েল বলল–দুরেন, কাল সকালের মধ্যেই দুজনকে জেলে পুরতেই হবে।

সমস্ত রাত ড্যানিয়েলের ঘুম এল না। বিভিন্ন চিন্তা তার মাথার ভেতর ঘুরছে। ট্রেসি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, এবং প্রচণ্ড ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে–এই কাল্পনিক দৃশ্যটা তার মাঝরাতের ঘুম কেড়ে নিল। বাথরুমে গিয়ে টবে গরম জল ভরে স্নান করলো। নাঃ, মেয়েটাকে চরম শাস্তি দিতে হবে। তারপর ফ্ল্যাটে ফিরবে। বাড়ি বলতে তার কিছু নেই, ছিল এককালে, যখন সে ছিল মার নিরাপদ আশ্রয়ে।

ড্যানিয়েলের যখন বয়স চার বছর তখন ওর বাবা বাড়ি থেকে চলে যান, পরে মার কাছে ড্যানিয়েল শুনেছিল এক মেয়ে মানুষের টানে বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ড্যানিয়েল ওই অদেখা মহিলাটিকে ঘৃণা করতো।

ড্যানিয়েল তার মার সঙ্গে শুতো, একদিন বলে ফেলেছিল–আমি বড়ো হয়ে তোমাকে বিয়ে করবো। ওর মা হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

ক্লাসে ড্যানিয়েল সব সময় ফার্স্ট হতো। সবাই বলতো মিসেস কুপারের ছেলেটি বুদ্ধিমান।

সব কিছু ড্যানিয়েলের মনে আছে, যখন তার বয়স সাত বছর তখন ওর মা প্রতিবেশী এক পুরুষকে বাড়িতে ডাকতেন, লোকটার চেহারা বিশাল, সমস্ত শরীরে বড়ো বড়ো

লোম। ওর সাথে মাকে অন্তরঙ্গ ভাবে বসে থাকতে দেখে ড্যানিয়েল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেটা বুঝতে পেরে মাও কথা দিয়েছিলেন ওই লোকটির সঙ্গে তিনি আর মিশবেন না।

আজ আমস্টারডাম হোটেলের বাথটবে শুয়ে সে দিনের ভয়ংকর দৃশ্যটা তার মনে। পড়ে যাচ্ছে। কানে ব্যথা হওয়ায় স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যায় ড্যানিয়েল, বাড়ি চলে আসার আরেকটা কারণ ছিল, সে দিনটি ছিল ড্যানিয়েলের জন্মদিন, ভেবেছিল মার কাছ থেকে বেশি আদর পাবে।

মার শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ড্যানিয়েল। মা আর পাশের বাড়ির সেই ষাঁড়ের মতো লোকটা বিছানাতে শুয়ে অদ্ভুত খেলায় মত্ত।

নিজের ঘরে এসে বমি করে সে শান্ত হল। কিছুক্ষণ পরে ও শুনতে পেলো মা লোকটাকে বলছে–এবার তুমি চলে যাও, ড্যানিয়েলের আসার সময় হয়েছে।

এরপর অবাক করা একটা ঘটনা ঘটে যায়। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ড্যানিয়েল গেল মার বাথরুমে। জলপড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছিল মা সেখানে ঢুকেছে। তার হাতে ছিল দর্জিদের বড়ো কঁচি।

মা তাকালো, বললো-ড্যানিয়েল তুমি?

শব্দ শেষ হল না, ধারালো কাঁচি দিয়ে বার বার মার বুকে প্রাণপণ আঘাত করতে লাগল ড্যানিয়েল। ড্যানিয়েলের অদ্ভুত একটা চাপা গর্জনে মায়ের কাতর আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না।

ড্যানিয়েল বাথটবে নেমে পড়লো। গায়ের রক্ত ধুতে হবে। স্নান সেরে উঠে এল সে, কঁচিটার হাতল তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলে দিল বাথটবে।

ঘরে এসে জামাকাপড় পরে ফোন করল পুলিশে।

পাশের বাড়ির লোকটা মাকে খুন করেছে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

ফ্রেড জিমার ড্যানিয়েলের মায়ের সঙ্গে গোপন প্রেমের কথা স্বীকার করেছিল, কিন্তু খুনের কথা সে মানতে চায় নি। শুধু বলেছিল এই ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই। বারো বছরের ড্যানিয়েলের সাক্ষ্যতে ফ্রেড জিমারের ফাঁসি হয়ে যায়। কোনো জেরার মুখে ওই ছেলেটি ভেঙে পড়েনি।

ড্যানিয়েলকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দূর সম্পর্কের এক পিসীর কাছে, টেক্সাসের ম্যাটি পিসী, ভীষণ গোঁড়া আর ধার্মিক ছিলেন।

কয়েক বছর সেখানে থাকার পর পালিয়ে এল ড্যানিয়েল। সোজা নিউইয়র্কে। যোগ দিল পিওনের কাজে, আন্তর্জাতিক বীমা সংরক্ষণ সমিতিতে। তিন বছরের মধ্যে তদন্তকারীর পদ পেয়ে গেল। তারপর থেকেই ওর মনে হতো সে যেন ঈশ্বরের ডান হাত, পাপীদের শাস্তি দেবার জন্যই তার জন্ম হয়েছে।

আগামীকাল আরেকটা অসৎ মানুষকে শাস্তি দিতে হবে।

.

৩৪.

আমস্টারডাম, শুক্রবার, ২২ আগস্ট সকাল ৮টা

হোটেলের ছাদের ঘরে ড্যানিয়েলরা বসে আছে। জেফ আর ট্রেসি ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে কি বলছে তা শুনেছ–

–রোল দেব একটা? চা না কফি?

–দরকার নেই।

–স্টীমারে করে যেতে ভালোই লাগবে জেফ।

–শুধু তুমি আর আমি—

আবোল তাবোল কথা বলে চলেছে দুজন। ড্যানিয়েল ঘড়ি দেখলো, নটা বেজে গেছে, ওদের তৈরি হতে হবে।

নটা বেজে তিরিশ-ড্যানিয়েল অধীর হয়ে উঠল। এবার তো ওদের বেরিয়ে পড়া উচিত।

এমন সময় টেপ রেকর্ডারে অন্য একজনের গলা ভেসে এল, হায় ভগবান, এখানে তো কেউ নেই দেখছি।

নারীর কণ্ঠস্বর–কেউ নেই অথচ কথা শুনছি।

ট্রেসির গলা–বাজী রাখতে পারি এখানে ওসব নেই।

ড্যানিয়েল কুপার চমকে উঠলোকী হচ্ছে এসব?

শোনা গেল ঘর পরিষ্কার করার ঝি টেলিফোন করছে–ঘরে কেউ নেই, অথচ কথা শোনা যাচ্ছে।

ড্যানিয়েলরা ছুটলো ট্রেসির ঘরে, কফি টেবিলে একটু আড়াল করে রাখা টেপ রেকর্ডার চলছে–না, দাও একটু কফি দাও ট্রেসি।

ড্যানিয়েল বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো। পাগলের মতো এমারজেন্সী নম্বরে ফোন করল পুলিশকে ইন্সপেক্টর ভ্যান দুরেনকে খবর দিন। ট্রেসি আর জেফ হোটেল থেকে হারিয়ে গেছে। এখুনি ওদের গ্যারেজটায় যেতে হবে। আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি।

দুরেন জানালো ট্রেসিরা গ্যারেজ থেকে সাঁজোয়া ট্রাকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর ওরা তিনজন অ্যামরো ব্যাঙ্কের উল্টো দিকে একটা উঁচু বাড়ির ছাদে গিয়ে লুকোলো।

–আমরা ওদের কথা শুনে নিয়েছি বুঝতে পেরে ওরা বোধহয় তাদের পরিকল্পনাটা বাদ দিয়েছে।

এই কথার কোনো উত্তর দিল না ড্যানিয়েল।

ব্যাঙ্কের ভেতর হৈ চৈ হচ্ছে, দূর থেকে একটা সাঁজোয়া লড়িকে আসতে দেখা গেল। ওয়াকিটকির মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হল।

ট্রাটা এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্কের বড়ো গেটের সামনে। দুজন উর্দিপরা পাহারাদার ব্যাঙ্কের ভেতর চলে এসেছে। ট্রেসি কোথায়?

সোনা বোঝাই করতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগলো। দরজার তালা বন্ধ করে ড্রাইভারের সিটে পাহারাদার দুজন উঠতে যাবে এমন সময় দুরেনের পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাকটির ওপর। পাহারাদার দুজনকে নামানো হল। কিন্তু কি আশ্চর্য এরা সত্যি সত্যি কোম্পানীর লোক।

ড্যানিয়েল কুপারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, সে সব কথা গোপনে শুনেছে, কিন্তু চোখের সামনে এসব কি ঘটছে?

নেদারল্যান্ড হীরে কাটা কারখানার বহু দর্শকের মধ্যে জেফ আর ট্রেসিকেও দেখা গেল। দাড়ি-গোঁফে জেফকে চেনা যাচ্ছে না, পিঠে একটা ব্যাগ, ট্রেসিকে দেখলে মনে হচ্ছে সে বোধহয় সাত মাসের পোয়াতি। প্রচণ্ড সেজেছে, হাতে একটা ব্রিফকেস। বাদামী কাগজে মোড়া গোল একটা বাণ্ডিল।

গাইডের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ট্রেসি দোতলায় চলে এল। কখন যে জেফ কেটে পড়েছে কেউ জানে না, জেফ মাটির তলার বেসমেন্ট ঘরে চলে গেছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির পোশাক বের করে পরে নিয়েছে। হাতে যন্ত্রপাতির বাক্স। ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে।

ট্রেসিও ঘড়ি দেখলো, ভীড়ের মধ্যে লুকুলান হীরে দেখছে। গাইড বলতে শুরু করেছে এটা হল পৃথিবীর সব থেকে দামী হীরে।

দপ্ করে আলোটা নিভে গেল। অ্যালার্ম ঘণ্টা বাজা আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রের মতো।

ভয় পাবেন না–। আবার আলো ফিরে এল।

দেখলেন তো ভয় পাবার কিছু নেই।

টেলিফোন বেজে উঠল, গাইড বলল–না হেনড্রিক, ভয় পাবার কিছু নেই। ফলস। অ্যালার্ম বেজেছে।

এই দেখুন হীরে–এগুলো বিক্রির জন্য। আবার আলো নিভলো, আবার হট্টগোল। কয়েক সেকেন্ড বাদে আলো ফিরলো। কিন্তু এবার আললাগুলি ভীষণ ভাবে কাঁপছে। জেফ আলো কপার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে ওপরে উঠে এল। গাইডের কাছে গিয়ে বলল আলোর কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে কি?

–দেখো না, কেমন কাঁপছে তুমি কি ঠিক করতে পারবে?

গাইড ছদ্মবেশী জেফকে নির্দেশ দিয়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে পড়লো–

দর্শকরা এগিয়ে গেল শো কেসের দিকে। সেই ফাঁকে জেফ পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বের করলো। তার পিনটা খুলে ছুঁড়ে দিল লুকুলান হীরের থামের পাশে। জিনিসটা থেকে ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে।

জেফ গাইডকে লক্ষ্য করে বলল–এখানে সর্ট সার্কিট হয়েছে।

এক মহিলা দর্শক চিৎকার করে উঠলেন–আগুন।

জেফ লুকুলান হীরের স্ট্যান্ডটার দিকে এগোতে গেল। গাইড বলল, ওখানে যাওয়া মানা।

ভালই হল, তাহলে ওটা তোমার দায়িত্ব।

জেফ চলে যাবার ভঙ্গি করলো। ধোঁয়া প্রচণ্ড বেগে বের হচ্ছে। গাইড ফোন করে অ্যালার্মের লাইনটা কয়েক মিনিটের জন্য কাটতে বলল।

–নাও তাড়াতাড়ি সারো।

জেফ এগিয়ে গেল, গাইড চলে এল। সশস্ত্র প্রহরীকে দর্শকদের দিকে নজর রাখতে বলল।

–আপনারা যদি চান হীরে কিনতে পারেন।

এমন সময় ট্রেসি বলল, আপানারা হীরে কেনেন না? আমার স্বামী এই কদিন হল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছে। আমি এগুলো বিক্রি করতে চাই।

সে হাতের অ্যাটাচিটা উল্টো করে খুললো, কয়েকশো হীরে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের ভেতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ট্রেসি চেঁচিয়ে বলল, আমার হীরে–আমার হীরে কোথায়?

সশস্ত্র পাহারাদার ওদের শান্ত করতে এগিয়ে এল। ভীড়ের ধাক্কায় তারা মাটিতে পড়ে গেল। যখন উঠে দাঁড়ালো তখন দেখলো লুকুলান হীরে নেই, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আর গর্ভবতী মহিলাকে দেখা যাচ্ছে না।

হীরে কারখানা থেকে অনেক দূরে গিয়ে একটা পাবলিক বাথরুমে ঢুকে ট্রেসি তার ছদ্মবেশ পাল্টালো। বাদামী কাগজে মোড়া বাণ্ডিলটা নিয়ে পার্কে এসে বসলো।

কয়েকটা জারকন ফেলে দিয়ে দর্শকগুলোকে বুদু বানিয়েছে। একটু বাদে জেফ ওখানে এল। লুকুলান হীরের প্যাকেটটা ট্রেসিকে দিয়ে বলল–এই বন্ধুটাকে কাজে লাগাও।

জেফ চলে গেল। ট্রেসি ভাবলো এবার দুজনে চলে যাব ব্রেজিলে, আলাদা আলাদা প্লেনে, চারপাশ দেখে নিয়ে বাদামী কাগজের মোড়কটা ছিঁড়তেই একটা খাঁচা বেরিয়ে এল।

ভেতরে একটা পায়রা। তিনদিন আগে এটাই এসেছিল, আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে, হারটগ এটাকে পাঠিয়েছিল। এটা প্রশিক্ষিত একটা ডাক পায়রা।

হোটেলে এনে এখান থেকে কেনা সাধারণ পায়রাটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। খাঁচাতে এটাকে আটকে রাখা হয়। সে হীরে সুষ্ঠু থলেটা পায়রার পায়ে বেঁধে দিল।

বলল, লক্ষ্মীটি মারগো, এবার এটা নিয়ে লন্ডনে চলে যাও।

পায়রাটাকে ওড়াতে যাবে এমন সময় উর্দিপরা পুলিশ এগিয়ে এসে বলল, কি করছেন আপনি? জানেন না এখানে পায়রা ধরা নিষিদ্ধ।

–ভুল হয়ে গেছে অফিসার, আমি বিদেশী তাই বুঝতে পারিনি। আর কখনও করবো না। এটা ছেড়ে দিচ্ছি।

পায়রাটা আকাশে উড়তে শুরু করলো। তার দিকে একবার তাকালো ট্রেসি। বুকের ওপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেল।

সন্ধ্যের পর ট্রেসিকে দেখা গেল এয়ারপোর্টে। ব্রাজিলগামী প্লেনে ওঠার জন্য সামনে এগিয়ে গেল। ড্যানিয়েল কুপার তার ওপর নজর রেখেছে। হীরে চুরির খবরটা ড্যানিয়েল কুপার শুনেছে। সে জানে এটা ট্রেসির কাজ। এমন ফন্দি খাঁটিয়ে চুরি করা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

অথচ তাকে ধরা যাচ্ছে না। ট্রেসি আর জেফের ফটো দেওয়া হল গাইড আর গার্ডের হাতে। তা সত্ত্বেও কিছু করা গেল না।

মিস্ত্রিটা দাড়িওয়ালা, মহিলা তো গর্ভবতী, চুলের রং কুচকুচে কালো। নাঃ, ফটোর সঙ্গে মিলছে না।

ট্রেসি-জেফের জিনিসপত্র খোলা হল। হীরের নামগন্ধ নেই।

দুরেন বলল–হীরে শহরেই আছে, আমরা খুঁজে পাবো।

ড্যানিয়েল রাগত স্বরে বলল–না মেয়েটা পায়রা বদলে ফেলেছে।

ট্রেসি প্লেনের দিকে চলে যাচ্ছে। ড্যানিয়েল কুপার ভাবতে লাগল, এই প্রথম ও কারো কাছে বুদ্ধির খেলায় হেরে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে ট্রেসি শেষবারের মতো পেছনে তাকালো। সে জানে ড্যানিয়েল সারা ইউরোপে তাকে অনুসরণ করে চলেছে। ড্যানিয়েলের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।

ড্যানিয়েল কুপার বুক পকেটটা ছুঁলো, নাহ্, তার রেজিগনেশন লেটারটা ঠিকই আছে।

প্লেনের নরম গদীতে গা এলিয়ে দিয়ে আরামে চোখ বন্ধ করলো ট্রেসি। এখন শুধু জেফ আর সে সুন্দর জীবনের হাতছানি।

একজন মাঝবয়সী মোটাসোটা লোক বলল–ম্যাডাম কোণের সিটটা আমার।

ট্রেসি একটু পাশ কাটাতেই তার হাঁটুর ওপর স্কার্টটা সরে গেল। লোকটা লোলুপ দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটাকে পাত্তা দিতে ইচ্ছে হল না ট্রেসির, লোকটা বলল–দিনটা ভালোই, কি বলেন?

ট্রেসি এখন চোখ বন্ধ করে জেফের কথা চিন্তা করবে। পাশে বসা লোকটি খোঁচা মেরে বলল–একসঙ্গে অনেক দূর যেতে হবে আমাদের, আলাপ পরিচয়টা করে নেওয়াই চালো তাই নয় কি? আমি হলাম ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়ের পন্ত। আর আপনি?

চোখের সামনে পিয়ের পন্তকে দেখে ট্রেসির সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। সে নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বলল–আমার নামটা নাই বা জানলেন।

নাহ, এই অন্ধকার অতীতকে সে চিরদিনের মতো ভুলতে চায়। এখন ব্রাজিলের উদ্দাম সমুদ্র সৈকত, নীল আকাশ আর জেফের সান্নিধ্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ম্যাক্সিমিলিয়ান পিয়ের পন্ত, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি অসভ্য, অমিশুকে, কিন্তু আসলে আমি তা নই।

চোখ বন্ধ করার আগে শেষবারের মতো ট্রেসি ভাবল, হায়, যদি কয়েকদিন আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতো, তাহলে...।